শর্মিলা বসু

ডেড রেকনিং

১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতি

শর্মিলা বসু

ডেড রেকনিং

১৯৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের স্মৃতি

অনুবাদ : সুদীপ্ত রায়

হার্স্ট এন্ড কোম্পানী, লন্ডন

www.pathagar.com

যুক্তরাজ্যে প্রথম প্রকাশ ২০১১
প্রকাশক : সি.হার্স্ট এন্ড কোং (পাবলিশার্স) লি.
৪১ গ্রেট রাসেল স্ট্রীট, লন্ডন,
ডবিউ সি ১ বি ৩ পি এল

বাংলা সংস্করণ প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০১২

ISBN : 978-1-84904-049-5 পেপারব্যাক
978-1-84904-048-8 হার্ডব্যাক

বাংলা সংস্করণ মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

দাদু ও দিদা

চারু চন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবী চৌধুরানী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার	০৭
সূচনা : সংঘাতের ঝাপসা স্মৃতি	০৯
অধ্যায় ১- কল টু আর্মস : বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ	২৩
অধ্যায় ২- সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা : দায়িত্ব ছাড়া ক্ষমতা	৩৫
অধ্যায় ৩- সেনা অভিযান : ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট'	৫৩
অধ্যায় ৪- অসভ্যতার যুদ্ধ : উচ্ছৃঙ্খল জনতা, বিদ্রোহ ও উন্মাদনা	৭৭
অধ্যায় ৫- বিধবাদের গ্রাম : গ্রামাঞ্চলের 'নিরাপত্তা নিশ্চিত করা'	১০১
অধ্যায় ৬- হিন্দু শিকার : সংখ্যালঘু নির্যাতনের রাজনীতি	১১৭
অধ্যায় ৭- হিট এন্ড রান : অন্তর্ঘাত ও প্রতিশোধ	১২৭
অধ্যায় ৮- ভ্রাতৃ হত্যা : যুদ্ধ শেষের মৃত্যু দূত	১৪৯
অধ্যায় ৯- শব্দ ও সংখ্যা : স্মৃতি ও দানবীয় উপকথা	১৬১
পরিশিষ্ট-১ : পুস্তক সংক্রান্ত বিবরণ	১৮৩
পরিশিষ্ট-২ : অংশগ্রণকারী / প্রত্যক্ষদর্শী যাদের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে	১৯৭
তথ্যসূত্র	২০১
SELECT BIBLIOGRAPHY	২২৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি অনেকের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ যারা আমাকে অসংখ্য উপায়ে কয়েক বছর ধরে এ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে ও এ বইটি লিখতে সাহায্য করেছেন। যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তবে আমি নীচে সে সবের কিছু উল্লেখ করতে চাই:

আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই যারা ১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হয়েছেন। তাদের নাম বইটির মধ্যে ও পরিশিষ্টে উল্লেখ করে তাদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে আমি তানভীর মোকাম্মেল ও তার সম্পূর্ণ টিমকে তাদের সর্বাধিক সহযোগিতা দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই; ধন্যবাদ জানাই রশীদ হায়দারকে যিনি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য প্রমাণ সম্বলিত তার সম্পাদিত বইয়ের অনেকগুলো খণ্ড দিয়েছিলেন যা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা দুষ্কর ছিল; মফিদুল হক ও মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই আমাকে গবেষণার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ সরবরাহ করার জন্য; অচিন্ত্য ছাড়া খুলনা জেলায় পৌঁছানোই ছিল এক অচিন্তনীয় ব্যাপার আর তাই, তাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়; জাফর আহমেদ, গোলাম হাসনাইন ও তার পরিবার এবং ঢাকার করিম পরিবারকে তাদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

পাকিস্তানে আমি যাদের প্রতি কৃতজ্ঞ তারা হলেন- ফরিদ ও জাহিদা আহসান উদ্দিন ও তাদের পরিবার। ধন্যবাদ জানাই তাদের অমূল্য সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য; আরো ধন্যবাদ জানাই আব্দুল হামিদ ও হাওয়া আদমজী, মরিয়ম ওমরবাঈ ও তাদের পরিবারকে তাদের হৃদয় নিংড়ানো আতিথেয়তার জন্য; ইন্দু মিঠা ও তার পরিবারকে সঙ্গীত ও থাকার ব্যবস্থা করার জন্য; আশরাফ জাহাঙ্গীর কাজীকে আমার প্রথম গবেষণাপত্রের কথা শুনে আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য; লে. জে. আলী কুলি খানকে আমার বইটির টাইটেলের জন্য; তিনি ও ব্রিগেডিয়ার সেলিম জিয়া, ব্রিগেডিয়ার শওকত কাদির, ব্রিগেডিয়ার জাফর খান, কর্ণেল আনিস আহমেদ এবং কর্ণেল শামীম জান বাবরকে আমার গবেষণা সংক্রান্ত কাজের সাথে সংশিষ্ট অন্যান্য অফিসারের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য।

তিন মহাদেশের যাদের আমি ধন্যবাদ জানাই তারা হলেন- ইতি আব্রাহাম, রুকন আদভানি, গৌরি চাট্যার্জী, সুমন চট্টপাধ্যায়, স্টিফেন কোহেন, স্বপন দাশগুপ্ত, সুনন্দা কে দত্ত রায়, মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, ইজাজ হায়দার, ব্রায়ান হ্যাচার, ইয়াসমিন হোসেন, অনিতা ও ননিতা কার্লরা, জাহাঙ্গীর কেরামত, সুখময় লাহিড়ী, ডেভিড লুদেন, ইজাজ নবী, জারিন নখভী, ক্যালিপসো নিকোলাইডিস, পি. মাথাই, উইলিয়াম মিলাম, পলি ও'হ্যান্নন, রামমনোহর রেড্ডি, রজত রায়, আই জে সিংহ, পূরভী ভোরা, ডেভিড ওয়াস্ক্রক, পারভীন আগা ও ইরিন ব্রচা। সবশেষে আমার নিরুদ্দেশ (গবেষণার কাজে বাইরে থাকায়) থাকাকালে ধৈর্যধারণের জন্য ধন্যবাদ জানাই এ্যালান ও আমার সন্তানদের।

www.pathagar.com

আমি ধন্যবাদ জানাই আনন্দবাজার পত্রিকা, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান স্টাডিজ বিষয়ক সিগুর সেন্টার, ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঐতিহাসিকদের কার্যালয়; বৃটিশ লাইব্রেরী- বিশেষ করে সংবাদপত্র শাখা; আনন্দবাজার পত্রিকার শক্তি রায়, অমর চান্দ মঙ্গলদাস; টাটা গ্রুপের সদস্যদের। আমি ধন্যবাদ জানাই হার্স্ট এণ্ড কোম্পানী ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের পুরো টিমকে এবং বিশেষ করে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাইকেল ডায়ারকে তার উপদেশ ও সহনশীলতার জন্য।

যুদ্ধের সময় অন্ধকারে হেলিকপ্টার উড়িয়ে যাবার সময় পাইলটরা 'ডেড রেকনিং' (Dead Reckoning) ব্যবহার করেছিলেন ও একটি নির্ধারিত গন্তব্যস্থলে পৌছাতে বিশেষ দিকে একটা নির্দিষ্ট সময় বিবেচনায় এনে এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এখানে আকাশে উড়াটাই উদ্দেশ্য নয়। ১৯৭১ সালের সংঘাতের স্মৃতির মধ্যে যাওয়াও এক ধরনের ভ্রমণ করা। এখানে আংশিক দৃশ্যমান এবং অসংখ্য মূল্যবান স্মৃতি দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়েছে যার ফলে ভ্রান্তির জায়গাও অনেক। তারপরও খোলামন নিয়ে লক্ষ্য স্থির করে সম্ভাব্য সব ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে এবং সকল পক্ষের প্রতি নিরপেক্ষ ও অবাধ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেই কাজটি সম্পন্ন করার সব ধরনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে, এরপর একজন তার আদর্শ লক্ষ্যস্থলের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তীতে পৌছাবে *ইনশাল্লাহ্*।

যারা আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু বইটির বিষয়বস্তুর দায়-দায়িত্ব তাদের নয় বরং আমার।

www.pathagar.com

সূচনা

সংঘাতের ঝাপসা স্মৃতি

'কিন্তু এমন কেউ কি আছেন যে আসলেই ভালো বা মহৎ ? হয়তো মহত্ব বা দয়া নিছক ভান। মানুষ আসলে খারাপ বিষয়গুলোকে ভুলে যেতে চায় ও কল্পনায় তৈরি ভালো কিছুকে বিশ্বাস করতে চায়। এ পথেই সেটা সহজতর।'

- ভিলেজার ইন আকিরা কুরসাওয়া'স *রাশোমন* (Rashomon)

১৯৭১ সালের এক সন্ধ্যায় কোলকাতায় আমার মায়ের সাথে ১ উডবার্ন পার্কের আমাদের বাড়ি থেকে এলজিন রোড -এর কোনায় অবস্থিত নেতাজী ভবনের দিকে হাটছিলাম যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়িতে যাদুঘর ও এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যাপারটি ছিল অস্বাভাবিক। কিন্তু তারপরও অস্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ ছিল সে সময়ের সঞ্চরণশীল দিনলিপি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ পূর্ব পাকিস্তানে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল ও শরণার্থীরা আমাদের দিকে বাংলায় (পশ্চিমবঙ্গ) হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ছিল। পেশায় শিশু বিশেষজ্ঞ আমার পিতা সীমান্তের নিকটে একটি ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন। আমার বড় ভাই সেখানে হাসপাতালের কর্মকাণ্ড দেখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে ওখানে যেতে দেয়া হয়নি। শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য পরিচালিত ত্রাণ সহায়তার কাজে আমার মা অন্যান্য মহিলাদের সাথে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন ও নেতাজী ভবনের নিচতলায় আয়োজিত ওইরূপ একটি ত্রাণ সম্পর্কিত সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য আমি আমার মায়ের সঙ্গী হয়েছিলাম।

আমরা সোজা রাস্তা দিয়ে গেটের বাইরে চলে আসি ও উডবার্ন রোড অতিক্রম করে এলজিন রোড-এর দিকে বাম দিকে মোড় নিই এবং সেখানে ফুটপাতের উপর আমাদের হারিয়ে যাওয়া পোষা বিড়ালটির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখি। বিড়ালটির প্রাণহীন দেহ শক্ত হয়ে গিয়েছিল; তবে তা সহজে চেনা যাচ্ছিল। আমার মা আমাকে নিয়ে অবশেষে নেতাজী ভবনের দিকে অগ্রসর হন। ওই সন্ধ্যায় আমি শরণার্থী সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারিনি। যা কিছু আমি স্মরণ করতে পারি তা হচ্ছে বিনা দাসের সেই দয়ালু মুখমণ্ডল যা আমার পানে চেয়ে আছে আর মৃদুস্বরে বলছে, 'ওর প্রথম দু:খ, না?'

বিনা দাস ছিলেন একজন বাঙালি বিপ্লবী। তরুণী থাকাকালে তিনি বাংলার ইংরেজ লাট সাহেবকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গুলি করেন, তবে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর তিনি দীর্ঘদিন জেলে বন্দিজীবন কাটান। সে সব বিপ্লবী ও তাদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানী যেন আবার ইতিহাসের পাতা থেকে লাফ দিয়ে কোলকাতার রাস্তায় সহসাই

www.pathagar.com

উদয় হয়েছিল। এ নতুন বিদ্রোহীদের বলা হতো 'নকশাল'[১] এবং ভারতের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে তাদের মাধ্যমেই।

ওই দিনগুলোতে খুব সকালে যদি আমরা বের হয়ে গাড়ির জানালা দিয়ে তাকাতাম তাহলে রাস্তায় আগের রাতের ময়লা আবর্জনার ন্যায় পড়ে থাকা কোনো না কোনো মৃতদেহ দেখতে পেতাম। রাস্তায় পড়ে থাকা এক একটি মৃতদেহ দেখা থেকে আমাকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হতো যখন আমি একজন শিশু হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহের সাথে সে সব ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতাম। এক সকালে আমরা ময়দান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলাম আমাদের সামনের এ্যাম্বাসাডর গাড়িতে ধুপ করে অদ্ভুত একটা শব্দ হলো ও একটি মানুষের দেহ উড়ে গিয়ে রাস্তার বাম পাশে গাছের গুড়িতে আঘাত করলো। আমাদের গাড়ির প্রত্যেকে ধারণা করেছিল যে ওই মৃতদেহটি সামনে চলমান এ্যাম্বাসাডর গাড়ির পেছন থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। রাস্তায় চলমান অন্যান্য গাড়ির ন্যায় আমরাও গাড়ি চালিয়ে চলে গেলাম। আমি যখন ১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর গবেষণার কাজ শুরু করি তখন কোলকাতার অনেক বন্ধুদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক সেখানকার জনসাধারণকে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারগুলো তারা কতোটুকু মনে রেখেছে? আমার একজন সহকর্মী যিনি যে সময় কলেজ ছাত্র ছিলেন তার উত্তরে আমার হতবাক হওয়ার মতো অবস্থা হয়। তিনি বলেন, ১৯৭১-এ বাংলাদেশ সম্পর্কে তিনি যা কিছু স্মরণ করতে পারছেন তা অনেকটা অতীতের বিষয় হিসেবে ঝাপসা হয়ে গেছে কারণ সে সময় সীমান্তের ভারতীয় অংশের পশ্চিম বাংলায় তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর হাতে অগণিত মানুষ নিহত হওয়ার ঘটনা তার স্মৃতিতে গেথে আছে আরো শক্তভাবে।

যদি আমি নকশালীদের আমার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির হাতে খড়ি ধরে নিই তবে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে সংঘটিত যুদ্ধকে আমার আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাতে খড়ি ধরে নিতে হবে। সে সময় উডেন পার্ক-এর তোরণের বাইরের জগতটাকে আমার কাছে ভয়ংকরভাবে এলোমেলো মনে হয়েছিল। কোলকাতায় বড়দের মাঝে উত্তপ্ত আলোচনা থেকে আমি যা বুঝতে পেরেছিলাম তা হচ্ছে ভারতে ইংরেজ শাসন অবসানের দু'দশক পর সীমান্তের অপর পাড়ে আমার বাঙালি ভাইয়েরা আবার একবার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করেছে। এবার মনে হচ্ছে ভারতের অপর প্রান্তে তাদের স্বদেশবাসী পশ্চিম পাকিস্তানীরা সুস্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই কেন যেন তাদের সকলকে খুন বা হত্যার উদ্যোগ নিয়েছে। সকল পশ্চিম পাকিস্তানী একেকজন নিজেকে জেনারেল ভাবতে শুরু করেছিল। দেশটির মুখ্য শাসক ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান, আর রক্ত পিপাসু হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতের পক্ষে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ণ সমর্থন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে মনে হয়েছিল যে বিশ্বকে এককভাবে মোকাবিলা করে অবরুদ্ধ বাংলাদেশকে মুক্ত করতে তিনি বদ্ধ পরিকর।

অবাক লাগে যে, সে সময় পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব আমাদের শিশুকালকে কদাচিৎ স্পর্শ করেছে, এমনকি যদিও আমার মায়ের পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল পূর্ববাংলায়। আমার ঠাকুর মা আগে পুর্ব বাংলার উচ্চারণে বাংলা বলতেন। কিন্তু তারা অনেক আগে থেকে কোলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। কিন্তু মনে হচ্ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা কোলকাতাবাসীদের মাঝেও জোয়ার বয়ে এনেছে।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমানের সেই বিখ্যাত জ্বালাময়ী বক্তৃতার রেকর্ডটি আমাদের বাড়িতে ছিল। আমি সেটি এতোবারই শুনেছি যে তা আমার সম্পূর্ণ হুবহু মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল ও তার স্মৃতি আজও আমার মনে আছে। আমি শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ থেকেই *'ইনশাল্লাহ'* শব্দটার ব্যবহার শিখেছি; *"রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ"*[২]। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমার পিতা ঢাকায় যান ও শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি স্বভাবসিদ্ধভাবে আলিঙ্গন করেন এবং আবেগে প্রায় কেঁদে ফেলেন।

এদিকে শরণার্থীদের অবস্থা ছিল চরম দুর্দশাপূর্ণ, আর তাদের এ দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা সকলকেই ব্যথিত করেছিল। সে সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বনেতারা তাদের দেখতে আসতে শুরু করলেন। এদেরই একজন ছিলেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী যার পরিপাটি পোশাক ও সুর্দশন চেহারা মানব দুর্দশার সমুদ্রের মাঝে স্পষ্ট জ্বলজ্বল করছিল।

জর্জ হ্যারিসন বাংলায় গাইলেন *"ও ভগবান, খোদাতালা মোদের ছাইড়া কোথায় গেলা"*। একজন বাঙালি গায়ক গাইলেন *"শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মুজিবের কণ্ঠ সুরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রণী, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।"*

অবশেষে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো। ভারত পাকিস্তানের মাঝে আরো একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মাত্র কয়েক বছর পূর্বে যখন আমি খুবই ছোট ছিলাম। ওই যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।[৩] আমার মনে পড়ে ওই যুদ্ধের সময় উডবার্ণ পার্ক-এর বাসার ড্রইং রুমে আমি সোফায় পরিবারের অন্যান্যদের সাথে বসেছিলাম এবং রাতে সাইরেন বেজে উঠলে আমার চাচা ও চাচাত ভাই-বোনেরা যারা উপর তলায় থাকতেন তারা দ্রুত আমাদের নীচতলায় নেমে আসতেন। আমার মনে পড়ে আমি ভয় পেয়েছিলাম এবং বুঝতে পারছিলাম না কেন অন্য কেউ আমাদের উপর বোমা ফেলতে চাইছে।

'৭১ সালের যুদ্ধটা ছিল অল্প ক'দিন স্থায়ী। ভারত এ যুদ্ধে জয়ী হয় ও পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নাম নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। চারিদিকে সৃষ্টি হয় আনন্দ আর কর্মচাঞ্চল্য। এ যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন শ্যাম মানেকশ'। কিন্তু ওই সময়ের বীর ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা। একজন পাগড়ীধারী সিংহ, যিনি ইতিহাসে নিজেকে একজন দীর্ঘদেহী জেনারেল এ এ কে নিয়াজী'র পাশে বসে পাকিস্তানের পক্ষে আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করিয়ে ইতিহাসের স্থায়ী ফ্রেমে নিজের স্থান করে নেন। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে নয় মাস কারাবন্দির জীবন কাটানোর পর শেখ মুজিব বীরের বেশে ঢাকা ফিরে আসেন।

বিশ বছর পর একটি সাউথ এশিয়া নিউজ প্রোগ্রামে একজন উপস্থাপক হিসেবে লন্ডনের বুশ হাউসে বিবিসি'র জন্য একটি রেডিও ইন্টারভিউ রেকর্ডিং করছিলাম। দিল্লীতে আমার সাক্ষাতদাতা ছিলেন জেনারেল জগজিত সিংহ অরোরা। সঠিক ও উপযুক্ত শব্দটি পেতে আমি কথা বলছিলাম জেনারেল অরোরার সঙ্গে। আমি তাকে বললাম যে, আমি কোলকাতা থেকে এসেছি ও আপনাকে স্মরণ করছি একজন বীরযোদ্ধা হিসেবে। বিনম্র কণ্ঠে টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে জেনারেল অরোরা বললেন, 'ধন্যবাদ মাই ডিয়ার'। সাক্ষাতকারে অধিকাংশ সময়টা তিনি ছিলেন উত্তেজিত। তার সাক্ষাতকারটি ছিল ভারতের পাঞ্জাবে শিখদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং কঠোর ও নির্মম টাডা[৪] আইনের বিরুদ্ধে। এ বিষয়টির প্রতি আমার সমবেদনা ছিল ও সাক্ষাতকার ভালোভাবেই শেষ হয়।

www.pathagar.com

পরে শুনেছিলাম যে সাক্ষাতকারটি একটি ইন্ডিয়ান ল্যাংগুজ প্রোগ্রামে ভালোভাবে সম্প্রচারিত হয়নি যার ফলে জেনারেল অরোরা মানসিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বীর হিসেবে বিবেচিত হন অথচ তাকে তার স্বগোত্রীয় জনতার অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কথা বলায় অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। তখন আমি এ বৈপরীত্য নিয়ে কিছু একটা লেখার চিন্তা করি।[৫]

ইতোমধ্যে আমি লক্ষ্য করলাম যে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধের বীর হিসেবে জনগণের মাঝে জেনারেল অরোরার যে ভাবমূর্তি সেটা তার এক সময়ের অনেক সহকর্মীদের নিকট তেমনটা গুরুত্ব বহন করেনি। একজন লিখেছেন 'তার নেতৃত্ব কখনোই তাকে আন্তরিকভাবে একজন যোদ্ধা হিসেবে প্রতিভাত করেনি, কেননা তিনি একজন জেনারেলের উজ্জ্বল বর্ণশোভিত জীবনধারা প্রদর্শন করতে পারেননি'।[৬] অপর একজন অবজ্ঞার সুরে বলেছেন, 'তিনি সেনাবাহিনীর কোনো মাপেরই একজন কমান্ডার হিসেবে আখ্যায়িত হননি এবং তিনি অধিকাংশ ফিল্ড কমান্ডারদের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হন'।[৭] এমনকি তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত মর্যাদাহানীকর কটূক্তিও[৮] করা হয়েছে। জেনারেল অরোরা তার স্মৃতি কথা লিখে যাননি। ইতোমধ্যে আমি যখন তার মুখোমুখি হই তখন আর ১৯৭১ সাল নিয়ে তার সাথে আলোচনা করা সম্ভব ছিল না।[৯]

এটাই ছিল একজন বিজয়ী সেনাপতির ভাগ্য লিখন আর আমি ভাবছিলাম তাহলে যিনি এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেছেন তার কি পরিণতি হয়েছে। ফলাফলটি ছিল একটি চমকপ্রদ উৎঘাটন। যোদ্ধা হিসেবে জেনারেল এ এ কে নিয়াজী বর্ণাঢ্য অতীতের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তার শেষ পরিণতি ছিল বড়ই করুণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বার্মা ফ্রন্টে জেনারেল এ এ কে নিয়াজীকে একজন সফল যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় বৃটিশ সরকার। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন একজন জেনারেল যিনি একটি সাধারণ পারিবারিক অবস্থান থেকে সংগ্রাম করে উপরে উঠেছেন। জেনারেল নিয়াজী তার বইয়ে ও আমার সাথে আলোচনার সময় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় জেনারেল টিক্কা খান যেভাবে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন তার তীব্র নিন্দা করেন এবং সংকটের শেষ মুহূর্তে যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভণর সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে সরিয়ে দেয়া হয় তারও তীব্র সমালোচনা করেন।[১০] ১৯৭১ সালের এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়াজীর পৌঁছার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাঙালি বিদ্রোহীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে রাজনৈতিক সমঝোতার অভাব, চিরশত্রু ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাঙালি গেরিলা যোদ্ধাদের অব্যাহত সহায়তা দিয়ে যাওয়া এবং ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত সম্পূর্ণ এক বৈরী পরিবেশ যুদ্ধ করতে করতে পাকিস্তানী সেনারা ততোদিনে প্রকৃত পক্ষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যে কোনো হিসেবেই প্রায় একদম অসম্ভব এক পরিস্থিতি মোকাবিলা করে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিস্ময়কর ও অভাবিত যুদ্ধ কৌশল প্রদর্শন করে। তা সত্ত্বেও পাক সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের মাধ্যমে হয়েছিল লাঞ্ছিত আর নিয়াজী তার দেশবাসীর নিকট নিন্দিত হয়েছিলেন চিরশত্রু ভারতের নিকট পরাজিত হয়ে।[১১]

১৯৭১ সালের উপর প্রকাশিত অধিকাংশ বইপত্রে যে ভূমিতে যুদ্ধটা সংঘটিত হয়েছে সেখানকার জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিক অংশে রেখে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে অধিক গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ভারতীয়রা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের বিজয়কেই বড় করে প্রচার করেছে এবং বেশ কিছু সেনা কর্মকর্তা তাদের স্মৃতি কথাতেও এ সবকিছুকে নিয়েই বেশি বেশি লিখেছেন। তবে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের

www.pathagar.com

অধিকাংশই তাদের স্মৃতি কথা প্রকাশ করেননি। আর ১৯৭১ নিয়ে আলোচনায় পাকিস্তানীদের বক্তব্য তিক্ততায় ভরা, বিশেষ করে ভারতের নিকট পরাজয়ের প্রশ্নে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী চাকরিরতদের অধিকাংশের মনোভাব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিমশীতল নীরবতার চাদরে ঢাকা। বিপরীতে বাংলাদেশীরা অত্যন্ত নাটকীয়তা ও উচ্চবাচ্যের মাধ্যমে পাকিস্তানীদের 'দুর্বৃত্ত' ও বাঙালিদের 'নিপীড়িত' হিসেবে চিহ্নিত করার তত্ত্ব উপস্থাপন করে চলেছে ঘটনার সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্তকে বিশেষ পাত্তা না দিয়েই এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ ছাড়াই। সংঘাতে ব্যাপ্ত তিন পক্ষের সবার বর্ণনাই একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট যেখানে বাংলাদেশীদের বিবরণ বরাবরই গভীর ক্ষোভের সংমিশ্রণ এ কারণে যে তারা মনে করে তাদের ভোগান্তির কথা বিশ্ব সঠিকভাবে বিবেচনা করেনি। তারপরও তিন দশক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বাংলাদেশীরা উপযুক্ত তথ্য-উপাত্ত, ইতিহাসের সঠিক-সুচিন্তনীয় বিশ্লেষণ ও গবেষণার মাধ্যমে সামগ্রীকভাবে ১৯৭১ সালের ইতিহাসকে সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং এর প্রকৃত দলিল তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে; যদি তারা তা করতে পারতো তাহলে হয়তো সে সব বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হতো। কাজেই ১৯৭১ সালের সংঘর্ষকে জানতে প্রকৃতপক্ষে আরো অনেক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

১৯৭১ সালের উপর লেখা দু'জন বিশিষ্ট মার্কিন পণ্ডিত রিচার্ড সিসন ও লিও রোজ (Richard Sission & Leo Rose) -এর গ্রন্থ *'যুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতা : পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের জন্ম' (১৯৯১)* [*War & Secession : Pakistan, India & The creation of Bangladesh (1991)*] এর প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৭১ সালের সংঘর্ষের উপর গবেষণা, বিশ্লেষণ ও বিষয়ানুগতা বা বাস্তব নির্ভরতা বিবেচনায় গ্রন্থটি অন্যতম সেরা গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সিসন ও রোজ ১৯৭০-এর দশকে এ সংক্রান্ত গবেষণার কাজ করেন এবং পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই সময়ের ঘটনায় সম্পৃক্ত মূল ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। ওই সব ব্যক্তিদের অনেকেই এর মাঝে পরলোকগমন করেছেন, কিন্তু তাদের দেয়া মূল্যবান তথ্যসমূহ এখনও রয়ে গেছে। আমি সিসন ও রোজ-এর গ্রন্থটি পড়ে ১৯৭১ সালে কি ঘটেছিল তা জেনে হতবিহ্বল হয়ে পড়ি কারণ তারা যা বর্ণনা করেছেন বা তুলে ধরেছেন তা কোলকাতায় আমার শৈশবকালের স্মৃতির চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা ।

সিসন ও রোজ-এর গ্রন্থটিতে প্রকৃতপক্ষে ১৯৭১ সালের কূটনৈতিক ও নীতিনির্ধারণী বিষয়গুলোর উপর জোর দেয়া হয়েছে আর আমার গবেষণায় বোঝাতে চেয়েছি কীভাবে সংঘর্ষটি একদম তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে আমি আরো আলোকপাত করেছি পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে কীভাবে দু'দল মানুষের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো যেখানে একদল ছিল যারা স্বাধীন বাংলাদেশ চেয়েছিল, আর অপরদল যারা পাকিস্তানের প্রতি আস্থা রেখে চেয়েছিল অখণ্ড পাকিস্তান, যদিও স্বাধীনতাকামীদের সাথে ভারত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়ে এ অবস্থার আরো আবনতি ঘটায়।

গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করতে একটি বিশেষ ঘটনাকে বা বিশেষ স্থানকে নির্বাচন করে অনেকগুলো উৎসের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সব পক্ষের যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে যতদূর সম্ভব একটি পূর্ণ চিত্র তৈরি করা হয়।

আমি বরং এ কাজের জন্য সঠিক স্থানে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। একজন বাঙালি

www.pathagar.com

হিসেবে পেয়েছি বাংলাদেশীদের সহযোগিতা। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন, সাক্ষাতকার গ্রহণ ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট থেকে পেয়েছি সব ধরনের সহযোগিতা এবং বাংলাভাষা জানার সুবাদে আমার পক্ষে সেখানে বাংলায় লেখা সব ধরনের তথ্যও সংগ্রহ করা ছিল অধিকতর সহজ। বন্ধু ও সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং বেশ পরিশ্রম ও ধৈর্য ধারণ করে পাকিস্তানে যাওয়া এবং সেখানে অবস্থানরত সে সব সেনা কর্মকর্তা যারা পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তাদের নিকট পৌছানো নিঃসন্দেহে দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের ঘটনার মতো স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য এ কাজটি ছিল প্রকৃতপক্ষেই কঠিন কাজ।

এ বইটিতে বিশেষভাবে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করার মতো ঘটনাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে তাদেরই সাথে আলোচনা করে যারা বিশেষভাবে স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন এবং গভীরভাবে ঘটনাসমূহ পর্যালোচনা করেই কেবল এ সবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রকৃত সময়সীমা শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে ও এর শেষ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিনমাস পর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে। এ ঘটনাসমূহের আলোচনা বিস্তৃত ছিল পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন স্থানসমূহে-যশোর, খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাও- এ; আর তা ছিল শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে, ঢাকা শহরের কেন্দ্র থেকে ভারত পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে যা ভারত দ্বারা তিনদিকে বেষ্টিত।

বইটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় ২০০৩-৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে, যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি-প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাতকার গ্রহণের মধ্যদিয়ে। এ ছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বর্ণনা, ইংরেজী ও বাংলায় যার যার প্রকাশিত স্মৃতিকথা, ছবি, ভিডিও চিত্র এবং ওই সময়ের বিদেশী সংবাদ মাধ্যম থেকেও প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়েছিল। এ সময় আমি বাংলাদেশ ও পাকিস্তান অসংখ্যবার ভ্রমণ করেছিলাম। বেশ কিছু গবেষণার কাজ করা হয়েছিল বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

আমি ঘটনার স্থান সম্পর্কিত বা সরেজমিনের অধিকাংশ কাজটি প্রথমে সেরে নেই বাংলাদেশে। বাংলাদেশীদের মাঝে যেন বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে তারা স্বাধীনতার জন্য আত্মনিবেদিত এবং এ স্বাধীনতা অর্জনে তাদের যে আত্মত্যাগ, মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তারা সে সব স্মৃতি সংরক্ষণ করতে চায়। সেখানে যে কোনো প্রকার সহযোগিতার কোনো অভাব আমি উপলব্ধি করিনি। আমি যা চেয়েছি বা যেখানে যাবার প্রয়োজন সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে তারা আমাকে সাহায্য করেছে। আমাকে তাদের দেশের প্রতি আগ্রহী দেখে তারা যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিল। তাদের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তায় আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম। তারা তাদের বেদনাদায়ক স্মৃতিসমূহ খুব আগ্রহের সাথে তুলে ধরেছিল। কখনো কখনো নীরবে শুধু তাদের গল্পগুলো শ্রবণ করাও ছিল কষ্টকর। এ রকম একটি ঘটনা ছিল যেখানে চুকনগরের একজন মহিলা তার স্বামী ও সন্তানকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার বর্ণনা দেবার সময় বার বার শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়ছিলেন। এ রকম পরিস্থিতিতে সব সময় আমি নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম যে হাতের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। একবার আমি মিসেস শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীকে ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর মাসে বাঙালি জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী তার স্বামীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার সময় তার নিকট দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলে তিনি জানালেন এতে তিনি কিছু মনে করবেন না। বরং তিনি বললেন ন্যায় বিচারের স্বার্থে যতোবার প্রয়োজন ততোবার এ ব্যাপারে কথা বলবেন।

দুঃখের বিষয় আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করার লোকের সংখ্যা এতোই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে আমার পক্ষে সঠিক তথ্য পেতে কষ্ট হচ্ছিল আর তাই আমি নম্রভাবে সঠিক তথ্যদাতাদের মধ্যে কেবল যারা স্বচক্ষে ওই সময় ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে তাদের অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই যাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে তারা প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে সবদিক যাচাই-বাছাই করে তথ্য সংগ্রহ ও নিরপেক্ষ গবেষণার ব্যাপারে অভ্যস্ত নয় বলে আমার মনে হয়েছে। অনেকের মধ্যে আবার তাদের প্রতিপক্ষের বিরূদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে অতিরিক্ত ঘৃণা বা তিক্ততা। এমনকি অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকও প্রায় না বুঝেই প্রকৃত সত্য ও গুজবকে মিশিয়ে ফেলেছেন বা এমনও দেখা গেছে যে একটি প্রশ্নের জবাব এমন এসেছে যে প্রশ্নের সাথে জবাবের কোনো সম্পর্ক নেই। সাধারণভাবে যা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি, তা হচ্ছে ১৯৭১ সালে যারা প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের দেয়া তথ্য উপাত্ত যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য। তাদের অভিজ্ঞতাগুলোও ছিল হৃদয়বিদারক। যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকের বর্ণনার মূলে ছিল নিজের ঢোল পেটানো বা নিজেকে উঁচুতে তুলে ধরা অথবা বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর নিজেকে 'সঠিক' পক্ষে উপস্থাপন করার প্রাণান্ত চেষ্টা। তবে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার ছিল-ঢাকায় বা বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তিদের মতামত নেয়া যারা যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি বা ক্ষতিরও শিকার হননি। কারণ কোনো তথ্যের সত্যাসত্য বিবেচনা না করেই তারা তাদের 'মতামত' দিয়ে যাচ্ছিলেন। একইরকমভাবে পাকিস্তানেও অনেকের ক্ষেত্রে একইরূপ ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এদিকে হঠাৎ করেই বাংলাদেশে আমার জন্য এক অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়- সেখানে যারা আমাকে সহায়তা করতে চাইছিলেন তারা সকলেই ছিলেন কঠিনভাবে 'স্বাধীনতার স্বপক্ষের' এবং তারা কোনোভাবেই বাংলাদেশের মধ্যকার 'ঐক্যের পক্ষের' কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলতেন না। এর উপর এমনকি 'স্বাধীনতার' পক্ষে ভাগ ছিল বেসামরিক ও সামরিক অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে, এবং বেসামরিকদের মধ্যে ছিল নানা রকম রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বিভক্তি। এরা সবাই যেন এখনো নিজেদের মধ্যেই ১৯৭১ নিয়ে যুদ্ধ করছিল। অনেকেই চাননি যে আমি সকল পক্ষের সাথে ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে খোলা মনে কথা বলি, নিরপেক্ষভাবে ঘটনার বিস্তারিত জানি। আমার এরূপ আগ্রহকে তারা ভালোদৃষ্টিতে দেখেননি, স্বাগত জানাননি। যখন আমি খোলামন নিয়ে ওই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে চাকরিরত পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের সাথে ঘটনার বিষয়ে কথা বলার ব্যাপারে আমার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করি তখন অনেক বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী অন্ধ ঘৃণা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার সাথে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করে বা যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের কোপানলে পড়েছিল - এমন লোকদের সাথে যোগাযোগ বা তাদের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করলে তেমনভাবে কোনো সহযোগিতা সহজে পাওয়া যায়নি। অবাঙালিদের বিরূদ্ধে বাঙালিদের নিষ্ঠুরতা নিয়ে প্রকাশিত পাক সরকারের দলিলপত্রে উল্লেখিত তথ্য উপাত্ত দ্বিতীয়বারের মতো যাচাই বাছাই করায় আমার আগ্রহের কথা জানতে পেরে একজন 'লিবারেল' বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী

www.pathagar.com

বললেন, 'আপনি কেন শ্বেতপত্র ব্যবহার করছেন? এর সবই মিথ্যা।' অবশ্য খুলনায় বাঙালিরা খোলাখুলিভাবে সেখানে অবাঙালি 'বিহারীদের' হত্যাকাণ্ডের কথা অকপটে উল্লেখ করেছেন।[১২] আমি যখন ময়মনসিংহ সেনানিবাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি তখন মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর- এর পরিচালক জানালেন যে, সেখানে কোনো সেনানিবাস ছিল না। শিগ্রই সেখানকার একটি স্থান পরিদর্শন করে নিশ্চিত জানতে পারলাম যে ময়মনসিংহে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-ইপিআর- এর সেন্টার অবস্থিত ছিল যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়েছিল। স্থানীয়ভাবে ওই স্থানটিকে 'সেনানিবাস' বলা হতো যা শ্বেতপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল। তারপরও মনে হয়েছে যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সর্বাপেক্ষা সন্দেহজনক সব তথ্য ও বাঙালিদের অসমর্থিত বর্ণনাকে প্রশ্নাতীতভাবে সঠিক মনে করতেই আগ্রহী ছিলেন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমার সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় অসংখ্য 'সাহায্যের' মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করার বিষয়টি তবে পাকিস্তানে প্রথম দিকে সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় অমন কাউকে কথা বলায় রাজী করানো যিনি ওইসময় পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। আমার উদ্দেশ্যেসাধনে আমি চেয়েছিলাম ওই সব পাক সেনা কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে যারা ১৯৭১ সালের ওই সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন বা আমি যে সব এলাকায় ব্যাপকভাবে গবেষণার কাজ করছিলাম সেখানে নিয়োজিত ছিলেন। যদিও আমি কাজ শুরু করেছিলাম পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজীর সাথে, তারপরও আমি প্রাথমিকভাবে নিম্নপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম যারা সামরিক আইনের আওতায় তাদের কর্তব্যে নিয়োজিত ছিলেন বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করেছেন।

সংখ্যার বিবেচনায় অত্যন্ত কমসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিক যুদ্ধকালীন অসাধারণ এক পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিল এবং অনেক কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে নিজেদের কাঁধে তাৎক্ষণিক দায়িত্ব তুলে নিতে ও বহন করতে হয়েছে যা শান্তিকালীন সময়ে বা প্রচলিত যুদ্ধকালীন কখনোই তাদের ঘাড়ে এসে চাপতো না। আর আমি ওই সব সৈনিক ও অফিসারদের সাথেই কথা বলতে চেয়েছিলাম।

আমার জাতিগত, ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয় ছাড়াও একজন নারী হিসেবে আমার কাছে পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তারা ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতার কথা খোলা মনে সহসাই বলবেন এমনটা আশা করাও হয়তো ঠিক ছিল না। একমাত্র শিক্ষাগত পটভূমি ছাড়া তাদের ধারণা বা বিশ্বাস মতে আমার ব্যাপারে যা কিছু 'বেঠিক' হওয়ার কথা তার সবকিছুই হয়তো আমার ছিল। এ কারণেই সম্ভবত জেনারেল নিয়াজী আমাকে প্রথমেই 'না' বলে দেন ও এ ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট ধৈর্য-ধারণ করতে হয়েছিল এবং অবশেষে পাকিস্তানে আমার সুহৃদের মাধ্যমে তাকে ও তার পরিবারকে আমার সাথে কথা বলার জন্য রাজী করাতে হয়েছিল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। কিন্তু যখন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তারা আমার সাথে সাক্ষাত করলেন তখন তারা আমার নিরপেক্ষ অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। এবং এভাবেই প্রাথমিক পর্যায়ের অস্বীকৃতি পাল্টে গিয়ে পরিণত হলো স্বীকৃতিতে ও তারা আমাকে যেভাবে গ্রহণ করলেন তা কোনোভাবেই বাঙালিরা যেরূপ আবেগের সাথে আমাকে বরণ করে নিয়েছিল তার চেয়ে কম ছিল না।

একইরকম পরিস্থিতি আরো অনেক অফিসারের ক্ষেত্রে হয়েছিল। দীর্ঘসময় ও যথেষ্ট চেষ্টার

www.pathagar.com

প্রয়োজন হলেও একজন একজন করে সেনা কর্মকর্তাদের সাক্ষাতকার নিয়ে আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম। এ দীর্ঘ কর্মসূচিতে আমাকে পাকিস্তানী ও মার্কিন বন্ধুরা বিভিন্ন সেনা কর্মকর্তার অবস্থান নির্ণয়ে ও তাদের সাথে সাক্ষাতের সুপারিশ করে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। অনেক কর্মকর্তা আমার নিরপেক্ষতা দেখে হতবাক হয়েছেন এবং তিনি অন্যান্য কর্মকর্তাদের ঠিকানা দিয়ে ও সুপারিশ করে সাক্ষাতের ব্যাপারে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তিন ডজন সেনা কর্মকর্তা ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। আবার ওই তিন ডজন কর্মকর্তার অধিকাংশের জন্য আমিই ছিলাম প্রথম গবেষক যার কাছে তারা ১৯৭১ নিয়ে কথা বলেন। এদের মধ্যে দু'জন বাঙালি কর্মকর্তাও ছিলেন যারা পাক সেনাবাহিনীর আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। প্রায় সকল কর্মকর্তাই ততোদিনে অবসরে চলে গেছেন ও প্রায় সকলেই নাম প্রকাশ করার শর্তে সাক্ষাতকার প্রদান করেন। মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন নাম না প্রকাশ করার শর্তে।

বাংলাদেশের মতোই পাকিস্তানে আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার কোনো ঘাটতি ছিল না। একজন আগন্তুক হিসেবে বাংলাদেশে যেমন বলতে শুনেছি 'ভাত খেয়ে যান' তেমনি পাকিস্তানে যেন মনে হয়েছে 'বাড়ি থেকে দূরে আর এক বাড়িতে' আছি এবং তা করাচি থেকে পেশাওয়ার অবধি। এসব পাকিস্তানীদের মধ্যে যেমন দেখেছি তাদের অবস্থানকে সঠিক বলে বিশ্বাস করতে ও বিশ্বজনমতকে অবিবেচক হিসেবে চিহ্নিত করতে তেমনি তাদের মাঝে দেখেছি অনুতপ্ত হৃদয় আর মর্মপীড়া। এবং ১৯৭১ সালের সংকটে ভুল পথ অবলম্বনের জন্যও তারা নিজেদের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে থাকেন। নিজ দেশের নেতাদের প্রতি ও চিরশত্রু ভারতের প্রতিও তাদের বিবমীষা লক্ষ্য করা গেছে। অপরদিকে বাংলাদেশীদের মতো পাকিস্তানীদের প্রতি যেভাবে ঘৃণা প্রকাশ করা হয় পাকিস্তানীদের বরং সাবেক স্বদেশীদের (পূর্ব পাকিস্তানী - বর্তমান বাংলাদেশী) প্রতি খুব কমই বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখেছি।

আমার এ গবেষণার উৎসই ছিল স্মৃতি থেকে নেয়া তা লিখিতভাবেই হোক কিংবা মৌখিকভাবেই হোক এবং অনেক সময় আবার বিভিন্ন দলিল দ্বারা এ গবেষণার কাজটি সমর্থিত হয়েছে। যারা ঘটনার সাথে ও ঘটনা ঘটাকালীন উপস্থিত ছিলেন নিঃসন্দেহে তাদের স্মৃতিসমূহ অবশ্যই পরিষ্কারভাবে অন্যদের অপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে, কিন্তু স্মৃতিরও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। সময়ের সাথে সাথে অনেক স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে সঠিক নাও হতে পারে। কোনো প্রত্যক্ষদর্শীও যে আপনাকে ভুল তথ্য দেবে না বা কোনো তথ্য গোপন করে যাবে না তারও নিশ্চয়তা নেই। আবার এ ছাড়া বাস্তব ঘটনা জানার বিকল্প কোনো রাস্তাও নেই। তবে এ সমস্যার জন্য একাধিক উৎসের মাধ্যমে ঘটনার সত্যতা যাচাই করাই হতে পারে উত্তম পদ্ধতি যা আমি অনুসরণ করেছিলাম। ১৯৭১ সাল হচ্ছে অনন্ত গল্পের আঁধার, যার অনেক কিছুর প্রকাশনাই ভবিষ্যত বিবেচনার জন্য রেখে দিতে হবে।

জনগণ যেমন ধারণা করে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলোর বর্ণনা ও প্রতিবেদন কিন্তু তেমন এককভাবে তথ্যের বিশ্বস্ত সূত্র নয়। ঘটনার সাথে জড়িত দেশগুলো- বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনগুলো যুদ্ধের একপেশে বর্ণনায় পরিপূর্ণ ছিল ও সম্পূর্ণভাবে নিজের পক্ষে প্রচারণার কাজে নিয়োজিত ছিল বলে মনে হয়েছে। এমনকি বিদেশী সংবাদদাতাদের তৈরি প্রতিবেদনগুলোকেও সতর্কতার সাথে খতিয়ে দেখতে হবে; যেখানে প্রতিবেদককে ভিন্ন কেউ ঘটনা সম্পর্কে যা বলেছে সেখান থেকে চাক্ষুষ সাক্ষীর বর্ণনাকে মেলাতে হবে পৃথকভাবে। সাক্ষাতকার ও স্মৃতিকথার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে

www.pathagar.com

'চাক্ষুষ সাক্ষীর' বর্ণনাও অনেক সময় মিথ্যা বা অনিশ্চিত হতে পারে। তবে এখানে কারো কিছু করার নেই, বরং ওই ঝুঁকি নিয়েই গবেষণার কাজ করতে হয়। এমনকি একই প্রতিবেদনে থাকতে পারে প্রতিবেদক যা দেখেছেন তার উপর ভিত্তি করে কিছু বিশ্বাসযোগ্য অংশ এবং কিছু অবিশ্বস্ত অংশ যা কিনা নেয়া হতে পারে 'কান কথা'র উপর ভিত্তি করে। ১৯৭১ সালের ১৩ জুন *'সানডে টাইমসে'* প্রকাশিত এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের একটি রিপোর্টকে এ ক্ষেত্রে বেশ কৌতহলোদ্দীপক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।[১৩] ওখানে তিনি কুমিল্লা থেকে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় ২৫-২৬ মার্চ রাতে হিন্দু অধ্যুষিত পুরান ঢাকার শাঁখারীপাড়ায় (শাঁখারীপট্টি) পাক সেনাদের আক্রমণের কথা উল্লেখ করেন যে, সেখানে তিনি নিজে ঘটনাস্থলে যেমন উপস্থিত ছিলেন না তেমনি প্রতিবেদনটিতে যে সব সোর্সের কথা বলেছেন তা পরবর্তীতে ওই এলাকায় জীবিতদের সাক্ষাতকার নেয়ার পর আমার কাছে ততোটা নির্ভুল বলে মনে হয়নি।

এমনকি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মাধ্যমকেও যুদ্ধরত পক্ষগুলো ব্যাপকভাবে অপব্যবহার হয়েছে। পাক সামরিক অভিযানের নিন্দা জ্ঞাপন করে গ্রন্থিত ম্যাসকারেনহাসের যে নিবন্ধটি ব্যাপক প্রচার পায় খুব কম লোকেই জানে যে, ওই একই নিবন্ধে বাঙালিদের দ্বারা অবাঙালিদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে আবাঙালিদের হতাহতের সংখ্যা কোনো অংশেই সেনাবাহিনীর হাতে নিহত বাঙালিদের চেয়ে কম ছিল না। ম্যাসকারেনহাসের প্রতিবেদন নিয়ে সাধারণ্যে যে ধারণা করা হয় প্রকৃতপক্ষে তা অনেক বেশি নিরপেক্ষ ছিল। সংবাদ মাধম্যের অপব্যবহার করার আরো একটি অমার্জিত প্রচেষ্টার উদাহরণ হচ্ছে *সানডে টাইমস্*- এর সাংবাদিক নিকোলাস টমালিনের প্রতিবেদনগুলো। এখানে *'সানডে টাইমসে'* ১৯৭১ সালে ১১ এপ্রিল নিকোলাস টমালিনের একটি প্রতিবেদন বাঙালি জাতীয়তাবাদী অবস্থানের পক্ষে মনে হওয়ায় তা বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা দলিলে (চৌদ্দ খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত করা হলেও, আবার ওই একই নিকোলাস টমালিনের ২ ও ৪ এপ্রিল প্রকাশিত প্রতিবেদন যেখানে যশোরে তিনি বাঙালিদের দ্বারা বেসামরিক অবাঙালি হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেন তা গ্রহণ করা হয়নি।[১৪] অথচ ওই প্রতিবেদনটিতে ছিল নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। এমন অসংখ্য ঘটনা ১৯৭১ সালের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করেছে।

আমি এ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলাম। আমি ১৯৭১ সালের যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছি চটজলদি সেই বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটের ব্যাপক কোনো পরিবর্তন আশা করিনি। কয়েক দশকের অসমাপ্ত বৈঠক, পক্ষপাতিত্ব ও অনির্ভরযোগ্য তথ্যের কারণে যা ঘটেছিল সেগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে না দিলে কেউই একটি অর্থবহ বিশ্লেষণ করতে পারতো না। আমি ভেবেছিলাম আমি সকল পক্ষের নিরপেক্ষ ঘটনা প্রবাহের অবাধ ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করে বিস্তৃতাকার মানবিক পরিস্থিতির চমৎকার বোঝাপড়ার জন্য এ কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হবো।

কিন্তু সকল ঘটনা প্রবাহ সংশ্লিষ্ট মাল মশলা একত্রে গ্রন্থনার পর যে গল্পটি উঠে আসে তাতে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। উসকে দেয়ার মতো ও প্রভাববিস্তার করতে পারে এমন কিছু বর্ণনা সেখানে ছিল; এগুলোর মধ্যে রয়েছে- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে বিস্তর তফাৎ, একটি শান্তি আলোচনার ব্যর্থতা, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সামরিক শক্তির প্রয়োগে সামরিক শাসকের প্রচেষ্টা, ভ্রাতৃ হত্যার ন্যায় একটি ভয়ংকর যুদ্ধে মানবিক বিপর্যয় এবং শত্রুর দ্বারা দেশটি দ্বিখন্ডিত করার সুযোগটি লুফে নিয়ে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের

www.pathagar.com

হস্তক্ষেপ। এ সব লোকদের ঝাপসা স্মৃতিতে যা ছিল তা হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশে ব্যাপক প্রচারিত যুদ্ধ বর্ণনা যা বহির্বিশ্বেও প্রচারিত হয়েছিল এবং সেটাই বিজয়ী পক্ষের হয়ে প্রভাবিত বর্ণনা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। কখনো কখনো পার্থক্যের তুলনা আমাকে খানিকটা যুক্তিসঙ্গত আস্থার সাথে সাহায্য করেছে পূর্ব পাকিস্তানে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল তা জানার জন্য। অন্যান্য ক্ষেত্রে এ সব দ্বন্দ্ব মিটমাটের অসাধ্যই রয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে 'সত্য ও সামঞ্জস্য বিধানের' উদ্যোগ না থাকায় ১৯৭১ সালের সংঘাতে জড়িত সকল পক্ষের মধ্যে আজও তিক্ত বিভক্তি রয়ে গেছে। ২০০৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরর একটি সম্মেলনে আমি একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করি যেটির সর্বশেষ পরিবর্ধিত সংস্করণ ভারতের গবেষণা পত্রিকা *ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি'* অক্টোবর ২০০৫ সংখ্যায়[১৫] প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান সংঘাতে জড়িত সকল পক্ষের মধ্যেই দেখা দেয় তীব্র প্রতিক্রিয়া। মনে হয়েছিল সকল পক্ষই আমাকে দেখতে চেয়েছিল যেন আমি কোনো একটা পক্ষ নিলেই তারা খুশি হয়, তা তাদের নিজেদের পক্ষে হোক অথবা তাদের বিরোধীপক্ষে হোক। কিন্তু তারা আশ্চর্য হয়েছিল আমার নিরপেক্ষ অবস্থান দেখে। প্রথম দিকে পাকিস্তানে মুখ্য ব্যক্তিদের সাথে কথা বলাই আমার জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এরমাঝে আমার প্রথম নিবন্ধটি প্রকাশ হওয়ার পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত লাভ সহজ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশে অসংখ্য লোক প্রথমদিকে আমাকে সাহায্য করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল, অনেকে ছিল রীতিমতো উত্তেজিত। তবে 'স্বাধীনতার স্বপক্ষের' বলে যারা নিজেদের দাবি করেছিল তাদের অনেকেই পরবর্তিতে যখন দেখলেন যে আমি সকল পক্ষের কথাই তুলে ধরতে চাচ্ছি তখন তারা পিছিয়ে যান। পাকিস্তানী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে আরেক দল আমাকে অনেক তথ্য দিবে বলে অনুরোধ করে। আবার অনেক বাংলাদেশী আমার নিবন্ধ পুরোটা না পড়ে ও যাচাই বাছাই না করেই আমাকে দোষারোপ করতে থাকে। কিছু 'দেশপ্রেমিক' ভারতীয় আমার নিন্দা করতে থাকে পাকিস্তানকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনায় আনার জন্য। কিছুসংখ্যক যারা নিজেদের বিহারী বলে পরিচয় দিয়েছিল তারা আমাকে ধন্যবাদ জানায় তাদের প্রতি যে দুর্ভোগ নেমে এসেছিল সে সব ঘটনার সঠিক বর্ণনা দেয়া ও সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। অন্যদিকে ভারত ও বাংলাদেশের উদার গুণীজন এবং সমালোচকরা প্রশংসা ও উৎসাহদানের সাথে সাথে গঠনমূলক সমালোচনাও করেছিলেন যা গবেষণা কাজটিকে আরো মজবুত করতে সহায়ক হয়েছিল।

এ বইটি লিখতে বিচ্ছিন্নতা ও সংশ্লিষ্টতার মাঝে সঠিক ভারসাম্য বের করাটাই ছিল প্রকৃত চ্যালেঞ্জ। গবেষণার প্রথমদিকে, জেনারেল নিয়াজীর সাক্ষাতকারের পর আমি তাকে বলেছিলাম কোনো ধরনের আবেগ ছাড়াই আমি ১৯৭১ সাল সম্পর্কে লেখার চেষ্টা করছি। তিনি বলেছিলেন, 'না, আবেগ নিয়েই তুমি লিখে যাবে, তা তোমার লেখার জন্য ভালো হবে।' পরবর্তীতে আমি তার ওই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের স্মৃতিতে কোনো আবেগের সংমিশ্রণ ছাড়া আমি এ কাজটি করতে উৎসাহিত হতাম না। সকল আবেগকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে লেখা সম্ভব ছিল না। বরং বাস্তবতার প্রতি অন্ধ হওয়াটাই ছিল সমস্যা। ১৯৭১ সালের ঝাপসা স্মৃতিই মানবতাবোধ সমৃদ্ধ গল্প বলার পথ খুলে দেয়। এবং এ বিষয়টির জন্য হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মতো আবেগ ছাড়া দ্বন্দ্বটিকে মনুষ্যচিত করা অসম্ভব হতো।

www.pathagar.com

আমি বাংলাদেশীদের জন্য প্রচুর সহানুভূতির সাথে এ গবেষণাটি আরম্ভ করেছিলাম কেননা তারা ছিল ভুক্তভোগী ও ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকারী। অপরদিকে সামরিক জান্তা বৈধভাবে নির্বাচনে জয়ী দলকে ক্ষমতায় বসাতে অস্বীকার করে বাঙালি বিদ্রোহীদের দমন করতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল। আমি অভিযোগটির সাথে একমত যে বাংলাদেশের বেদনাদায়ক জন্ম খুব দ্রুত বিশ্ব রাজনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু কি কারণে তেমন নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সম্ভবত বাংলাদেশ দরিদ্র হওয়ার কারণে- যা অনেক বাঙালিই বিশ্বাস করেন। স্নায়ু যুদ্ধকালে ও তার পরের বিশ্বে কোনো ভূমিকা রাখাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ জন্য অবশ্য বাংলাদেশীরাই স্পষ্টত দায়ী কেননা স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও ১৯৭১ সালের সংঘাতের কোনো সঠিক দলিল ও বিশ্লেষণমূলক কোনো ইতিহাস রচনা করতে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমি আশা করেছিলাম আমার কাজ শুরু হবে ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সাবধানে তা গ্রন্থনা করা এবং সরেজমিনে কয়েকটি ঘটনার চিন্তাশীল বিশ্লেষণ করা যা সামগ্রিকভাবে সমর্থ হবে সংঘাতের অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করতে।

আমার গবেষণার কাজ শেষ করলেও ১৯৭১ সালের সংঘাতে যারা প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিত হয়েছিলেন তাদের প্রতি আমি যথেষ্ট সহানুভূতি অনুভব করেছি। এদিকে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর বাঙালিরা অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল; একদল যারা স্বাধীনতা চেয়েছিল আর একদল যারা অখণ্ড পাকিস্তানের ঘোর সমর্থক ছিল, অন্য এক দল যারা শুধুমাত্র স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে ছিল কিন্তু কখনোই বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি, কিছু লোক যারা যে পক্ষই সমর্থন করেছে তাদের পক্ষে জীবনবাজি রেখে লড়েছে, আরেক পক্ষে ছিল 'ডক্টর জিভাগো' মতো মানুষ যারা 'শুধু বাঁচতে চেয়েছে' কিন্তু শেষমেষ পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পায়নি। এদের মধ্যে যোদ্ধা ছিল, অযোদ্ধাও ছিল; ঘটনার শিকার ছিল আবার ঘটনার সাথে জড়িত অপরাধীরাও ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীরাও রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে এক জোট হয়ে কিছু উপস্থাপন করেনি। সামরিক বাহিনীর প্রসঙ্গই সেখানে বেশি এসেছে কারণ তখন তারা যেমন একদিকে সামরিক শাসন পরিচালনা করছিলো তেমনি পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনেও সক্রিয় ছিল।

বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহের বিস্তারিত গবেষণার মাধ্যমে ১৯৭১ সালের সংঘাতের নীলনকশা ও নির্দেশনার বৈচিত্র্যময় বর্ণনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা করতে এ গ্রন্থটি কালক্রমানুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

একটি ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের মারাত্মক হিংস্রতায় ভুক্তভোগীরা ছিল প্রতিটি জাতিগত ও ধর্মীয় দল থেকে এবং রাজনৈতিক বিভক্তির উভয় পক্ষ থেকে। অপরাধীরাও ছিল এমন ধারায় বিভক্ত। মানবিক গুণাবলী সংক্রান্ত বিষয়গুলো ছিল অনুপস্থিত। উভয় পক্ষের ছিল আইনগত রাজনৈতিক যুক্তিতর্ক ও আদর্শবাদী অনুসারী এবং সে সাথে ছিল সুযোগসন্ধানী-রাও যারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে প্রয়োজনে অমানবিক আচরণেও সচেষ্ট ছিল। অসংখ্য বাঙালি যারা আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল তারাও নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল; অনেক পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা চমৎকার যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রচলিত যুদ্ধের মাঝে একটি অপ্রচলিত যুদ্ধে তাদের সেরা যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে । আরো বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধটা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝেই কেবল বিস্তৃত ছিল না বা গণতন্ত্র ও প্রচণ্ড ক্ষমতাধর কোনো কর্তৃপক্ষের মাঝে ছিল না।

প্রথম অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভুল উপস্থাপনার বিষয়টি বা তাকে পাশ কাটিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া, পরবর্তীতে ব্যর্থ আলোচনা ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বিক্ষোভের ধরণ যা পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করেছিল তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চব্যাপী সময়কালের ঘটনাবলীর উপর যখন পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত শেখ মুজিবের একটি সমান্তরাল সরকার চালু ছিল। তৃতীয় অধ্যায়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে কীভাবে বিদ্রোহী বাঙালিদের দমন করতে সামরিক শক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছিল এবং ২৫-২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হামলার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়ে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের দশটি বিশেষ নির্বাচিত ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যে ঘটনাগুলো পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে গোটা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে যুদ্ধের সময় এককভাবে বড় দুর্ঘটনাগুলোর উপর এবং ব্যাপক গণহত্যার অভিযোগ নিয়ে- বিশেষভাবে হিন্দুদের উপর ভয়ভীতি ও নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ নিয়ে। সপ্তম অধ্যায়ে কিছু নির্বাচিত ঘটনার উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কীভাবে আন্ডারগ্রাউন্ডের গোপন যোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। অষ্টম অধ্যায়ে যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে রক্তাক্ত সংঘর্ষের তিক্ততা নিয়ে আলোকপাত করা ছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম মাসে ও যুদ্ধের শেষ মুহূর্তে ঢাকায় ব্যাপক বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল্যায়ন করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে সংখ্যা ও শব্দের ব্যবহারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে প্রকৃতই ত্রিশ লাখ লোক নিহত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে সঠিক সংখ্যা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের সংঘাতের বিষয়ে সঠিক তথ্য জানতে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সংকটের প্রকৃত ধরণটাকে অস্বীকার করা। যা হোক গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে সংঘাতের প্রকৃত কারণ বাংলাদেশের অনেকাংশে ও ভারতে অস্বীকার করা হয়েছে। অনেকভাবেই বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের রেশ ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো করে ইতিহাস তৈরি করেছে। এ সব ক্ষেত্রে আবার সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয়টি হচ্ছে স্বাধীনতার স্বপক্ষের লোকদের ১৯৭১ সালে বাঙালি কর্তৃক অবাঙালি হত্যা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিরোধীদের উপর পরিচালিত নৃশংসতার বিষয়টি অস্বীকার করার মানসিকতা। ১৯৭১ সালেই হিংস্রতার সংস্কৃতিকে প্ররোচিত করা হয়েছিল যা বাংলাদেশে পরবর্তীতেও ঘটতে দেখা গেছে। এবং সকল পক্ষকে মিথ্যা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এমন পর্যায়ে পৌঁছানোর মতো ঘটনা ঘটেছিল যার ফলশ্রুতিতে ঘৃণা বিদ্বেষ পরবর্তীতে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে।

গবেষণার শেষে আমি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, ১৯৭১ সালের রূপকথার শেষটা বাংলাদেশের জন্য কেন 'ভয়ানক বেঠিক' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব যখন লন্ডন ও নয়াদিল্লী হয়ে ঢাকায় রমরমা জনসমাবেশে পৌঁছলেন তখন পিটার হেজেলহার্স্ট *দি টাইমস্* এ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন তখনকার বাংলাদেশের জনগণের ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ফুসে ওঠা ক্ষোভ নিয়ে। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে 'মুক্তিদাতাদের' মাত্র কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশের মানুষ ফুলের মালা দিয়ে গ্রহণ করেছিল, সেই ভারতীয়দের প্রতি জনগণকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা যায়। নতুন সরকারের প্রতিও তাদের মোহভঙ্গ হয়েছিল, এবং 'বিদেশীদের প্রতি অহেতুক ঘৃণা এতটাই বেশি হয়েছিল যে যারা কেবল পূর্ব বাংলার উচ্চারণে কথা বলতে পারেন তাদেরই

www.pathagar.com

কেবল স্থানীয় অধিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল'। এদিকে বাংলাদেশ সৃষ্টির মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে, শেখ মুজিব ও তার দল আওয়ামী লীগ যারা গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধ করেছিলেন তারা দেশটিকে একটি ব্যক্তিগত স্বৈরতন্ত্রে পরিণত করে শেষ পর্যন্ত একটি একদলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৭৫ সালে আগস্ট মাসে বাঙালি সেনাসদস্য যারা স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলেন তারা শেখ মুজিবের দুই কন্যা ছাড়া (যারা ওই সময় দেশের বাইরে ছিলেন), শেখ মুজিব ও তার পুরো পরিবারকে হত্যা করে। কয়েকজন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা ও শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার কয়েকজন সহকর্মীকে জেলে বন্দি করা হয়েছিল এবং পরে তাদের জেলেই হত্যা করা হয়। বাঙালি সেনা কর্মকর্তা যারা স্বাধীনতার যুদ্ধে লড়াই করেছেন তারা পরবর্তীতে নিজেদের মাঝে আঘাত ও পাল্টা আঘাতের লড়াই শুরু করে জেনারেল জিয়াউর রহমান বিজয়ী হয়ে দৃশ্যপটে না আসা পর্যন্ত। জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালে আর এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলে দেশটি সামরিক শাসনের অধীনে চলে যায় ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। অত:পর গণতান্ত্রিক রাজনীতির এক নতুন যুগের সূচনা হয় দুই অশান্ত প্রতিদ্বন্দ্বির রাজনীতির ময়দানে হাজির হওয়ার মধ্য দিয়ে। তাদের একজন ছিলেন নিহত নেতার কন্যা ও অপরজন ছিলেন নিহত নেতার বিধবা স্ত্রী। এখনও সেখানে রাজনৈতিক মতোপার্থক্য থেকে উৎসারিত সহিংসতা প্রকট আকার ধারণ করে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

ইতোমধ্যে পাকিস্তানের অবশিষ্ট অংশ আবার সেই দীর্ঘ সামরিক শাসনের অধীনে চলে যায় ও এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে সেখানকার শাসকগোষ্ঠী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সাথে লড়াই করে চলেছে। ১৯৭৫ সালে ভারত তার প্রতিবেশী দেশ সিকিমে সামরিক অভিযান চালিয়ে নিজেদের দেশের সাথে সংযোজন করে নেয় এবং ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য উচ্ছ্বসিত হলেও নিজ দেশ ভারতে ব্যক্তিগত একনায়কতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে উপমহাদেশে একটি মুসলিম জাতির উভয় অংশ ভেঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশে রূপান্তরিত হয় যারা 'ব্যর্থ' ও 'ব্যর্থ হতে চলেছে' এমন দ্বন্দ্বের মধ্যে দিনাতিপাত করছে এবং বিশ্বে পরিচালিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে' উভয়েই যেন জড়িয়ে গেছে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, সময় ও কালের ব্যবধানে ভবিষ্যতে ১৯৭১ সালের উপর লেখা আরো অনেক ইতিহাস উঠে আসবে এবং সম্ভবত রাষ্ট্রীয় মহাফেজ খানার দ্বার ধীরে ধীরে খুলে দেয়া হবে গবেষণার জন্য। ১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর গবেষণা ও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সময়ের সাথে সাথে আরো সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এ বইটিকে জীবন দান করেছে তা ভবিষ্যতে গবেষকদের কাজে হয়তো অনুপস্থিত থাকবে। যারা ১৯৭১ সালের সংঘাতের সময় বেঁচে ছিলেন তারা কেউই বেঁচে থাকবেন না ও ভবিষ্যতে গবেষকরা সেই সব লোকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা থেকে বঞ্চিত হবেন যা আমার ক্ষেত্রে হয়নি। আমি সে ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবান যে শেষ প্রজন্ম হিসেবে ১৯৭১ সালের স্মৃতি আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ১

কল টু আর্মস

বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ

'জাতি হিসেবে বাঙালিরা খুবই সংস্কৃতমনা। শিল্পকলার প্রতি ভালোবাসা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাদের সঙ্গীতও ছন্দময় এবং ভাষাও মধুর,... তা সত্ত্বেও একটি বিক্ষুব্ধ দল হিসেবে তারা মৌমাছির ঝাঁকের ন্যায়- যখন কেউ তাদের বিরক্ত করবে তারা তাদের পিছনে সংঘবদ্ধ হয়ে অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিদের বাছ বিচার না করেই হামলা করবে। আর কখনো উত্তেজিত হয়ে পড়লে তাদের নিজেদের নিরাপত্তার কথাও তারা চিন্তা করে না।'

-মেজর জেনারেল হাকিম আরশাদ কোরেশী, পাকিস্তান সেনাবাহিনী[১]

'সহসাই শত শত বাঙালি তাদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালত থেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেছে যা ছিল তাদের রাগ ও ঘৃণারই স্বত:স্ফূর্ত বহি:প্রকাশ। আমার মনে হয়েছে তারা যেন একঝাঁক মৌমাছি ও তাদের মৌচাকে ঢিল ছোঁড়া হয়েছে।'

- আর্চার ব্লাড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ কনসাল জেনারেল,১৯৭১[২]

এ যেন এক অসদৃশ্য জোড়া- একজন মার্কিন কূটনীতিবিদ ও একজন পাকিস্তানী জেনারেল যারা উভয়েই ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন- আশ্চর্যজনকভাবে বিক্ষোভরত বাঙালিদের সম্পর্কে তারা একই মতামত প্রদান করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড সেখানকার বাঙালি জনগণের উপর পাকিস্তানী সামরিক অভিযানের নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন, যদিও মার্কিন সরকার এ ক্ষেত্রে নিন্দা জানাতে ছিল অনিচ্ছুক। পাকিস্তানী জেনারেল হাকিম আরশাদ কোরেশী পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাঙালি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে। উভয় ব্যক্তিই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ও একপর্যায়ে তিনি গণআন্দোলনের ডাক দেন, যা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে সর্বশেষ রাজনৈতিক অধ্যায় যার ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের এক ভিন্ন দেশ।
এর ঠিক তিন মাস পূর্বে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তার অধীনে সমগ্র পাকিস্তানে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ব্যাপকভাবে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ। পূর্বের সরকারগুলোর নিজেদের স্বার্থ হাসিলে পরিকল্পিত ব্যবস্থাটি 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' সার্বজনীন ভোটাধিকারের প্রথা বলবৎ হওয়ায়

www.pathagar.com

বাতিল হয়ে যায় যা পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের একটি গণতান্ত্রিক যুগের নিশ্চয়তা প্রদান করে ও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সহায়ক হয়।

এরপর ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথা বলে 'ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তার দায়িত্ব শেষ এবং তিনি শিঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে যাচ্ছেন'।[৩] এতে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নবযুগের সূচনা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে দেশটি দু'টুকরো হয়ে যায়।

সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালের ১৩ মার্চ এক গোপন স্মারকলিপিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানান যে, 'সেখানে দুটি মৌলিক সমস্যা আছে; ১) শেখ মুজিবুর রহমান গান্ধী ধাঁচের ন্যায় যে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করছেন তাতে নিপীড়নের বিষয়টিকে যৌক্তিক বলে মনে হয় না, ২) পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের দীর্ঘসময়ের জন্য বিদ্রোহী তৎপরতা দমানোর মতো প্রয়োজনীয় সামরিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানীদের নেই।'[৪]

কিসিঞ্জার তাঁর দ্বিতীয় মূল্যায়ন সম্পর্কে সঠিক ছিলেন তবে প্রথম বিষয়টি ছিল ডাহা ভুল। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের তৎপরতার সাথে কোনোভাবেই বৃটিশ ভারতে ডাকা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মিল ছিল না। এ অধ্যায়ে সকল নির্বাচন, ব্যর্থ আলোচনা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের দ্বারা গৃহযুদ্ধের শুরু, নতুন করে ভারত -পাকিস্তান যুদ্ধ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয়বারের মতো বিভক্তির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও কিছু এড়িয়ে যাওয়া বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাঙালিদের ওই বিক্ষোভকে বাংলাদেশী, ভারতীয় ও অন্যান্যরা এক ধরনের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে প্রচার করেছে। সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাতটিকে সহজেই চিত্রিত করেছে সম্পূর্ণরূপে একটি 'বেসামরিক' ও 'সামরিক জান্তা', 'বাঙালি' ও 'পশ্চিম পাকিস্তানী', 'জনপ্রিয় গনতন্ত্র' ও 'সামরিক একনায়কতন্ত্র', 'অহিংসা' ও 'হিংসার' মাঝে সংঘাত হিসেবে। কিন্তু এই সরলীকরণই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে এবং ওই বছর পূর্ব পাকিস্তানে ও পরবর্তি বছরগুলোতে স্বাধীন বাংলাদেশে যা ঘটেছে তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। এ অধ্যায়ে সকল নির্বাচন, ব্যর্থ আলোচনা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বিক্ষোভ যা অবশেষে গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়ে আরো একটি নতুন ভারত- পাকিস্তানের যুদ্ধের সূচনা করে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয়বারের ন্যায় বিভক্তির দ্বারা বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়, এ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কিছু উপেক্ষা করার মতো বিষয় বা ভুল বর্ণনা দেয়ার মতো বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন

১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখলকারী পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন। সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক শক্তির সংগ্রাম কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই হয়নি বরং বিষয়টি সমগ্র পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৯৬৮ সাল থেকেই। জেনারেল আইয়ুবের ক্ষমতার শেষ ভাগে তার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেড এ ভুট্টো একটি নতুন

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল পি পি পি- পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি গঠন করে বিরোধী শক্তিতে যোগদান করেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বেশ কিছু স্পষ্ট পদক্ষেপও নিয়েছিলেন। ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে সামরিক পরিষদের স্থানে বেসামরিক কেবিনেট গঠন করা হয়েছিল। অত:পর ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে আসন্ন নির্বাচন ও সরকার গঠন বিষয়ে আলোচনা করেন। একটি নতুন নির্বাচনী পদ্ধতি ও সংবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী নির্ধারণের বিষয়ে এক বিশেষ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয় এবং তাদের প্রণীত রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয় ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে।

নতুন সামরিক শাসক বাঙালিদের ক্ষোভের বিষয়ে বেশ স্পর্শকাতর ছিলেন- 'ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা এটা স্পষ্ট করে দেয় যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক বঞ্চনা সংক্রান্ত অভিযোগের বৈধতাকে স্বীকার করেন, যা কিনা আইয়ুব খানের পতনের পর দেশের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছিল'।[৬] এ ছাড়াও তিনি পূর্ববর্তী সংবিধানে সংযুক্ত 'সমতার নীতিমালা' বাদ দিয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের পথ বেছে নেন। তার এ সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে আদৃত হয় যা তাদের স্বাভাবিকভাবেই অধিক সুবিধা লাভের পথ সৃষ্টি করে। ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের মাথায় ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে জেনারেল ইয়াহিয়া খান লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (LFO) প্রণয়নের ঘোষণা দেন, যার অধীনে ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু ওই বছরই পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের জন্য আরো দুই মাস পিছিয়ে একই বছর ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যে কোনো বিবেচনায় সামরিক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হলেও ওই নির্বাচন ছিল বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃত ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ছিলেন পাকিস্তানের একমাত্র সামরিক শাসক যিনি তার ক্ষমতা গ্রহণ করার এক বছর পর দেশকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাস্তবিকই তার কথা রেখেছিলেন। কিন্তু এরপর তিনি দেশটিকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিতে নেতৃত্ব দেন ও ভারতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরাজয়ের গ্লানি কাঁধে নেন। আর পাকিস্তান হয়ে পড়ে দ্বিখন্ডিত।

জাতীয় নির্বাচন হিসেবে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পূর্ণ শক্তি নিয়ে মনোনিবেশ করে পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮ আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৭টি আসনে। অনুরূপভাবে ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি তার পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচনে অংশ নেয় ও পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসনেই ভুট্টোর কোনো প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। এ ছাড়াও ছোট ছোট অনেক রাজনৈতিক দল সরকারিভাবে দেশের উভয় অংশেই নির্বাচনে অংশ নেয়; তবে এদের মাঝে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের নেতারা কেবলমাত্র তাদের নিজ এলাকাতেই তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেন।

সিসন ও রোজ-এর মতে, 'নির্বাচনটি প্রকৃতপ্রস্তাবে দু'টি পৃথক নির্বাচনী প্রচারণায় পরিণত হয় -একটি পূর্বে ও অপরটি পশ্চিমে'।[৭]

গণতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যদি দলের ও নেতাদের সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যায় তাহলে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের কর্মপন্থা নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃত্রিমভাবে

www.pathagar.com

একটি রাজনৈতিক পদ্ধতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। কিন্তু ইয়াহিয়া খান এতে রাজী হননি এ যুক্তিতে যে বড় রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলোর ইচ্ছার প্রতিফলন হওয়ার প্রয়োজন ছিল অন্যথায় তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন না।

যারা সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন তারা যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে জানান যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণে আগ্রহী বড় নেতাদের সবাই চিন্তাচেতনায় প্রাদেশিক পর্যায়ের নেতা বই কিছুই নয় তখন ইয়াহিয়া খান জানতে চান- 'জাতীয় পর্যায়ে নেতা কারা আছেন, তাদের নিয়ে এসো। আমি তাদের দেখতে ও তাদের সাথে কথা বলতে চাই'।[৮] এতে এ সামরিক শাসককে মনে হয়েছিল যে তিনি দেশের রাজনীতিতে ইতোমধ্যে সক্রিয় আছেন এমন রাজনীতিবিদদের সাথেই কাজ করতে চান ও গায়ের জোরে নতুন কোনো আদর্শিক নেতা তৈরিতে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। ইতোমধ্যে ১৯৭০ সালেই পূর্ব পাকিস্তানের অসংখ্য বাঙালি তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের থেকে নিজেদের এক প্রকার বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল, যা দেখে ধরে নেয়া হয় যে তারা ১৯৪৭ সালে[৯] পাকিস্তান রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশের সাথে সাথেই শুরু করেছিল তাদের এ বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া। তাদের দাবি-দাওয়াগুলোর মধ্যে ছিল অধিকতর স্বায়ত্বশাসন, ক্ষমতায় ন্যায্য অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য সংবিধানে ব্যাপক পরিবর্তনের লক্ষ্যে তার ৬ দফা উপস্থাপন করেন।[১০] অর্থনৈতিক বঞ্চনা, দেশ শাসনে অংশীদারিত্ব আর বিচ্ছিন্নতা সঞ্জাত মানসিকতার মতো বিষয়গুলোকে পূর্ণ কাজে লাগিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তার প্রচ-ারাভিযান চালিয়ে গেছেন যাকে তার বিরুদ্ধপক্ষ বিদ্বেষের প্রচারাভিযান হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। শেখ মুজিব অবশ্য এ প্রচারাভিযানকে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য ও উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রচারাভিযান হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। বন্যা আর ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এরূপ পরিস্থিতিকে আরো উত্তেজনাপূর্ণ ও বিদ্বেষপূর্ণ করতে সহায়তা করেছিল।

নি:সন্দেহে বাঙালিরা নিজেদের দীর্ঘদিন ধরে পক্ষাপাতিত্ব ও অসমতার নীতির শিকার বলে মনে মনে উপলব্ধি করছিল যদিও কখনো কখনো তারা এটা প্রমাণ করতে ভুল পরিসংখ্যান উত্থাপন করেছে এবং পরিসংখ্যানে যা দেখা গিয়েছে তাতে অসমতা হয়তো ছিল কিন্তু কোনোভাবেই সে সব কিছু পক্ষপাতিত্বমূলক ছিল না।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তান অধিকতর গরীব ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ছিল বেশ দুর্বল। এবং পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিকভাবে খুব কমসংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানীই পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় সিভিল সার্ভিস, সেনাবাহিনী ও ব্যবস্থাপনার মতো পদে কর্মরত ছিলেন। কাজেই অসমতা থাকবে- এটা বাস্তবতা ও সমতা আনাও রাতারাতি সম্ভব ছিল না। দেখা দরকার যে সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ও সুষ্ঠুভাবে পূর্ব পাকিস্তানীদের সামনে খুলে দেয়া হয়েছিল কিনা। পক্ষপাতিত্ব কতদূর পর্যন্ত ছিল সেটি অবশ্যই বিতর্কের ব্যাপার তবে পাকিস্তানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বাঙালিদের অনুভূতি ছিল সত্য এবং এটা ছিল প্রকটভাবে একটি রাজনৈতিক ইস্যু।[১১] অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের রাজনীতি অনেক সময় পক্ষপাতিত্বেরে বিষয়টিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। বাঙালি জি. ডব্লিউ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার অধীনে

www.pathagar.com

কাজ করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে অর্থনৈতিক অসমতার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষেই ছিল ও ওই মারাত্মক ইস্যুটিকে যথার্থরূপে সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এ মত থাকা সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন, 'বাঙালিরা কঠোর পরিশ্রম ও গঠনমূলক কর্মসূচি অপেক্ষা নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির জন্যই পরিচিতি পেয়েছে। অন্যের প্রতি অভিযোগ আনতে তারা যথেষ্ট পারদর্শী। বৃটিশ শাসনের দিনগুলোতে তারা ইংরেজদের ও পরবর্তীতে হিন্দুদের উপর অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে দিয়েই চলতে চাইতো যাদের সাথে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারতো না।'[১২]

বাঙালিদের ব্যাপারে বাঙালি অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জি. ডব্লিউ চৌধুরীর মূল্যায়নের সাথে পূর্ব বাংলার অপর একজন বাঙালির যথেষ্ট সাজুয্যতা লক্ষ্য করা যায়। এ দ্বিতীয় বাঙালি ভদ্রলোকেরও তার নিজের লোকদের সম্পর্কে ছিল যথেষ্ট তিক্ত মূল্যায়ন। ইনি হচ্ছেন নিরদ চন্দ্র চৌধুরী। পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর তিনি লেখেন- 'পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মাঝে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অভিযোগের মানসিকতা সর্বক্ষণ বিরাজ করছে, বিশেষ করে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যখন তারা বাস্তব পদক্ষেপ ও পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের সমস্যার সমাধান না করে অপরের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে অবাস্তব চিন্তায় নিজেদের আচ্ছন্ন রাখছে ও বিবেককে তাড়িত করছে। এ একই মানসিকতা আমি হিন্দু-মুসলমান সব বাঙালির মাঝেই দেখেছি।'[১৩]

বিপরীত মেরুকেন্দ্রিক ফলাফল

নির্বাচনটি যেহেতু ছিল প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যের তাই ফলাফলেও অনুরূপভাবে ঘটে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধতার প্রতিফলন। শেখ মুজিবের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানী ওই বছরের শেষ দিকে নির্বাচন থেকে সরে আসেন। মুজিবের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২ আসনের ১৬০টিতে জয়লাভ করে ও সেখানে মোট প্রদত্ত ভোটের ৭৫ ভাগ পড়ে তাদের বাক্সে। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসনই পায়নি। এর অর্থ হচ্ছে তারা জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের জন্য প্রদত্ত মোট ভোটের মধ্যে পায় ৩৮ শতাংশ ভোট। তবে পূর্ব পাকিস্তানে পাওয়া ১৬০টি আসন আওয়ামী লীগকে সংসদে মোট আসনের ৫৩ ভাগ আসন দিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করে। নুরুল আমিন ও চাকমা উপজাতি প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় পূর্ব পাকিস্তানের অবশিষ্ট দুটি আসনে জয়লাভ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপিপি পাঞ্জাবে ৮২ আসনের ৬২টিতে, সিন্ধুর ২৭ আসনের ১৮টিতে জয়লাভ করে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি আসনে জয়লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ১৩৮ আসনের মধ্যে ৮১টি আসনে বিজয়ী হয়। পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসনেই তাদের প্রার্থী দেয়নি। পিপলস পার্টি জাতীয় পর্যায়ে মোট ভোটের ২০ ভাগ ভোট পেয়ে জাতীয় সংসদের ২৭ ভাগ আসন দখল করতে সক্ষম হয় (তারা পশ্চিম পাকিস্তানের আসনের ৫৯ ভাগ আসনে জয়লাভ করে)।

যদিও শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে প্রদানকৃত মোট ভোটের ৭৫ ভাগ ভোট পেয়ে সংসদের অধিকাংশ আসনে জয়ী হলেও নির্বাচনের দিন ভোটার উপস্থিতির পরিসংখ্যানে এক ব্যতিক্রমী চিত্র পাওয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানের মতো রাজনৈতিকভাবে সচেতন এলাকায় প্রচণ্ড আবেগতাড়িত বিষয়সমূহ যেমন পক্ষপাতিত্ব, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি অথবা সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতার আবহ-ইত্যাদির কারণে সেখানে ভোটদানে ভোটারের উপস্থিতি অনেক

www.pathagar.com

বেশি হওয়ার কথা ছিল। অথচ মজার বিষয় হলো পূর্ব পাকিস্তানে তুলনামূলকভাবে ভোট প্রদানের হার ছিল অনেক কম (শতকরা ৫৬ ভাগ)। পাঞ্জাবে তা ছিল শতকরা ৬৭ ভাগ, সিন্ধুতে শতকরা ৫৮ ভাগ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪৭ ভাগ ও বেলুচিস্তানে ৩৯ ভাগ। এতে প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগ ভোটার তাদের প্রদেশের জন্য ব্যাপক সাংবিধানিক পরিবর্তনের ব্যাপারে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি। তুলনামূলক কম ভোট প্রদান করা হলেও শেখ মুজিব সম্পূর্ণরূপে সফলভাবে প্রয়োজনীয় ভোট পান ও যারা ভোট কেন্দ্রে আসেন তারা ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট প্রদান করেন। মোট প্রদানকৃত ভোটের ৫৬ ভাগের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ ভোট পাওয়ার অর্থই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মোট ভোটারের শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলেছে। এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যারা অখণ্ড পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নতাও চেয়েছিলেন। কিন্তু আবার অনেকেই ছিলেন যারা বৃহত্তর আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সে সাথে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দাবির পক্ষে ভোট প্রদান করেন, বিচ্ছিন্নতার পক্ষে নয়। জি ডবি-উ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, নির্বাচন চলাকালীন কোনো অবস্থায়ই শেখ মুজিব একটিবারের জন্যও বলেননি যে তাকে একটি ভোট দেয়ার অর্থ হচ্ছে পৃথক রাষ্ট্রের জন্য একটি ভোট দেয়া। এবং নির্বাচনে জয়লাভের পর তিনি সেনা অভিযান শুরুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়ার জন্য আলোচনা চালিয়ে যান।

নিষ্ফল আলোচনা

নির্বাচনে জয়লাভটা শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে আবার তাদের আঞ্চলিক অসমতা ও পক্ষপাতমূলক আচরণের বিষয়টি প্রতিকারের জন্য বলার সুযোগ করে দেয়। নির্বাচনের পর তিন মাস পর্যন্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্থান-পতন হলেও সকলেই আশাবাদী ছিলেন যে ২৫ মার্চ পর্যন্ত না হলেও সম্ভবত ২৩ মার্চের মধ্যে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সবার জন্যই একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া যাবে এবং নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতির মাঠে ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো মিলে যে তিন প্রধান খেলোয়াড়ের উত্থান ঘটেছে তাদের মধ্যে একটা সমঝোতার পথ খুলে যাবে।

দীর্ঘদিন ধরে চলা আলোচনা নিয়ে যদিও বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় বিবরণী পাওয়া যায় কিন্তু আসলে আলোচনা কেন ব্যর্থ হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে পারবেন কেবল ভবিষ্যতের পণ্ডিত ব্যক্তিরাই যদি তাদের বিভিন্ন নেতা ও তাদের দলের মধ্যকার কথপোকথনের রেকর্ডকৃত টেপসহ আর্কাইভ থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের ব্যবস্থা করা যায়।[১৪] এদিকে প্রাপ্ত মাল মসলা অনুযায়ী এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সার্বিক বিবেচনায় পরিস্থিতি তখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যাতে ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে মুজিব ও ভুট্টোকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একমাত্র সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানই সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে জাতীয় সংসদ ও জনগণের নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়। মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান যেতে অস্বীকার করলেও ইয়াহিয়া, ভুট্টোসহ অন্যান্য প্রায় সকল পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাই ঢাকায় এসেছিলেন। অত:পর দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতায় ইয়াহিয়া খানকে দীর্ঘ সময় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে হয়েছে: ... মুজিব বা ভুট্টো কেউই একে অপরের

www.pathagar.com

প্রতি তীর্যকভাবে তাকানো ছাড়া সামনাসামনি চোখাচোখি পর্যন্ত করতেন না, এবং প্রথম দিকে তো তারা কেউই একজন অন্যজনের সাথে আলোচনা করতে চাননি, উভয়ে বসেছিলেন পাশ ফিরে। প্রেসিডেন্ট তাদেরকে তাদের বালসুলভ আচরণের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের সম্ভাব্য নেতার পরিবর্তে তাদের নববিবাহিত শাহী বধূর মতো মনে হচ্ছে। ইয়াহিয়া তাদের দু'জনের হাত ধরে অনুরোধ করেন যে, অমন পরিস্থিতিতে যেরূপ সৌজন্যতা দেখানো উচিত দয়া করে তারা যেন তা দেখান।[১৫]

বিজয়ী দল হিসেবে মুজিব ছিলেন ক্ষমতার দাবিদার ও তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি দেশের সংবিধানে সম্পূর্ণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রণীত ছয় দফার প্রশ্নে কোনোরূপ আপসে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। অপরদিকে ভুট্টো নির্বাচনে বিজয়ী না হয়েই ক্ষমতায় বসতে চেয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খান উভয় নেতার ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আপসহীন মনোভাবের মাঝখানে নিজেকে নিষ্পেষিত হতে দেখেন এবং দুই নেতাই ইয়াহিয়াকে দেখছিলেন সন্দেহের চোখে। দু'জনই ভাবছিলেন, প্রেসিডেন্ট অপরজনকে বেশি ছাড় দিচ্ছেন। ইতোমধ্যে ১ মার্চে প্রস্তাবিত জাতীয় সংসদের অধিবেশন হঠাৎ স্থগিত হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়ে যায় খোলাখুলি বিদ্রোহ। সকল বিবেচনায় পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কার্যত সেখানে শেখ মুজিব নির্দেশিত একটি সমান্তরাল সরকার চলতে শুরু করে ২৫ মার্চ পর্যন্ত।

বাঙালিদের বিদ্রোহ

ইয়াহিয়া কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ হাজার লোক বাঁশের লাঠি, লোহার রড নিয়ে হোটেল পূর্বাণীর সামনের সকল পথ রোধ করে ভিড় জমায়। আর কি সব শ্লোগান! পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে তারা জিন্নাহর ছবিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। শেখ মুজিব তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং হরতালের ঘোষণা দেন ও ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান।[১৬] এক উত্তেজিত তরুণ রুমী দিনের এ সব ঘটনা ১ মার্চ দিন শেষে তার মা জাহানারা ইমামকে জানায়। তার এক বন্ধুর হোন্ডা মটরসাইকেলে চেপে তারা সারাদিন ঢাকা ঘুরে বিভিন্ন মিটিং-এ হাজির হয় ও নেতাদের জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে বেড়ায়। অপরদিকে ছেলেকে সারাদিন না দেখে তার মা দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় পার করেন এবং এর মধ্যে ছেলে ও তার বন্ধুদের জন্য তৈরি হ্যামবার্গার ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত সারাদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো উত্তেজিত হয়ে বলার সময় রুমী ওই হ্যামবার্গারগুলোর আধা ডজন খেয়ে ফেলার প্রতিশ্রুতি দেয় তার মা' কে।

পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগার নয় এমন দু'জনের একজন চাকমা উপজাতি প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় ৩ মার্চ জাতীয় সংসদে যোগ দেয়ার জন্য ১ মার্চে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন এবং সংসদ অধিবেশন স্থগিতের বেতার ঘোষণার সময় তিনি বিয়ার পান করছিলেন ঢাকা ক্লাবে। দেখতে দেখতে মিছিল আর শ্লোগানের সাথে সাথে অবাঙালিদের দোকান, রেস্তোরা, প্রেক্ষাগৃহসহ বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান লুঠ হয়ে যায় ও সেগুলোতে অগ্নিসংযোগ করা হয়।[১৭]

'বেতারে সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা হওয়ার পর ঢাকায়-এর প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। শেখ মুজিব অসহযোগের জন্য অহিংস আন্দোলনের সূচনা করেন'। কিন্তু জি ডব্লিউ চৌধুরী বলেন, 'এটা কোনো অবস্থাতেই গান্ধী স্টাইলের কোনো অহিংস আন্দোলন ছিল না।'[১৮]

www.pathagar.com

'যখন এ বিদ্রোহ অসহযোগের পূর্ণমাত্রা অর্জন করে তখন দার্শনিক দিক দিয়ে হোক বা মাঠের পরিস্থিতি বিবেচনা করেই হোক এটাকে আর কোনোভাবেই অহিংস বা গান্ধীবাদী আন্দোলন বলা চলে না। মুজিব যদিও এটাকে অহিংস বলে বার বার দাবি করেছিলেন ও বিপরীতে তথ্য প্রমাণ থাকার পরও যেমন অনেকে এটাকে অহিংসই বলেছেন।'[১৯]

গান্ধীর নাম ও তার আন্দোলনটিকে 'যথাযথ' করার চেষ্টার স্পষ্ট কারন তিনি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে অহিংস আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন তা ছিলো বৈধ ও নৈতিক কর্তৃত্বপূর্ণ যা তার সেই 'সংঘের' সাথেই জড়িয়ে গিয়েছিলো। বৈসাদৃশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পরিচালিত আন্দোলনের একটি বিশেষ ধাচ লক্ষ্য করা যায় যখন বিরোধী পক্ষ ছিলো সামরিক শাসক। তা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের বিদ্রোহটা গান্ধীবাদী ধাচের ছিলো না, অনুপ্রাণিত হয়েও না, বা চর্চা বজায় রেখেও না; গান্ধীবাদের আইন আমান্যকারী আন্দোলন কখনো বাংলায় বিশেষ করে জনপ্রিয় ছিলো না।সম্পূর্ণ বিপরীতে, বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলার সহিংস আন্দোলনের একটি ঐতিহ্য ছিলো যাকে পূর্ব পাকিস্তানী বিদ্রোহীরা একটি ঐতিহাসিক সূত্রে প্রাপ্ত প্রকরণ হিসেবে দাবি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রধান নায়কদেরও এ সংগ্রামী ঐতিহ্য আকর্ষণ করেছিলো, তৈরি করেছিলো পরস্পর বিরোধিতা চর্চার সমকক্ষতা লাভে অনুপ্রাণিত হওয়ার দাবির মিশ্র বিভান্তি।

ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড বাঙালিদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। সংসদ অধিবেশন স্থগিত হওয়ার ঘোষণায় লোকজনকে রাস্তায় ধাবমান দেখে ও চিৎকার শুনে তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে নির্বাচনের ফলাফলকে সামরিক সরকার মূল্যায়ন করবে না। 'দলে দলে লোক লাঠি হাতে রাস্তায় বের হয়ে চিৎকার করতে করতে যেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে নগরের কেন্দ্রে ছুটে চলেছে,... কোথাও বা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছে।... মানুষের ঢল নেমেছে হোটেল পূর্বাণীর সামনে যেখানে আওয়ামী লীগের নেতারা এসে পৌছাচ্ছেন, শেখ মুজিব এ মাত্র এসে পৌছালেন।... জনতা চিৎকার করে আওয়ামী লীগ নেতাদের বলছে হোটেলে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানী এম এন এ'দের তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য ...'।[২০]

পাকিস্তানী সাংবাদিক এন্থনী ম্যাসকারেনহাস ইংল্যান্ডে পালিয়ে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তার অত্যাচার নিপীড়নের বর্ণনা দিয়ে *সানডে টাইমস্* - এ এক ফিচার লিখে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। ১ মার্চের ঘটনার উপর তিনি লিখেছেন:

'...বিক্ষুব্ধ জনতার দীর্ঘ সারি ছুটে চলছিল পল্টন ময়দানের পথে যেখানে তারা ঐতিহ্যগতভাবে সব সময় তাদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরতো। উত্তেজিত চেহারায় হাতে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, হকিষ্টিক নিয়ে তারা যেন প্রতিশোধ-এর উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল পল্টনে। বিকাল সাড়ে চারটার মধ্যেই আনুমানিক ৫০,০০০ হাজার লোক জমায়েত হয়ে গেল। চিৎকার, হৈ চৈ আর উত্তেজনার পর সহসাই বেশ কিছু লোক ভীড়ের মধ্য থেকে বের হয়ে আসল ও জিন্নাহ এভিনিউ (বর্তমান বঙ্গবন্ধু এভিনিউ)-এর সামনের দোকানপাট, জানালার কাঁচ, দরজা ভাংচুর আর অগ্নিসংযোগের পর লুটপাট শুরু করে দিল। ওই সব দোকানের মালিকদের সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী বা অবাঙালি। এর মধ্যদিয়ে চারদিকে গোলযোগ বিস্তৃত হতে শুরু করলো।'

ইতোমধ্যে হোটেল পূর্বাণীতে 'কোনোখান থেকে এনে একটি পাকিস্তানী পতাকা আগুন

www.pathagar.com

দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হলো, সামনের পিআইএ অফিসের কাঁচের জানালাগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হলো। কিছু যুবক চেষ্টা চালাল হোটেল পূর্বাণীতে পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানায় থাকা কয়েকটি দোকান লুটের'। ম্যাসকারেনহাস- এর মতে, শেখ মুজিবের বক্তৃতা জনতার আবেগের পরিপূরক ছিল না। তিনি জনগণকে ভর্ৎসনা করে লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দিতে বলেন, 'কিন্তু উত্তেজিত জনগণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক অরাজক পরিস্থিতি ও আতংক সৃষ্টি করছিল। ওই রাতে ঢাকা শহরের সর্বত্র দাঙ্গাকারী ও পুলিশের মাঝে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে, বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটে অবাঙালি ও তাদের সম্পত্তির উপর। এ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা হস্তক্ষেপ করলে তাৎক্ষণিক উগ্রজনতার দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ...আর এভাবেই এদিন সূচনা হয় দীর্ঘ ২৫ দিনের গণজোয়ারের...।[২১]

এদিকে রাস্তায় উগ্রজনতার মারমুখী মনোভাব যেন এক নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মে পরিণত হয়। একদিকে মনে হচ্ছিল শেখ মুজিব উগ্রজনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন, অপরদিকে তার মৌখিক নির্দেশই ছিল আইন ও তার কথাবার্তা উৎসাহিত করছিল উগ্রবাদী আচরণকে। অনেক বাঙালির স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় ধৈর্যধারণ করার জন্য মুজিবের বাগাড়ম্বরপূর্ণ আহ্বান সত্ত্বেও বাঙালিদের বিদ্রোহ ছিল একদম খোলাখুলি, গর্বিত ও সশস্ত্র ধাচের। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুজিবের ভাষণ শুনতে জনতার ঢল নামে,..." আর এ জনতার হাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র, বাঁশের লাঠি, লোহার রড, তরবারি, হাতে তৈরি ছোরা, শর্টগান।'[২২] ওই সময়ের একটা বিশেষ শ্লোগান ছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।' সেই সময়ের ঘটনাবলী স্মরণ করে অনেক বাঙালি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, সশস্ত্র অবস্থায় রাজনৈতিক মিছিলে যোগ দেয়াটা যেন পরিণত হয়েছিল জনতার একটা স্বাভাবিক রীতিতে ।

বাঙালিদের প্রতি সর্বপ্রকার সহানুভূতিশীল মার্কিন কনসাল জেনারেল লিখেছেন: 'বাঙালি বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের কুৎসিত দিকটা খুব শীঘ্রই প্রকাশ্যে বের হয়ে এলো পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিদেশীদের সম্পত্তিতে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সেনাবাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার মধ্যদিয়ে। ঢাকার ফার্মগেটের আবাসিক এলাকায় সকল অবাঙালির দোকানপাটে ও তাদের বাড়ি ঘরেও আক্রমণ করল বাঙালিরা। ঢাকা ভ্রমণকালে বিদেশীদের পছন্দের তালিকায় তাদের আবাসস্থল ছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল। সেখানকার ইংরেজী সাইন বোর্ডটি আওয়ামী লীগের যুবকরা ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিল। হঠাৎ একজন ছাত্র পিস্তল দিয়ে গুলিবর্ষণ করলো হোটেল ইন্টারকন্টিনন্টালের উপর। রাস্তায় নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর প্রতিনিধি ও তার স্ত্রী উঠতি বয়েসি ছেলেদের দ্বারা হলো আক্রান্ত, কিন্তু আওয়ামী লীগের একটি প্রহরী দল তাদের শেষমেষ রক্ষা করে। ছাত্রদের একটি দল যারা সম্ভবত বামপন্থী ছিল তারা বৃটিশ কাউন্সিলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালিয়েছিল'।[২৩]

এ সব ঘটনার প্রেক্ষিতে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমকে জানায় যে, মার্চের প্রথম সপ্তাহেই গোলযোগে ১৭২ জন মারা গেছে ও আহত হয়েছে ৩৫৮ জন। আওয়ামী লীগ অবশ্য আরো বেশি লোক হতাহতের দাবি করে। ২৪ মার্চের দিকে 'মার্কিন কনসুলেটের উপরও নিষ্ফল বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণ করা হয়'।

জাহানারা ইমাম লক্ষ্য করলেন রাস্তায় লোকজন তার বাসায় মার্কিন অতিথি কিটিকে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে খুঁজছে। কিটি সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজে নিয়োজিত ছিলেন ও বাংলাভাষা ভালোভাবে শেখার জন্য তিনি একটি বাঙালি পরিবারে বাস করতেন। কিটি নিজে জাহানারা ইমামকে জিজ্ঞেস করলেন, বাঙালিরা কেন হঠাৎ করে

www.pathagar.com

তার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করছে? মিসেস ইমাম লিখেছেন তিনি এর জবাবে কিটিকে পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসের বর্ণনা দিয়েছিলেন।[২৪] তবে এতে জানা যায়নি যে, তার ব্যাখ্যাটি কি বাংলা ভাষাভাষি বাঙালি চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণ মনোভাব সঞ্জাত ছিল, না কি তাতে ভিন্ন কিছু- সেই সময়ের আন্দোলনের বিশেষ ছাপ ছিল? আর সে সময় 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদ পরিণত হয়েছিল বিদ্রোহের 'হলমার্ক'-এ।

এদিকে নকল ও প্রকৃত অস্ত্র নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল সুসংগঠিত পর্যায়ে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ ও সামরিক কায়দায় প্যারেড। একজন বামপন্থী কর্মী কালিরঞ্জন শীল যিনি ২৫-২৬ মার্চ রাতে জগন্নাথ হল হত্যাকাণ্ড থেকে দৈবক্রমে বেঁচে যান তিনি জানিয়েছেন, জাতীয় সংসদ অধিবেশন হঠাৎ করে স্থগিত হওয়ার সংবাদে ও আন্দোলনের অংশ হিসেবে ছাত্র সংগঠনগুলো 'আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়াম ময়দানে নকল রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করে দেয়। আমিও একটি দলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। অল্প কয়েকদিনে আমাদের প্রথম গ্রুপের প্রশিক্ষণ শেষ হয়ে যায়। ছাত্রীদের একটি দলের সাথে আমাদের মোট তিনটি দলের মার্চপাস্ট অনুষ্ঠিত হয় সড়কে'।[২৫] রাইফেল হাতে নিয়ে ছাত্রীদের এ মার্চপাস্টের ছবি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে ওই সময় ছাপা হয় যা বর্তমানে ঢাকায় স্বাধীনতা যুদ্ধ যাদুঘরে গর্বের অংশ হিসেবে প্রদর্শিত হয়ে আসছে।[২৬]

১৯৭১ সালে বাঙালিদের আন্দোলনকে গান্ধীর নামের সাথে যুক্ত করলে সেই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে অপদস্তই হবে না বরং তা হবে স্পষ্টতঃ হাস্যকর। আদর্শ বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী[২৭] হিসেবে শেখ মুজিব ক্ষমতার সন্ধান করেছেন তার জ্বালাময়ী ও সম্মোহনী বক্তৃতা ও নির্বাচনী রাজনীতির মাধ্যমে। তিনি কখনোই গান্ধীর ভাষায় কথা বলেননি এবং তাঁর চিন্তাধারা কখনও ভেবে দেখেননি। জনগণ কখনোই সশস্ত্র হয়ে গান্ধীর সমাবেশে যোগ দিতো না। কেবলমাত্র তার নীতির প্রতি অবিচল থাকায় তার অনুসারীরা তাকে হতাশ করে দিলেও ১৯১২ সালে চৌরি চৌরায় জনতার উগ্র আচরণের জন্য গান্ধী তার সমগ্র অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

মুজিব তার ৭ মার্চ- এর ভাষণে রমনা রেসকোর্স ময়দানে তার সমর্থকদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যেন তারা তাদের প্রত্যেকের বাড়ি দুর্গ বানিয়ে যার যা ছিল তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করে। (প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যার যা আছে, তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে)। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার অনুসারীরা তাই করেছিলো। জাহানারা ইমাম ১৬ মার্চ তার ছেলেদের ঘরে বিস্ফোরক দ্রব্য ও বোমা বানানোর যন্ত্রপাতি দেখতে পান। যদিও শেখ মুজিব হুংকার ছেড়ে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তার সমর্থকরা হতাশ হয়েছিলেন- সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দেয়া ও এ থেকে সরে আসার জন্য। কেননা তখনও মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব পাওয়ার জন্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ জনতা মুজিবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বত্র হিংসাত্বক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিল ও নেতারা তা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে জনগণ মুজিবের একদিকে জনগণকে উত্তেজিত করা আর অন্যদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ওই ডবল গেম বুঝতে পারছিল না। এন্থনী ম্যাসকারেনহাস-এর মতে, রিপ ভ্যান উইংকলের মতো দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে কাটানোর পর জেগে উঠে-মুজিব যখন ১৯৭২ সালে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের পথে লন্ডনে যাত্রা বিরতি করেন

www.pathagar.com

তখনও তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা যোগসূত্র রাখার জন্য ভুট্টোর সাথে চুক্তি করার বিষয় বিবেচনা করেছিলেন।[২৮]

১৯৭১-এর বাংলাদেশ আন্দোলনের বেশকিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট বাঙালি হিন্দুদের বৃটিশ বিরোধী চোরাগোপ্তা আন্দোলনের বেশ মিল পাওয়া যায়। আবারো ১৯৩০ সালের প্রথমদিকে উগ্রবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়ায় এবং চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও মেদনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার মতো কাজও করে।[২৯] ১৯৭১ সালের আন্দোলনের কর্মীদের যেমন বীর ও শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় বাংলাদেশের অনুরূপ ভারতেও তাদের সেখানকার ভাষায় জাতীয়তাবাদী বীর হিসেবে পূজা করা হয়।

শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে সহিংসতা বা হিংস্রতার দ্বার খুলে দেয় তা ছিল সর্বাংশে একটি বিশৃঙ্খল সহিংসতা, কোনো নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন কোনোভাবেই বড় ধরনের কোনো কৌশলগত বা পরিকল্পিত আন্দোলন ছিল না বরং বলা যায় এটা ছিল চাপ সৃষ্টি করে কোনো দাবি আদায় করার মতো আন্দোলন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত সর্ব জ্যেষ্ঠ বাঙালি কর্মকর্তা লিখেছেন, তিনি শেখ মুজিবকে তার রাজনৈতিক আলোচনা চলাকালীন কয়েক দফা অনুরোধ করেন শত্রুর (পাক সেনাদের) বিরুদ্ধে প্রথম সুযোগেই বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিক দিয়ে হামলা করার নির্দেশ দেয়ার জন্য। পক্ষান্তরে শেখ মুজিব তাদেরকে আলোচনার ফলাফল জানার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন।[৩০] কাজেই বাংলার সুযোগ্য সন্তান সুভাষ চন্দ্র বসু যিনি বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ভারতীয় ন্যাশনাল আর্মি গঠন করেছিলেন তার মতো শেখ মুজিব কখনোই জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনে যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াইয়ের জন্য কোনো সুসংগঠিত বাহিনী তৈরি করেননি।[৩১] বিদ্রোহীদের দমনে নিয়োজিত পাক সেনাবাহিনীর হাতে ২৫ মার্চ রাতে প্রথম প্রহরে শেখ মুজিব বন্দি হয়ে গেলে এককভাবে বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা যে যার মতো বিদ্রোহ শুরু করে দেয় ও আন্দোলন চারিদিকে ছড়িয়ে পরে। এতে অসংখ্য বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে যাতে সহিংসতার শিকার হয় অনেকেই।

পূর্ব বাংলা বরাবরই আন্দোলন সংগ্রামের একটি তীর্থভূমি ছিল যার ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম হয় ১৯৪৭ সালে। উপমহাদেশের সীমানা ভাগ হওয়ার সাথে সাথে অগণিত মানব জীবন হারিয়ে যায় ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে ও ব্যাপক সংখ্যক মানুষ দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়। তারপর অন্য সময় ভারতে যে সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে সে সব নিয়ে পর্যবেক্ষকদের নানা মত রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পারস্পরিক সম্প্রীতির মধ্যে বাস করলেও মাঝে মাঝে তারা কেন দাঙ্গায় ব্যাপৃত হয়ে একে অপরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে তা নিয়ে তারা গবেষণা করেছেন। প্রচলিত সমকালীন চিন্তাধারায় প্রতীয়মান হয় যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্ভবত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা বিদ্বেষ সংশ্লিষ্ট বা সঞ্জাত কোনো বিষয় নয়। এটি হচ্ছে রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত বা সৃষ্ট একটি ইস্যু।

পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র দুই দশক পর পূর্ব বাংলার বাঙালিরা তাদের স্বদেশী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক শোষণের অভিযোগ এনে ১৯৭১ সালে বিদ্রোহ করে বসে। বাঙালিদের এ বিদ্রোহ তাদের জাতিগত চরিত্রকে প্রকাশ করে জাতি ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদ এবং অবাঙালিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-সহিংসতার মধ্যদিয়ে।

www.pathagar.com

মাইকেল ইগনেতিয়েফ বলকানদের সম্পর্কে এভাবে লিখেছেন, 'আমরা ব্যাখ্যার জন্য অনুসন্ধান শেষ করছি ঠিক যখন এটি আরম্ভ হওয়া উচিত ছিলো, যদি আমরা দাবি করি যে স্থানীয় জাতিগত বিদ্বেষ ইতিহাসের এতোই গভীরে প্রোথিত ছিলো যে সেগুলো জাতীয়তাবাদী সহিংসতা হিসেবে বিস্ফোরিত হতে বাধ্য হয়েছে। সম্পূণ বিপরীতে এ লোকগুলো পরিণত হয়েছে প্রতিবেশী থেকে শত্রুতে।'[৩২] পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি বিশেষজ্ঞগণ যারা ১৯৭১ সালে এ পরিবর্তন এনেছিলেন তাদের নিজেদের কার্যকলাপের ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন হওয়া দরকার। গান্ধী এমন কোনো ব্যক্তি দ্বারা যথাযথ হিসেবে স্বীকৃত বা প্রতিফলিত হবেন না যার কেবলমাত্র সাধারণ লোককে রাস্তায় নামিয়ে দেয়া ও সরকারের গতিরোধ করার ক্ষমতা আছে, অথবা সুবাস বসুকেও কারও সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না যে স্রেফ একটি বন্দুক তুলে নিতে পারে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ২

সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা

দায়িত্ব ছাড়া ক্ষমতা

প্রেসিডেন্ট নিক্সন: '...আসল প্রশ্ন হচ্ছে কেউ কি ওই নরকতুল্য স্থানটি শাসন করতে পারবে?'

হেনরী কিসিঞ্জার: 'তা ঠিক, নিঃসন্দেহে বাঙালিদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাদের শাসন করা খুবই কঠিন'।

প্রেসিডেন্ট নিক্সন: 'ভারতীয়রাও তাদের শাসন করতে পারবে না'।

-প্রেসিডেন্ট নিক্সন, টেলিফোন আলাপকালে হেনরী কিসিঞ্জারকে, ২৯ মার্চ ১৯৭১।[১]

১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক সরকার জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে শেখ মুজিব সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ আরো চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছায়, এবং ঠিক ওই সময় থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরভাবে হারিয়ে ফেলে। অনেক বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী ২৫ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিবের হুকুমে পূর্ব পাকিস্তানে একটি 'সমান্তরাল সরকার' চলতে দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, যদিও ২৫ মার্চে সামরিক সরকার দ্বারা সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরুর উপর অধিক আলোকপাত করা হয় এবং তা অধিক প্রচার পেয়েছে। এক্ষেত্রে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের সূচনায় ওই তারিখ পর্যন্ত আপাত দৃষ্টিতে পাক সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতা এক কৌতোহলোদ্দীপক ও জটিল বিষয় বৈকি।

২৫ মার্চ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা দিয়ে মার্কিন কনসাল জেনারেল আবর্চার ব্লাড যা লিখেছেন তাতে তার পর্যবেক্ষণে 'শেখ মুজিব হাঁটছিলেন পিচ্ছিল পথে; একদিকে তিনি উত্তেজনাকর বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছিলেন আর অপরদিকে তিনি জনগণকে হিন্দু, খৃষ্টান ও অবাঙালিদের ভ্রাতৃতুল্য বিবেচনা করে যাতে তাদের জানমালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় সে কথা বলছিলেন। তার দলের উগ্রপন্থী কর্মীরা জনসম্মুখে হাজির হচ্ছিল রাইফেল ও শর্টগানের মতো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাতেও মানুষ আসছিল অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে। মুজিব একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও শাসক গোষ্ঠীর সামনে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কোনো বিকল্প সরকার গঠন না করে, সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক দায়দায়িত্ব বা জবাবদিহিতা ছাড়াই তার কর্মী সমর্থকরা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তার নির্দেশনা আনুগত্যের সাথে মেনে চলছিল'।[২]

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও চাকমা প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় সপরিবারে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে ট্রেন আর সরকারের প্রদত্ত সময়সূচি অনুযায়ী চলছে না বরং মুজিবের হুকুম অনুযায়ীই চলছে। তার মতে- এ ছাড়া অরাজনৈতিক ও আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত নন এমন বাংলাদেশীরাও আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে যেন তার কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন- 'মুজিবের ঘোষণা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ও একজন অবিসম্বাদিত নেতার নির্দেশ হিসেবেই যে সবকিছু এভাবে চলছিল তা নয়। বরং এর পিছনে ছিল সহিংসতা ও তার দলীয় ক্যাডারদের সংহিসতার হুমকির ভয়েই এমনটি হয়েছিল'। ইতোমধ্যে নির্বিচারে অবাঙালি বিশেষ করে বিহারীদের হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশকে মনে হয়েছিল একরকম নিষ্ক্রিয় এবং সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল সেনাছাউনির ভিতরে।[৩]

মুজিব তার পিচ্ছিল পথেই হাঁটছিলেন ও সেই ব্যাপক প্রত্যাশিত ৭ মার্চের জনসমুদ্রে উদ্‌গারণ করলেন বিদ্যুৎ চমকানোর মতো বক্তৃতা যাতে স্বাধীনতার ঘোষণা করতে করতে হঠাৎই থেমে গিয়েছিলেন। অনেক বাংলাদেশীই সেদিন আশাহত হন। কারণ তাদের নেতা যতোদূর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন জনগণকে উত্তেজিত করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায়। রুমীর মতো যুবকরাও হয়েছিল আশাহত। তবে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বীরা মনে করেছিলেন শেখ মুজিব দুরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।[৪]

এ সময় ঢাকায় বিদেশীদের মাঝেও আতংক বৃদ্ধি পায়। ১২ মার্চ মার্কিন কনসুলেটে দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হয় ও কেউ একজন কনসুলেট লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলিও ছোঁড়ে। ১৫ মার্চ কনসুলেট লক্ষ্য করে আরো গুলি ছোঁড়া হয়। ১৯ মার্চ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও মার্কিন কনসুলেট ভবনে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। ঢাকা ক্লাব, বৃটিশ কাউন্সিল, আলিকো এবং আমেরিকান দূতাবাসে নিক্ষেপ করা হয় বোমা। তবে ওই সব বোমা তেমন কোনো ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি।[৫]

প্রদেশের অন্যান্য স্থানে উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গা সৃষ্টিকারী বাঙালিদের দ্বারা অবাঙালিদের হত্যা, তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটের ন্যায় ঘটনার তুলনায় ঢাকায় বিক্ষিপ্ত ও আতংক সৃষ্টির ঘটনা বলা চলে কমই ছিল। ১৯৭১ সালে আগস্ট মাসে পাকিস্তান সরকার যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে তাতে এ ধরনের অনেক ঘটনার তালিকা দেয়া হয় যেখানে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে খুলনা, চট্টগ্রামে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে খুলনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ৪ মার্চ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল, ৫ মার্চ খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুরে ছোরা ও দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ৫৭ জন অবাঙালিকে। চট্টগ্রামে ৩-৪ মার্চ ওয়্যারলেস কলোনী ও ফিরোজশাহ কলোনীতে কয়েকশ' অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা করা হয় এবং তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়।[৬] সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এভিয়েশনে কর্মরত ক্যাপ্টেন ইকরাম সেহগাল (পরে মেজর) আমাকে জানান যে, তিনি ওয়্যারলেস কলোনী ও ফিরোজশাহ কলোনীর উপর দিয়ে ৪ মার্চ উড়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান ওই এলাকার সবকিছু পুড়ে কালো ছাই হয়ে গেছে।[৭]

এমনকি সামরিক জান্তার কঠোর সমালোচক সাংবাদিক ম্যাসকারেনাসও পূর্ব পাকিস্তানের অবাঙালি বাসিন্দাদের আতংকের বিষয়টিকে 'ন্যায্য' বলে স্বীকার করেছেন। অবাঙালিদের রক্ষা করার জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও দেশের ছোট ছোট শহরে হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজের মতো ঘটনা ঘটে চলছিল।[৮] সরকারি শ্বেতপত্র এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ও অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী বাঙালিদের বর্ণনায় আওয়ামী লীগ শান্তিরক্ষাকারীদের নয় বরং নেতৃত্ব দিয়েছিল আতংক সৃষ্টিকারী উচ্ছৃঙ্খল জনতার ।

'মুজিবের শাসন' ও সেনাবাহিনী

২২ এফ এফ (ফ্রন্টিয়ার ফোর্স)-এর মেজর (পরে কর্ণেল পদে উন্নীত) শামীম জান বাবর ১৯৭১ সালের মার্চে যশোর, খুলনা এলাকায় কর্মরত ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকেই অবস্থান করছিলেন। তখন থেকেই মাঝে মধ্যে গোলযোগ হচ্ছিল এখানে-ওখানে। তবে ১ মার্চের পর প্রকৃতপক্ষে ওই প্রদেশে শুরু হয় মুজিবের শাসন। কর্ণেল বাবরের মতে ওই সময় মুজিবকে যা খুশী করার এমন সুযোগ দেয়া হয়েছিল যে, যে সব বাঙালি এতোদিন সাতে পাঁচে ছিল না তারাও ভাবতে শুরু করে যে তার (মুজিব) পাশে থাকলেই হয়তো তাদের লাভ হবে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীকে থাকতে বলা হয়েছিল সেনা ছাউনীর সীমানার মধ্যে এবং কোনোভাবেই কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাদের।[৯]

৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট-এর লেফটেন্যান্ট (পরবর্তীতে লে. জে.) গোলাম মোস্তফা ১৯৭০ সাল থেকে অবস্থান করছিলেন যশোরে ।[১০] পূর্ব পাকিস্তানে পৌছানোর মুহূর্ত থেকেই তিনি এক প্রতিকূল পরিবেশ অনুভব করতে থাকেন ও মর্মাহত হন এই জেনে যে তাকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যেতে একটি রক্ষীদলের প্রয়োজন হয়েছিল। ওই বছরই তার ইউনিট ঘূর্ণিঝড়ের ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করে। ত্রাণ কাজ চলাকালীন তিনি লক্ষ্য করেন বাঙালিরা তাদের ত্রাণ কাজ দূর থেকে লক্ষ্য করছে ও অভিযোগ উত্থাপন করে বলছে যে, তেমন কোনো কাজই হয়নি। তার ইউনিট সেই বছরই নির্বাচনী দায়িত্ব পালন কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ আসে। কিন্তু উপরের নির্দেশ থাকায় সেনাবাহিনী নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই হস্তক্ষেপ না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে তাদের দায়িত্ব পালন করে।

মার্চ মাসে উন্মুক্ত বিদ্রোহ শুরু হলে বিক্ষুব্ধ বাঙালি জনতা যশোর শহরের খাদ্য গুদাম ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মতো স্থাপনায় হামলা করার চেষ্টা করে। লে. জে. গোলাম মোস্তফার মতে প্রথম দিকে সেনাবাহিনী আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং তাতে উভয়পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয়।

কিন্তু বাইরে থেকে তাদের সেনানিবাসে ফেরত আসার নির্দেশ দেয়া হয় ও তারপর থেকে তারা ভিতরেই ছিলেন। এরপর শহরের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় এবং এপ্রিলে সেনাবাহিনীর দ্বারা পুনরায় শহরের নিয়ন্ত্রণ না নেয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। ২ মার্চ সান্ধ্য আইন জারী করা হয় ও কয়েকজন সান্ধ্য আইন অমান্যকারীকে গুলি করা হয়েছিল। কিন্তু ৩ মার্চ সেনাবাহিনীকে আবার ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়; সরকারের ওই সিদ্ধান্তকে মারাত্মক ভুল বলে বিবেচনা করেছেন সেই সময় সৈয়দপুর, রংপুর, দিনাজপুর এলাকায় দায়িত্বরত ২৬ এফ এফ-এর কমান্ডিং অফিসর লে. ক. (মে. জে.) এইচ এম কোরেশী। তখন সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল-এমনকি সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়া যাবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না কোনো সেনা সদস্য শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়।

www.pathagar.com

সংবেদনশীল স্থানে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা এ সংবাদটি শেখ মুজিবকে জানিয়ে দেন। এতে কোনো প্রকার শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই বাঙালি দাঙ্গাকারীরা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করা শুরু করে।[১১]

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ কড়া ভাষায় বক্তৃতা দেন ও বালুচ আন্দোলন শক্ত হাতে দমনকারী 'বালুচিস্তানের কসাই' নামে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে ঢাকায় পাঠান। আর্চার ব্লাড লিখেছেন, 'বাঙালিরা যদি গভর্ণর আহসানের অপসারণে আতংকিত হয়ে থাকে তাহলে তারা টিক্কা খানের আগমনেও আতংকিত হয়ে ছিল।'[১২]

জেনারেল টিক্কা খানের গভর্ণর পদে নিয়োগ ১৯৩১ সালে বৃটিশ কর্তৃক স্যার জন এন্ডারসনকে বাংলার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগের সমতুল্য বলে ধরে নেয়া যায়; কঠোর উৎ-পীড়ন ও দমনের সময় এন্ডারসন আয়ারল্যান্ডে ছিলেন যখন বৃটিশ সেনাবাহিনী 'ব্ল্যাক এন্ড টেনস' এর সাহায্য নিয়ে আইরিশ স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যুদ্ধ করেছিলো এবং আশা করা হয়েছিলো যে জেনারেল টিক্কা খান বাংলার বিদ্রোহী প্রদেশে একই নীতি অনুসরন করবেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিচালিত অঘোষিত সমান্তরাল সরকারি প্রশাসন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বাঙালি প্রধান বিচারপতি জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ করাতেও অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে। সেনানিবাসে খাদ্য ও জ্বালানী সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দোকান ও স্থানীয় বাজারের দোকানদাররা সেনাবাহিনীর কাছে সব ধরনের পণ্য বিক্রিতে অস্বীকৃতি জানায়। সেনানিবাসে তাজা খাবার, মাছ, মাংস, সবজি'র সংকট দেখা দেয়; এমনকি বাচ্চাদের দুধের মজুদও শেষ হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর চলাফেরা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় ও সেনাসদস্যদের ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করা ছাড়াও তাদের দিকে থুথু নিক্ষেপের মতো ঘটনা ঘটে। আরো ভয়ংকর ব্যাপার হচেছ সেখানে সেনাদের আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল এবং এ সব ক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনাও ঘটছিল।

মেজর জেনারেল হাকিম আরশাদ কোরেশী লিখেছেন, 'দুই একজন সেনা সদস্যকে প্রতিদিন হত্যা করা এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের এলাকায় ২৯ ক্যাভালরী' র লে. আব্বাসকে আমরা হারিয়েছিলাম। বাঙালি সেনা রক্ষীদের একটি দল নিয়ে লে. আব্বাস সেনাদের জন্য সবজি ক্রয় করতে বের হন। বাঙালি জঙ্গিরা ওই সেনাদলকে আক্রমণ করে আব্বাসকে হত্যা করে, অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়, তবে বাঙালি সৈনিকদের ফেরত পাঠায় অক্ষত অবস্থায় । লেঃ আব্বাসের হত্যাকান্ডের কোনো প্রতিকার করা যায়নি ও আমাদের জানানো হয়েছিল যে এ সময় কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার করাটা হবে অবিবেচকের মতো কাজ। আমাদের ওই নিষ্ক্রিয়তা জঙ্গিদের চাঙ্গা করে তোলে, পক্ষান্ত রে নিজ সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়'।[১৩]

১৮ পাঞ্জাব-এর লে. মোহাম্মদ আলী শাহ যখন ঢাকায় শুনলেন যে তার কোর্সমেট লে. আব্বাসকে হত্যা করা হয়েছে তখন তার মনে হলো পূর্ব পাকিস্তানে চলমান পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই বড় রকমের কোনো গোজামিল সৃষ্টি হয়েছে।[১৪] ১৯৭০ সাল থেকে ঢাকায় দায়িত্বরত লে. শাহ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। অথচ ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে তিনি ঢাকা আসার পর থেকে একজন তরুণ সেনা কর্মকর্তা হিসেবে বরাবরই সুন্দর স্বাভাবিক ও ভালো সামাজিক জীবন উপভোগ করে আসছিলেন

www.pathagar.com

এবং বিশেষ স্থান হিসেবে সে সময় ঢাকা ক্লাবে নিয়মিত স্থানীয় বন্ধুদের সাথে ভালো সময় উপভোগ করেছেন। রাস্তা-ঘাট ও দোকান, বাজারে হিংসা-বিদ্বেষমূলক ঘটনা ঘটতে শুরু করলেও তখন পর্যন্ত সহকর্মী বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা ভালো বন্ধু হিসেবেই ছিল।

নির্বাচনের পরই পরিবেশ ও পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হতে শুরু করে ও সেনাসদস্যরা স্থানীয়দের কাছে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। সেনা কর্মকর্তাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করা হয় ও লে. শাহ সেনানিবাসের বাইরে আসতে সব সময় সাথে প্রহরী নিয়েই বের হতেন। ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ নতুন রেশন পাওয়াটাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায় এবং অফিসার ও সৈনিকদের বাধ্য হয়ে কেবল ডাল, রুটির মতো খাবার খেতে হয় বিরামহীনভাবে। একবার এক ব্যাংক ম্যানেজার লে. শাহ'র লেখা ব্যাংক চেকের বিপরীতে সমপরিমাণ টাকা দিতে অস্বীকার করে জানান যে শেখ মুজিব সেনা অফিসারদের একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত টাকা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এক রাতে লে. শাহ অপর একজন সেনা কর্মকর্তার জরুরী বার্তা (এস ও এস) পেয়ে একটি পশ্চিম পাকিস্তানী পরিবারকে উদ্ধার করে সেনানিবাসে নিয়ে আসেন ও তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। সে দিন রাতে উগ্রপন্থী বাঙালিরা ওই পরিবারটির বাড়ি-ঘর ও কারখানায় হামলা চালিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষারত অবাঙালিরা ভয়ে ও আতংকে বিমানবন্দরের বাইরে না গিয়ে ভিতরেই বসে থাকতো। এ অবস্থায় তেজগাঁও বিমানবন্দরকে মনে হচ্ছিল যেন একটি উদ্বাস্তুদের ট্রানজিট ক্যাম্প ।

অনুগত প্রতিটি সেনা কর্মকর্তা পরিস্থিতির অবনতি, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়া আর উসকানিমূলক আচরণে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তাদের শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি ছিল না এবং তারা সেনানিবাসের মধ্যেই দিন পার করতেন। ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সরওয়ার বর্ণনা করেছেন কীভাবে সেনানিবাসের সীমানার ঠিক পরেই উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী কর্মীরা নিজস্ব ব্যারিকেড তৈরি করেছিল যেখানে তারা পশ্চিম পাকিস্তানীদের তল্লাশি করতো ও এমনকি অনেক সময় মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিত, কিন্তু সেনাদের করার কিছুই ছিল না, কারণ তাদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[১৫] পাকিস্তানী সাংবাদিক ম্যাসকারেনাস যিনি পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সেনা অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন তিনিও ওই মার্চে পাকসেনাদের শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের প্রশংসা করে বলেছেন, 'অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ওইরূপ ধৈর্যধারণকে প্রশংসা করতেই হয়, কারণ সেনা কর্মকর্তারা এতোকিছুর পরও তাদের সৈনিকদের ২৫ দিনের দু:স্বপ্নের ক্রান্তিকালে শান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন'।[১৬]

২৫ মার্চ সেনা অভিযান শুরু হলেও রাতারাতি সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং বলা যেতে পারে তখনই এক সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি অনুসরণ করা শুরু হয়। সম্পূর্ণ ভূখণ্ড অর্থাৎ ভারতের সাথে দেশের সীমানা ব্যাপী সরকারের কর্তৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে সেনাবাহিনীর কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। এ যাবত কিছু না করে বসে বসে খই ভাজা যেন সেনাবাহিনীর একটা পছন্দের নীতিতে পরিণত হয়েছিল। ব্যাপকভাবে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করা, অরাজকতা সৃষ্টির মতো কর্মকাণ্ড চলা সত্ত্বেও সামরিক জান্তা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেনা বাহিনীকে ব্যারাকের মধ্যে বসিয়ে রাখার। অপরদিকে সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মুজিব চালাচ্ছিলেন এক অদৃশ্য সরকার। 'কোনো সংঘাতে জড়িত না হওয়ার সিদ্ধান্ত' ছিল যেন মুজিবকে না চটিয়ে 'শান্ত রাখার' এক কৌশল যেখানে জান্তা হয়তো আশা করেছিল এতে রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সমাধানের পথ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু চরম উসকানির মধ্যেও এ ধরনের নিশ্চুপ বসে থাকার কারণেই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা সরকারকে দুর্বল ভাবতে শুরু করে ও ফলশ্রুতিতে নিরীহ জনগণের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়, ঘটে হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা। তবে সরকার তার দায়িত্ব পালন থেকে সরে দাঁড়ালেও সেই শূন্যতা কিন্তু মুজিবের 'সমান্তরাল সরকার' পূরণ করতে পারেনি। কারণ মুজিব তখনো সরকারকে কেবল চ্যালেঞ্জ করছিলেন, সরকার পরিচালনা করছিলেন না। পরিস্থিতি বিবেচনায় আর্চার ব্লাড মনে করেন, তার (মুজিব) ওই ধরনের অবস্থান ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের, তবে সেখানে ছিল না সরকারের কোনো দায়িত্ববোধ।

১৯৯০'র দশকে বলকান অঞ্চলে জাতিগত জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা সৃষ্টি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মাইকেল ইগনেতিয়েফ লিখেছেন : '... মানুষ খুব ভয় পেলেও চুপচাপ বসে থাকবে, কিছু করবে না। তবে এক ধরনের ভয় আছে যার পরিণতি অন্য সবকিছুর থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ, তা হচ্ছে: ছক বাধা বা পরিকল্পিত ভয় যখন কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে যেতে শুরু করে। যখন বৈধ সরকার বা প্রশাসন ভেঙ্গে যায় তখন সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠে আর সৃষ্টি হয় জাতিগত বিদ্বেষ, ঘৃণা'।[১৭] কার্যত ১৯৭১ সালের বসন্তকালে কয়েক সপ্তাহ যাবত পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সরকারই ছিল না।

যে জনগনকে প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করা হয়েছিল আইন শৃংখলা ভাঙতে সেই জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের ব্যর্থতা। একই অভিযোগ করা যায় তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে যারা জান ও মালের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সঠিক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যখন নীতিগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে একটি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে ২৫ মার্চ সামরিক শক্তি প্রয়োগের চেষ্টাকে একটি ভুল সিদ্ধান্ত বলা যায় তখন পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলোতে সরকারের দায়-দায়িত্ব ত্যাগ করার সিদ্ধান্তও কম বিবেচনায় আনা যায় না।

জয়দেবপুরের ঘটনা, ১৯ মার্চ ১৯৭১

জাহানারা ইমাম তার জার্নাল জাতীয় বইয়ে ২২ মার্চ লিখেছেন 'সেনাবাহিনী জয়দেবপুরে জনতার উপর গুলি ছুঁড়লে তার প্রতিক্রিয়ায় টঙ্গি ও নারায়ণগঞ্জে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জয়দেবপুরের এ ঘটনায় জনগণ যেন নতুন করে উত্তেজিত হয়ে উঠে'।[১৮] মার্কিন কনসাল জেনারেল জয়দেবপুর দুর্ঘনার একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

১৯ মার্চ ঢাকা থেকে কুঁড়ি মাইল উত্তরে জয়দেবপুর রেলওয়ে ক্রসিং-এ সেনাবাহিনী কর্তৃক জনতার উপর গুলি চালালে এক মারাত্মক সংঘর্ষ ঘটে। ধারণা করা হয় যে সেনাবাহিনীকে নিকটস্থ গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা থেকে বিরত রাখতে জনতা সেখানে একটি ব্যারিকেড তৈরি করে এবং এতে রেলওয়ের এক বগিও ব্যবহার করা হয়। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে জনতা তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে এলে সেনাবাহিনী নিজেদের রক্ষার্থে গুলি ছোঁড়ে যাতে একজন নিহত হয়। অপর পক্ষে আওয়ামী লীগ সমর্থিত একটি পত্রিকার মতে সেন-াবাহিনীর গুলিতে নিহত হয় কুঁড়ি জন লোক।

ব্লাড আরো জানিয়েছেন: 'মুজিব নিরস্ত্র জনগণের উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন। ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় আলমগীর (পূর্ব পাকিস্তানে. এসসো' র-[Esso] জেনারেল ম্যানেজার ও আওয়ামী লীগের সাথে ব্লাডের প্রধান যোগাযোগকারী) আমার বাসায় আসেন

www.pathagar.com

কিছুক্ষণের জন্য। তিনি আমাকে জানাতে চেয়েছিলেন যে ওই দিন জয়দেবপুরের দুর্ঘটনার বিষয়টি নিয়ে মুজিব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন এতে জনগণের কাছে সমাধানে উপনীত হওয়ার মতো কোনো কথা বলা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়বে। আবার সেনাবাহিনীও "এ ধরনের প্ররোচণায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে"।[১৯]

এ অদ্ভুত দুর্ঘটনা যা নতুন করে বাঙালি জনতার মাঝে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয় ও যেটাকে মুজিব নিরস্ত্র মানুষের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিক আলোচনায় দরকষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন তা এমন একটা সময়ে ঘটে যখন পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের কথাই ছিল আইন এবং সেনারা ছিল ব্যারাকের মধ্যে আবদ্ধ।

প্রকৃতপক্ষে জয়দেবপুরে কি ঘটেছিল ও কেন ঘটে ছিল? এতে একজন না ২০ জন লোক মারা গিয়েছিল? চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, যাদের মধ্যে দু'জন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন এবং দু'জন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা যারা অখণ্ড পাকিস্তানের সংহতির জন্য লড়াই করেছিলেন, তাদের দেয়া বর্ণনা নীচে দেয়া হলো: তারা পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের শাসনের পঁচিশ দিনব্যাপী সংঘাতের একটি একক দুর্ঘটনার বিভিন্ন স্মৃতির ও সাক্ষ্য প্রমাণের তারতম্যের বিশদ ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা দিয়েছেন। সংঘাতরত স্মৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষন কোনো নিশ্চিত সত্য-মিথ্যা বা ব্যাখ্যার দাবি রাখে এমন সিদ্ধান্তে পৌছতে সাহায্য করে।

জয়দেবপুরের 'রাজবাড়ী': পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫৭ ব্রিগেডের ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যার অধিকাংশ সৈনিক ও কর্মকর্তাই ছিলেন বাঙালি, সেই রেজিমেন্টটির অবস্থান ছিল ঢাকার অল্পদূরে জয়দেবপুর 'রাজবাড়ীতে'। এ স্থানটি হচ্ছে বিশ শতকের বাংলায় ঘটে যাওয়া অন্যতম একটি রহস্যজনক ঘটনার তীর্থভূমি। কথিত আছে ভাওয়ালের কুমার একবার মারা যাওয়ার পর এখানেই পুনরায় আবির্ভূত হন জীবিত হিসেবে।[২০] ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ জয়দেবপুর 'রাজবাড়ীতে' ২ ইবিআর মধ্যাহ্নভোজে আগত তাদের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবকে অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী লে. ক. মাসুদ উল হাসান খান, ২ ইবিআর (বাঙালি) : লে. ক. মাসুদ উল হাসান লিখেছেন: '১৯ মার্চ আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব ৮/১০ গাড়ি ভর্তি সৈনিক নিয়ে জয়দেবপুর আসেন। তিনি জানান, আমাদের অবস্থা ও সমস্যা দেখতেই তিনি এসেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়নি তিনি যা বলছেন তা ঠিক ছিল। কারণ সে ক্ষেত্রে এত বিপুল সংখ্যক সৈনিক সাথে আনার কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। এত বিপুল সংখ্যক সৈনিক আনার পিছনে নিশ্চয়ই কোন পরিকল্পনা ছিল, অর্থাৎ আমাদের নিরস্ত্র করাই ছিল উদ্দেশ্য। আমি বেশ কিছুদিন থেকেই এ রকম কিছু একটা অনুমান করছিলাম।'[২১] লে. ক. মাসুদ লিখেছেন, রেজিমেন্টের মোট ৯০০ সৈনিকের মাত্র ২৫০ জন ছিল জয়দেবপুরে। চারটি কোম্পানীর একটিকে গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা পাহারায় পাঠানো হয়েছিল, দু'টিকে পাঠানো হয়েছিল ময়মনসিংহে-ভারতীয় আগ্রাসনের অজুহাত দেখিয়ে। আর এ একটি মাত্র কোম্পানীকে জয়দেবপুর রাজবাড়ীর হেড কোয়ার্টারে রাখা হয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে, তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল হেড কোয়ার্টার থেকে বাঙালি সৈনিকদের সরিয়ে দেয়া। লে. ক. মাসুদ বলেন, সাধারণ জনতাও ভেবেছিল ২ ইবিআর-এর বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করতেই ব্রিগেডিয়ার আসছেন এবং তারা টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত পুরো রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে। এতে ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে

www.pathagar.com

ব্যারিকেড সরিয়ে জয়দেবপুর যেতে বেশ সময় লেগে যায়। ঢাকায় ফেরার পথেও স্থানীয় জনতা ট্রেনের বগী টেনে নিয়ে রেল লাইনের লেবেল ক্রসিং-এর উপর রেখে দেয়। লে. ক. মাসুদ লিখেছেন ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাকে রাস্তার ব্যারিকেড সরাতে হুকুম দিলেন, বললেন-যদি প্রয়োজন মনে কর তবে বেপরোয়া গুলি চালাও, মাসুদ এ কথাগুলো বিশেষ উক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যেহেতু এ শব্দগুলো ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব দ্বারাই উচ্চারিত হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর ব্রিগেডিয়ার আরবাব অনুধাবন করলেন যে লে. ক. মাসুদ গুলি চালাতে ইতস্তত করছেন, আর তাই তিনি অন্য বাঙালি অফিসার মেজর মইনকে গুলি করার নির্দেশ দিলেন। লে. ক. মাসুদ লিখেছেন, সে (মাসুদ) মইনকে গুলি এমনভাবে করতে বললেন যাতে গুলি জনতার মাথার উপর দিয়ে বা পায়ের নীচে দিয়ে চলে যায়। এতে ব্রিগেডিয়ার আরবাব তার নিজ সেনাদের গুলি ছুঁড়তে আদেশ দেন। এরপর তার সেনারা মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ শুরু করলে 'বেশ কয়েকজন নিহত হয় আর বাকিরা পালিয়ে যায়। নিহতদের মধ্যে মানু মিয়া ও খলিফা নামের দুই জনকে শনাক্ত করা হয়'। লে. ক. মাসুদ উল্লেখ করেন, 'এটা বলা প্রয়োজন যে স্থানীয়রা শটগান, রাইফেল ও ছোরার মতো অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা কতোক্ষণই বা ভারী মেশিনগানের মোকাবিলা করতে পারতো?'[২২] লে. ক. মাসুদ আরো বলেন, ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাকে হুমকি দিয়ে বলেন, তার উচিত তার সৈনিকদের যথাযথভাবে পরিচালনা করা। ২৩ মার্চ মাসুদকে ঢাকায় ডেকে পাঠানো হয় এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। লে. ক. মাসুদ-এর উপ-অধিনায়ক অন্য বাঙালি অফিসার মেজর সফিউল্লাহ তার স্থলাভিসিক্ত হন এবং অন্য একজন বাঙালি অফিসার লে. ক. রকিব ৩২ পাঞ্জাব থেকে ২ ইবিআর এ যোগদান না করা পর্যন্ত তিনিই (মেজর সফিউল্লাহ) উক্ত পদে আসীন ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী-২ মেজর কে এম সফিউল্লাহ, (মে. জে.) সেকেন্ড ইন কমান্ড, ২ ইবিআর (বাঙালি): মেজর জেনারেল (তখন মেজর ও উপ-অধিনায়ক) লিখেছেন: '১৯ মার্চ ব্রিগেডিয়ার জাহানজের আরবাব খানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সেনাদল জুনিয়র টাই-গারদের নিরস্ত্র করতে জয়দেবপুরের পথে রওনা হয়..., এ ধরনের পরিস্থিতিকে মোকাবি-লার জন্য ২য় ইস্ট বেঙ্গলের পূর্ণ প্রস্তুতি থাকায় ব্রিগেডিয়ার আরবাব তার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারেননি। শুধুমাত্র শক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাদের ফিরে যাবার পথে জয়দেবপুরের জনতা সাহসিকতার সাথে রেলক্রসিং- এ মজবুত ব্যারিকেড সৃষ্টি করলে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে ও দু'জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়'।[২৩]

মে. জে. সফিউল্লাহর মতে, ১৯ মার্চ সকাল ১০টায় তার ইউনিটকে জানানো হয় যে, ব্রিগেড কমান্ডার মধ্যাহ্নভোজে আসছেন এবং নিকটবর্তী গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা পরিদর্শন করবেন। তিনি আরো লিখেছেন ১৭ মার্চের মধ্যেই স্থানীয় জনগণ টঙ্গী ও জয়দেবপুরের মাঝে ৫শ'টি ব্যারিকেড বসিয়ে দেয় যা পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। এগুলো একইসাথে বাঙালি সৈনিক ও সেনা কর্মকর্তাদের রসদ সরবরাহেও বাধা সৃষ্টি করছিল। তিনি ও লে. ক. মাসুদ স্থানীয় জনতার সাথে কথা বললেও তারা বাধা অপসারণ করেনি।

মে. জে. সফিউল্লাহ আরো জানান, 'গাজীপুরের পরিস্থিতিও ছিল উত্তেজনাকর। রাস্তায় ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছিল, সমরাস্ত্র কারখানার আবাসিক পরিচালক একজন পশ্চিম পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহকে কারখানার শ্রমিকরা ঘিরে রেখেছিল। আবাসিক

www.pathagar.com

পরিচালককে সেখান থেকে উদ্ধার করতে আমরা সেনা প্রেরণ করেছিলাম'।[২৪]
মে. জে. সফিউল্লাহর মতে দুপুর ১২টায় ২ ইবিআর ব্রিগেডিয়ার আরবাবের পক্ষ থেকে বার্তা পায় যে তিনি তার আগমনের রাস্তার ব্যারিকেড সরাতে সরাতে অগ্রসর হচ্ছেন ও আমরাও যেন আমাদের দিকটায় সবধরণের ব্যারিকেড স্থাপনা সরিয়ে দিই এবং প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করারও নির্দেশ দেন ব্রিগেড কমান্ডার। 'প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে পূর্ণ আত্মতৃপ্তি ও গর্বিত ভঙ্গিতে ব্রিগেডিয়ার তার দলবল- লে. ক. জাহিদ, ব্রিগেড মেজর মেজর জাফর খান, তিনজন ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদমর্যাদার সত্তর জনসহ জয়দেবপুরে এসে পৌছান।'[২৫] মে. জে. সফিউল্লাহ্ ব্রিগ্রেডিয়ার আরবারের সাথে আগত অন্যান্য সেনা কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বলে মনে হয়। এ সব আগত সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে 'লে. কর্নেল ও একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার। মেজর জাফর ছিলেন সাজোয়া বা ট্যাংক রেজিমেন্টের, বাকী দুই ক্যাপ্টেনের একজন পদাতিক বাহিনীর ও অপরজন ছিলেন কমান্ডো দলের।' তিনি এ জাতীয় সংমিশ্রণ দেখে সন্দিহান হলেও সফিউল্লাহ্ কোনো ব্যাখ্যা দেননি যে প্রচলিত সাংগঠনিক রীতি থেকে বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তাদের এভাবে একত্রে আসা কীভাবে ভিন্ন ছিল? মেজর সফিউলাহ্ আরো লিখেছেন সত্তর জন সৈনিক যারা ব্রিগেডিয়ার আরবাবের সাথে ছিলেন তারা 'অজেয় হিসেবে সজ্জিত' ছিলেন ৭.৬২ এমএম চাইনিজ হালকা মেশিনগান দ্বারা। অবশ্য সে সময়ে সৈনিকরা স্বাভাবিকভাবেই ওই অস্ত্র বহন করতো এবং মেজর সফিউলাহ্ নিজেও স্বীকার করেছেন সে সময় বাঙালি সৈনিকরাও বহন করতো একই অস্ত্র।
এদিকে সফিউল্লাহ্ তার সৈনিকদেরকে সঠিক সময়ে বিদ্রোহ করার জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত রেখেছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাকে এ প্রস্তুত অবস্থায় থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন ও সম্ভবত তার মনোভাব অনুমান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
মধ্যাহ্নভোজের সময় রেলওয়ে লেবেল ক্রসিং-এ স্থানীয় জনতার জমায়েত ও রেলওয়ে ওয়াগন দিয়ে রাস্তা বন্ধ করাসহ গোলযোগের সংবাদ আসতে থাকে। ব্রিগেডিয়ার আরবাব লে. ক. মাসুদকে প্রয়োজনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হলেও ব্যারিকেড সরানোর নির্দেশ দেন। মেজর মইনুল হোসেনকে তার কোম্পানীসহ ব্যারিকেডের নিকট পাঠানো হয় ও মেজর সফিউল্লাহ্ রাজবাড়ীতে বাকী সৈনিক নিয়ে অবস্থান করেন। যদিও তিনি নিজ থেকে সেরূপ বলেননি, তাই ব্যারিকেড দেয়ার স্থানে ঠিক কি ঘটেছিল তার যে বর্ণনা মেজর সফিউল্লাহ্ দিয়েছেন তার ভিত্তি ছিল মেজর মইনুল হোসেন ও অন্যান্যদের কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তাই।
এ ভাষ্য অনুসারে ওই দিন হাটবার- এ উপস্থিত প্রায় পঞ্চাশ হাজার জনতার উদ্দেশ্যে মেজর মইনুল বলার চেষ্টা করেন যে, বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করা হয়নি, কিন্তু জনতা না তার কথা, না স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও ওই স্থানে উপস্থিত একজন শ্রমিক নেতার কথা মানছিল। এর মাঝে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব ওই স্থানে পৌছে ব্যারিকেড সরানোর নির্দেশ দিলে '...জনতা আগের চেয়ে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখন ব্রিগেডিয়ার মইনকে গুলি করার নির্দেশ দেন।' তিনি মেজর মঈনকে তার অধিনায়ক বা কমান্ডিং অফিসারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আদেশ নেয়ার জন্য বলেন। পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে যখন হঠাৎ করে দু'জন বাঙালি সৈনিক, একজন ড্রাইভার ও তার সহকর্মী

www.pathagar.com

আকার ধারণ করে যখন হঠাৎ করে দু'জন বাঙালি সৈনিক, একজন ড্রাইভার ও তার সহকর্মী ব্রিগেডিয়ার সাহেবকে জানায় যে, জনতা তাদের বেধরক পিটিয়েছে, পাঁচ জনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিনিয়ে নিয়েছে। ব্রিগেডিয়ার আরবাবের হুকুমে মেজর মঈন তার সৈনিকদের গুলি করার নির্দেশ দিলেও বাংলায় বলেন, যেন গুলি পায়ের নীচে অথবা মাথার উপর দিয়ে যায়। এ অবস্থায় ব্রিগেডিয়ার আদেশ দেন কার্যকরভাবে গুলি করার জন্য। অবশ্য জনতাও পাল্টা গুলি করে। মেজর সফিউল্লাহর মতে (তিনি অবশ্য দৃশ্যপটে উপস্থিত ছিলেন না) 'ব্রিগেডিয়ার ক্রোধান্বিত হয়ে চিৎকার করে বলেন, "আমি একটা গুলির বিনিময়ে একটি মৃত দেহ চাই, যদি তোমরা পরিস্থিতি সামলাতে না পার তাহলে আমি আমার সৈনিকদের নিয়োগ করবো।"'

পরিস্থিতি বিপদজনক মোড় নিলে মেজর মঈন তার সৈনিকদের এবার কার্যকরভাবে গুলিবর্ষণের হুকুম দেন। এরপর গুলির আঘাতে কেউ কেউ পড়ে গেলে বাকীরা পালিয়ে যায়। মেজর সফিউল্লাহর মতে 'জনতার মাঝ থেকে বিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণে আমাদের জোয়ানদের অনেকেই আহত হয়। ব্যারিকেডের পিছনে মসজিদের উপর থেকে চাইনিজ সাব-মেশিনগান দিয়ে ব্রিগেডিয়ারের উপর গুলিবর্ষণ করা হলেও সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান'।

সফিউল্লাহর মতে বিশ মিনিট ধরে সংঘর্ষ চলার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, ব্যারিকেড সরিয়ে নেয়া হয় এবং ব্রিগেডিয়ার আরবাব ঢাকা ফিরে যাবার পূর্বে ওই এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করে হারানো অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার , ব্যবহৃত গোলাবারুদের পরিমাণ নিরূপণ, মৃত ও আহতদের ব্যাপারে রিপোর্ট করার নির্দেশ দিয়ে যান। 'ব্রিগেড কমান্ডারকে হতাশ করে আমাদের রিপোর্টে মাত্র দু'জন মৃত ও কয়েজনকে আহত দেখান হয়েছিল। এ রিপোর্টে ব্রিগেড কমান্ডার সন্তুষ্ট হননি। তিনি জিজ্ঞেস করেন "মাত্র দুইজন লোক মারতে ৬৩ রাউন্ড গুলি খরচ করা হলো কেন?"'[২৬]

মেজর সফিউল্লাহ মনে করেন ব্যারিকেডের স্থানে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হতো যদি শুধুমাত্র বাঙালি কর্মকর্তাদের ধৈর্য ও কৌশলের সাথে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দেয়া হতো। তার মতে, সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করলে জনতা 'আত্মরক্ষার্থে' গুলি করেছিল। ওই একই রাতে ব্যাটালিয়নের পাঁচ কর্মকর্তার পাঁচজন বাঙালি ব্যাটম্যান অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে পালিয়ে যায়। এ সব ঘটনার ফলে অবশেষে লে. ক. মাসুদকে কমান্ড থেকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় অপর বাঙালি লে. ক. রকিবকে দায়িত্ব নেয়ার জন্য পাঠানো হয়। এ লে. ক. রকিবকে ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টেন কমান্ডিং অফিসার থাকাকালে ১ মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমর্থকদের উপর গুলি চালিয়ে বেশকিছু নির্দোষ বাঙালি হত্যার জন্য অভিযুক্ত করেন মেজর সফিউল্লাহ। যদিও এ কথিত অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত কিছুই উপস্থাপন করতে পারেননি।

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও লে. জেনারেল (তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার) জাহানজেব আমার সাথে সাক্ষাত করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের উত্থাপিত অভিযোগের ব্যাপারে নিরপেক্ষ কোনো পক্ষ থেকেই নিশ্চিত হওয়া যায়নি। যা হোক, আমি ওই দিনের ঘটনা সম্পর্কে পাকিস্তানী বিবরণ সংগ্রহের জন্য চাক্ষুষ সাক্ষী অপর দুই সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ও ব্রিগেডিয়ার (তৎকালীন মেজর) জাফর খানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করি। দু'জনই ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে

www.pathagar.com

চিনতেন, তার সাথে কাজ করেছেন এবং উভয়েই ওই দিন গাজীপুর ও জয়দেবপুরের ঘটনা ঘটার সময় ওই জায়গাগুলোয় উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষী-৩: মেজর জাফর খান, ব্রিগেড মেজর, ৫৭ ব্রিগেড (পশ্চিম পাকিস্তানী): মেজর জাফর খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় পৌঁছে ৫৭ ব্রিগেডের বাঙালি ব্রিগেড মেজর মেজর খালেদ মোশারফের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন।[২৭] তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, হেডকোয়ার্টার ত্যাগ করতে মেজর খালেদ মোশাররফ ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করেছিলেন। তিনি জানান, তার ঢাকা পৌঁছানোর কয়েক দিনের মধ্যে ঢাকায় অনেক কিছু ঘটে যায়। জেনারেল টিক্কা খান দায়িত্ব বুঝে নেন, জেনারেল ইয়াকুব খান পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান এবং শেখ মুজিব ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে তার বিখ্যাত বক্তৃতা দেন যা স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে অল্প দূরে থেমে যায়। ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য ঢাকা পৌঁছান।

ব্রিগেডিয়ার (মেজর) জাফরের দেয়া বর্ণনা মতে, ৫৭ ব্রিগেডের বিগ্রেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার আরবাব, অন্য একজন কর্মকর্তা এবং তিনি জয়দেবপুরে ২ ইবিআর পরিদর্শনে যান ও তাদের সাথে ছিল ৩০ জন সৈনিকের একটি প্লাটুন। মেজর জাফরের বর্ণনায় উল্লেখিত অফিসার ও সৈনিকের সংখ্যার সাথে মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ'র দেয়া হিসেবে যা উপরে দেয়া হয়েছে তা ছিল সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী।

ব্রিগেডিয়ার (মেজর) জাফরের মতে, জয়দেবপুরে তাদের পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি ইউনিট পরিদর্শন ও সেখানকার পরিস্থিতি আঁচ করা। তিনি বলেন, তারা বাঙালি ইউনিটকে নিরস্ত্র করতে যাননি, কারণ সেসময় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ঢাকায় উচ্চপর্যায়ের আলোচনা চলছিল এবং প্রেসিডেন্ট নিজে ঢাকা শহরে অবস্থান করছিলেন। যদি নিরস্ত্র করার পরিকল্পনাই থাকতো তাহলে প্রথমেই ঢাকার বাঙালি ইউনিটগুলোকে তা করা হতো, ঢাকা থেকে ২০ মাইল দূরের জয়দেবপুরে নিরস্ত্র করার দরকার প্রথমেই হতো না। পরিদর্শনকারী দল জয়দেবপুরের রাজবাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজ সম্পন্ন করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। যখন তারা ফিরে আসতে আরম্ভ করেন তখন রেলওয়ে ওয়াগন দিয়ে লেবেল ক্রসিং বন্ধ করে দেয়া হয়। সেখানে শ' শ' লোক উপস্থিত হয় উত্তেজিত অবস্থায়। ব্রিগেডিয়ার জাফরের মতে, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোম্পানী জনতার উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে, কাজেই পরিদর্শনকারীদের নিজস্ব বাহিনীকে গুলি চালাতে হয়েছিলো এবং জনতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তারা নিজেরাই রেলওয়ে ওয়াগন লেবেল ক্রসিং থেকে সরিয়ে দেন। জনতাও সেনাবহিনীর দিকে গুলি ছোঁড়ে। জনতার মধ্যে দু'জনের গায়ে গুলি লাগে ও সেনাবাহিনীর দু'জন আহত হয়। প্রায় বিশ থেকে ত্রিশ মিনিটি ধরে গুলি বর্ষণ স্থায়ী হয়।

দলটি ঢাকায় তাদের ব্যারাকে ফিরে গেলে সেখানে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কারন প্রথম বারের মতো ব্রিগেড কমান্ডার তার নিজের একটি ইউনিট পরিদর্শনের সময় আক্রান্ত হয়েছেন। এ পরিদর্শনের ফলে ব্রিগেডিয়ার আরবাব বাঙালি কমান্ডিং অফিসার লে. ক. মাসুদকে সরিয়ে দিতে মনস্থ করেন। তার স্থানে অপর একজন বাঙালি লে. ক. রকিব যিনি ৩২ পাঞ্জাবের কমান্ডে ছিলেন তিনি লে. ক. মাসুদের স্থলাভিষিক্ত হন। এভাবে মাসুদকে কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হয় ও রকিবকে সরিয়ে দেয়া হয় ঢাকা থেকে।[২৮]

প্রত্যক্ষদর্শী ৪: ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ, আবাসিক পরিচালক, গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা (পশ্চিম পাকিস্তানী): ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ তার লগ বইয়ে যে প্রথম কথাগুলো লিপিবদ্ধ

www.pathagar.com

করেছেন তা থেকেই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘটনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

২ মার্চ ১৯৭১

সকাল ৯.১৫ মিনিট। প্রায় ৩০০০ বহিরাগত পাকিস্তান সমরাস্ত্র কারখানায় প্রবেশ করে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের বের করে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে। আমি এমওডিসির সহযোগিতায় ওই সব বহিরাগতদের অস্ত্রের মুখে কারখানা এলাকা থেকে বের করে দিতে সক্ষম হই। ঢাকার বাইরে এখানে কোনো ধর্মঘট ছিল না। আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ করতে রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য লোক হাতে ছোরা, তীর, ধনুক ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে গাজীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত তিন স্থানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমাকে একজন পাঞ্জাবী ব্রিগেডিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে ঘোষণা করেছে যে কোনো উপায়ে আমার মাথা তাদের চাই।[২৯]

লগ বইয়ের রেকর্ড অনুসারে দিনটি দুশ্চিন্তা ও এক নাগাড়ে ছোটখাট সংঘর্ষের মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং বাঙালি সৈন্য ও শ্রমিকরা মিছিল বের করে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ এবং অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারী অফিসারদের 'কল্লা কেটে নেয়ার' জন্য চিৎকার করছিল। সকল অবাঙালি কর্মচারী ও তাদের পরিবারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নাজেহাল করা হয় ও তাদের রেশন দেয়া হচ্ছিল না। কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, কারণ বাঙালিরা দুপুর দু'টার পর কাজ করতে অস্বীকার করে বসে। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ নিজেকে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রেখে বাঙালি কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করেন এবং সে সাথে কারখানা ও তার কর্মীদের রক্ষা করতে ও সংকট থেকে মুক্তি পেতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট অতিরিক্ত সৈন্যের জন্য অনুরোধ জানান।

৮ মার্চ কারখানার শ্রমিকরা আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করার জন্য 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। কারখানা থেকে বের হওয়ার যে কোনো প্রচেষ্টা তারা প্রতিহত করে। স্থানীয় ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানী ও অন্যান্য অবাঙালি অফিসারদের চেকের বিপরীতে নগদ অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়। কাজের প্রয়োজনে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহকে ঢাকায় যেতে হয়েছিল হেলিকপ্টারে চড়ে, এবং অন্য কোনো ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তিনি আবার ঢাকা থেকে কর্মস্থলে ফিরে আসতে পারছিলেন না, বরং ঢাকায় আটকে ছিলেন। অবশেষে ১৪ মার্চ লে. ক. মাসুদ তাকে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করতে রাজি হন এ শর্তে যে তিনি কাউকে এ ঘটনা বলতে পারবেন না। তিনি দেখলেন বিমানবন্দর পশ্চিম পাকিস্তানী ও অন্যান্য অবাঙালি পরিবার পরিজনের পদভারে লোকে লোকারণ্য যারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ঘর-বাড়ি সহায় সম্পত্তি ফেলে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য তাকে মনে করিয়ে দেয় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের কথা। এদিকে কারখানার পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে বার বার তাকে অনুরোধ করতে থাকেন পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্য ।

১৭ মার্চ ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ আওয়ামী লীগের নির্দেশে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' নামে একটি প্রাইভেট আর্মি গড়ে তোলার ব্যাপারটি জানতে পারেন। এ বাহিনীর সদস্যরা শটগান ছাড়াও হাতে ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়াতো সর্বত্র। সংগ্রাম পরিষদের লোকেরা কারখানার গেটে পাহারা দিত যেন কোনো পশ্চিম পাকিস্তানী বা অন্য অবাঙালি কারখানা থেকে বের হতে না পারে। বাঙালিরা অবশ্য যেখানে খুশি যেতে পারতো, বিশেষ করে কোনো

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সমাবেশে।

১৮ মার্চ সকালে নয়টি মিনিবাসে করে বাঙালি কর্মকর্তা ও শ্রমিকরা জয়দেবপুরে একটি সমাবেশে যোগ দিতে কারখানা থেকে রওনা দেয়। এরা চলে যাওয়ার পরে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ একটি গুজবের কথা জানতে পারেন যেখানে রটিয়ে দেয়া হয় যে জয়দেবপুরস্থ বাঙালি ব্যাটালিয়ানকে নিরস্ত্র করা হবে। এ গুজবের উপর ভিত্তি করে ওই ধরনের কোনো নিরস্ত্রীকরণের প্রতিবাদ করতেই নয় বাস ভর্তি বাঙালিরা সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আরো জানা যায় তারা বাঙালি অধিনায়ক লে. ক. মাসুদকে বলবে অস্ত্র জমা না দেয়ার জন্য। এরপর তিনি দেখলেন তার টেলিফোন লাইনটিও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে।

ওই সন্ধ্যায় টেলিফোন লাইন কাটা থাকায় ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ লে. ক. মাসুদের সাথে ওয়্যারলেসে কথা বলেন। 'লে. ক. মাসুদ নিশ্চিত করে জানান তাকে এ ধরনের (নিরস্ত্র করা সংক্রান্ত) কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি এবং এ নিয়ে যা কিছু শোনা গেছে তা ভুল বোঝাবুঝির জন্যই হয়েছে। যা ঘটেছিল তা হচ্ছে- ওই ঘটনার আগে বাঙালি ব্যাটালিয়নটিতে ৩০৩ রাইফেল ও হালকা মেশিনগান ছিল। চাইনিজ রাইফেল বরাদ্দ দেয়ার পর তাদের বলা হয়েছিল পুরনো অস্ত্র ডিপোতে জমা দেয়ার জন্য। কিন্তু ওতেই স্থানীয়রা ধরে নেয় হয়তো বাঙালি ইউনিটটিকে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে'।

সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণ প্রতিহত করার লক্ষ্যেই বাঙালিরা ঢাকা-জয়দেবপুর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে ও রেলওয়ে ষ্টেশন যাওয়ার রাস্তাটিও বন্ধ করে দেয়। লে. ক. মাসুদ বলেন, 'তিনি নিজেও বাঙালিদের চোখে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি সম্মত হয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীদের হুকুম অনুযায়ী অস্ত্র জমা দিতে'। লে. ক. মাসুদ জানান, তিনি স্থানীয় নেতাদের ডেকে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে চান ও বেসামরিক পুলিশকে ডেকে গুজবটি না ছড়ানোর জন্য বলেন, কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল এবং এর প্রতিকার করতে লেগে যায় অনেক সময়। চারদিকে রাস্তায় দেয়া ব্যারিকেডের জন্য তাদের নিয়মিত রেশন সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। তার নিরাপত্তা বিভাগের একজন সুবেদার একদিন জয়দেবপুর 'রাজবাড়ী'র চারদিকে হাজার হাজার লোকের ঘিরে ফেলার কথা জানালে তাকে দীর্ঘসময় ধরে জনতাকে বোঝাতে হয় নিরস্ত্র করার গুজবে বিশ্বাস না করার জন্য।

১৯ মার্চ বেলা ১১.৫৫ মিনিটে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ রাজবাড়ীতে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবের সাথে মধ্যাহ্নভোজের জন্য ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. ক. মাসুদের কাছ থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে আমন্ত্রণ পান। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ আমন্ত্রটি গ্রহণ করেন।

দুপুর ১.১০ মিনিটে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ তিনজন সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে নিজে জীপে চড়ে জয়দেবপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সংগ্রাম পরিষদের লোকেরা তার জীপটি গেটে থামিয়ে দেয় ও তাকে মধ্যাহ্নভোজে যেতে দিতে অস্বীকার করে বসে। তারা বলতে থাকে যে তাদের কাছে খবর আছে পাঞ্জাবী বা বালুচ রেজিমেন্ট জয়দেবপুরের পথে রওনা হয়ে গেছে ও তাদের লোকজন ওই রেজিমেন্টকে সেখানে যাওয়া বন্ধ করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ অবস্থায় ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ মধ্যাহ্নভোজে হাজির হওয়ার চিন্তা বাদ দেন এবং ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারকে মধ্যাহ্নভোজে আসতে অসমর্থের কথা জানিয়ে দেন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে ।

www.pathagar.com

দুপুর ১.৪০ মিনিটে সাইরেন ও মানুষের বিদ্রুপাত্মক চিৎকারে কারখানা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ গেটের বাইরে ধাবমান জনতাকে আসতে দেখতে পান, যাদের হাতে ছিল ছোরা, বাঁশের লাঠি ও বেশ কয়েকজনকে শটগান, ০.২২ ও অন্যান্য ক্যালিবারের রাইফেলও বহন করতে দেখা যায়। সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে তারা শুনেছিল যে, পাঞ্জাব কিংবা বালুচ রেজিমেন্ট ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করতে ও কারখানার নিয়ন্ত্রণ নিতে জয়দেবপুরে দিকে ধেয়ে আসছে। তাই তারা ওই রেজিমেন্টের গতিপথ রোধ করতে যাচ্ছিল। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ লে. ক. মাসুদের সাথে যোগাযোগ করলে তাকে (ব্রিগেডিয়ার করিমুলাহকে) জানান হয় ব্রিগেডিয়ার আরবাবের তার ব্যাটালিয়ানে নিয়ম-মাফিক পরিদর্শন ও মধ্যাহ্নভোজে উপস্থিত হওয়ার খবর থেকেই এরূপ ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে জয়দেবপুরের দিকে অগ্রসরমান সৈন্যদলটি রাস্তার ব্যারিকেড সরিয়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে:

দশ মিনিট পর ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবকে ওয়্যারলেস সেটে পাই। শুনে দু:খ পেলাম যে আমি তার সাথে মধ্যাহ্নভোজে যোগ দিতে পারছি না। যাহোক, তার ঢাকা ফিরে যাওয়ার পথে তিনি সমরাস্ত্র কারখানায় আমাকে সাক্ষাত দিয়ে যাবেন বলে জানান। হায় আল্লাহ! সেনা ভর্তি প্রায় দশ বারটি ট্রাক সাথে নিয়ে তার দলের জয়দেবপুর সড়কের প্রধান চৌরাস্তা অতিক্রম করাটা আমার লোকদের উপর একরকম বিশৃঙ্খলার প্রভাব ফেলেছে। তারা যদি সত্যিই সমরাস্ত্র কারখানায় আসতেন তাহলে সেখানে উপস্থিত বাঙালিরা তাদের কি করতো? তিনি কৌতুক করে বলেছিলেন, আমি কি আজকের কথা না অন্যকোনো একদিনের কথা বুঝিয়েছি? আমি তাকে বলি যে আজকের কথাই তো বলতে চেয়েছি; তবে পরিস্থিতি এখন যা তাতে মনে হয় অন্য যেকোনো সময় যখন অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে তখনই তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করা ঠিক হবে।

ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ তার শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থাটা ব্যাখ্যা করতে গেটে গিয়েছিলেন। সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরাও ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে ফোন করে জানতে পেরেছিল যে, ব্রিগেডিয়ার আরবাবের পরিদর্শন ও মধ্যাহ্নভোজ ছিল নিছক নিয়ম মাফিক একটি ব্যাপার। তিনি ব্যাখ্যা করে সবাইকে জানান যে, তিনি ওই দিন কারখানা পরিদর্শন না করার জন্য ব্রিগেড কমান্ডার আরবাবকে অনুরোধ করেছেন এবং ২য় ইষ্ট বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করার বিষয়টি ঠিক নয় বলেও উল্লেখ করেন। তিনি তার শ্রমিকদের বলেন, তাদের জয়দেবপুর যাওয়া উচিত নয় ও পরিদর্শনকারী সেনা দলটিকে ঢাকা ফিরে যেতে যেন কোনো বাধা সৃষ্টি করা না হয়।

বিকাল ৪-১০ মিনিটে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ পুনরায় ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যোগাযোগ করেন ও সেখানকার সেকেণ্ড ইন কমান্ড মেজর সফিউল্লাহর কথা শুনে আতংকিত হয়ে পড়েন যে, ব্রিগেডিয়ার আরবাবের সেনাবহর জয়দেবপুর বাজারে আটকে গেছে এবং সেখানে প্রচণ্ড রকমের গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে।

জয়দেবপুর বাজারে গুলির শব্দ শুনে মুহূর্তের মধ্যে আবারও সাইরেন বেজে ওঠে ও অস্ত্রধারী লোকজন সর্বত্র ছোটাছুটি করতে থাকে। উত্তেজিত লোকজন অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সাইরেনের দাবি করে। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ তাদের সাইরেন বাজিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন কিন্তু কারখানার দিকে অগ্রসর হলে সোজা গুলি করা হবে বলে হুমকি দেন। সন্ধ্যা ৫.৫০ মিনিটে মেজর সফিউল্লাহ জানান, পরিদর্শনকারী সেনাবহর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে ও জয়দেবপুরে জারী করা হয়েছে সান্ধ্য আইন। ওই রাতে ব্রিগেডিয়ার তার

www.pathagar.com

বিছানার নিচে একটি এম-১৬ রাইফেল ও বালিশের নিচে একটি ০.২৫ পিস্তল রেখে ঘুমিয়েছিলেন।

ওই সন্ধ্যায় রেলের লেবেল ক্রসিং- এ কি ঘটে ছিল তার একটি বিবরণ তার নিরাপত্তা শাখার সুবেদার আজিজের কাছ থেকে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ পেয়েছিলেন। ওই দিন সাপ্তাহিক হাটের দিন থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ওই স্থানটি লোকে লোকারণ্য ছিল। স্থানীয় আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদের প্ররোচণায় আরো অনেক লোকের সেখানে সমাবেশ ঘটে। আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুল্লাহর বিশ্বাস ছিল পাঞ্জাব কিংবা বালুচ রেজিমেন্ট জয়দেবপুরের বাঙালি ব্যাটালিয়ানকে নিরস্ত্র করার জন্য এসেছে। কিন্তু তিনি প্রকৃত ঘটনা জানার পর যখন পাল্টা পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করেন ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। উত্তেজিত জনতা তার কথায় কর্ণপাত না করে ততোক্ষণে একটি মালবাহী বগী আড়াআড়িভাবে ঠেলে দিয়েছে লেবেল ক্রসিং- এ।

ব্রিগেডিয়ার আরবাব ও তার সেনাবহর ঢাকা ফিরে যাওয়ার পথে সেখানে পৌছালে বাঙালি কমান্ডিং অফিসার লে. ক. মাসুদ দীর্ঘ সময় ধরে ব্যারিকেড সরিয়ে নেয়ার জন্য জড়ো হওয়া লোকদের রাজি করাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। সৈন্যরা বগিটি একদিকে ঠেলে দিলে উত্তেজিত জনতা গুলি চালায়। প্রতিউত্তরে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা গুলি চালালে দু'জন নিহত হয়। ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রেশন বহনকারী একটি গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে একজন এ দুর্ঘটনায় নিহত হয়। উত্তেজিত জনতা ইষ্ট বেঙ্গলের ছয়জন সৈনিককে তাদের অস্ত্রসহ অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেণ্ড ইন কমান্ড মেজর সফিউল্লাহ পরদিন সকালে গাজীপুর পৌছে জানান গাজীপুরকেও আনা হয়েছে সান্ধ্য আইনের আওতায় ।

২১ মার্চ লে. ক. মাসুদ সমরাস্ত্র কারখানায় আসেন ও ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহর সাথে জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের উভয়ের আলোচনা থেকে যা জানা যায় তা ছিল; ইষ্ট বেঙ্গলের জোয়ানরা রেলওয়ের বগিটি একপাশে সরানোর চেষ্টা করলে তাদের উপর শুধু শর্টগান নয় বরং ০.২৫ রাইফেল, অন্য একটি ভারী অস্ত্র ও একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে গুলি চালান হয় (সম্ভবত স্টেনগান)। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার্থে সে সময় সেনাবাহিনী গুলি ছোঁড়ে। এর আগে তারা জনতার সাথে কমপক্ষে চল্লিশ /পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা বলেন যাতে সেনাদলটিকে নির্বিঘ্নে ঢাকার পথে যেতে দেয়া হয়, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি।

জয়দেবপুরের ঘটনার উপর অভিমত : উপরে বর্ণিত জয়দেবপুরের ঘটনা নিয়ে চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে দু'পক্ষই কয়েকটি বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন:

১৯ মার্চ ১৯৭১ , ৫৭ ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব তারই ব্রিগেডের অংশ ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিদর্শনে এসেছিলেন; জয়দেবপুর যাওয়ার পথে রাস্তায় অসংখ্য ব্যারিকেড তাদের সরাতে হয়েছিলো যেগুলো স্থানীয় লোকজন সেনাবাহিনীর চলাচলে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছিলো এবং তাদের বলা হয়েছিল যে সেদিন বাঙালি ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হবে; ব্রিগেডিয়ার আরবাব ও তার দলটি ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে মধ্যাহ্নভোজ সম্পন্ন করেন এবং ঢাকায় ফিরে যাচ্ছিলেন; একটি বিশাল জনতা সশস্ত্র ও উগ্র রূপ ধারণ করে জয়দেবপুর বাজারে একত্রিত হয় ও লেবেল ক্রসিং এ

www.pathagar.com

আড়াআড়িভাবে একটি রেলওয়ে ওয়াগনকে রেখে দিয়ে তাদের ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করে; বাঙালি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার ও তার অন্য কর্মকর্তারা রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে নেয়ার জন্য জনতাকে রাজী করাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন; স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা যিনি বাঙালি সৈনিকদের নিরস্ত্র করা হবে এ কথা বলে লোকজনকে সংগঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন তিনি এবার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করে তার পূর্বের মতো পাল্টিয়ে ওই লোকদের রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরাতে বললেও কেউ তার কথায় কর্ণপাত করেনি; সেনাবাহিনী ও জনতা একে অপরের দিকে গুলি ছোঁড়ে; দু'জন লোক নিহত হয়; একটি পৃথক কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঘটনায় একদল বাঙালি সেনা দল জয়দেবপুরের দিকে আসার পথে জনতার দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং তাদের অস্ত্র ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এ ঘটনায় একজন নিহতও হন; প্রায় বিশ ত্রিশ মিনিট গুলি চলে; দু'জনের গুলির আঘাত লাগলে জনতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো, সেনা সদস্যরা ওয়াগনটি সরিয়ে দিয়ে ঢাকা ফিরে যায়; ওইদিনটির ঘটনা প্রবাহের পর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি কমান্ডিং অফিসারকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং অন্য একজন বাঙালি কর্মকর্তাকে তার স্থান বসানো হয়।

এ ছাড়াও বিবরণ থেকে যে সব দাবি মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হয়: শেখ মুজিব দাবি করেছিলেন জয়দেবপুরে জনতা ছিল নিরস্ত্র যা ছিল সম্পূর্ণ অসত্য, সেখানে সে সময় উত্তেজিত জনতার হাতে বন্দুকসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র ছিল; এ ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় ওই চারজন সাক্ষীর দেয়া বর্ণনায় যার মধ্যে দু'জন কর্মকর্তা ছিলেন বাঙালি। আবার কেবলমাত্র সেনাবাহিনীই জনতার উপর গুলিবর্ষণ করেনি এবং ওই জনতা বাঙালি সেনা সদস্যদের উপরও গুলি ছোঁড়ে যারা জয়দেবপুরের দিকে আসছিল। সেকেণ্ড ইন কমান্ড মেজর সফিউল্লাহর মতে যিনি একটি বিদ্রোহ পরিকল্পনার দাবি করেন তিনি জানান একটি ছিনতাই করা চাইনিজ সাব মেশিনগান ব্রিগেডিয়ারের দিকে গুলি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটা কোনো বিক্ষিপ্তভাবে গুলিবর্ষণের ঘটনা ছিল না বরং অস্ত্রধারী ও বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করার ফলেই অমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে তারা সেনাবাহিনী বা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের অনুরোধ সত্ত্বেও ব্যারিকেড তুলে নিতে অস্বীকার করেছিল। তাহলে বলা যায় সেখানে ব্যারিকেড না দিলে বা অনুরোধ করার পর ব্যারিকেড তুলে নিলে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতো না। ওখানে যদি প্ররোচণার কোনো ব্যাপার থাকে তবে তা করেছিল উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী কর্মীরাই। তারা স্থানীয় লোকদের এ বলে প্ররোচিত করে যে তাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করার জন্যই পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা ও সেনারা জয়দেবপুরের দিকে আসছেন। আওয়ামী লীগের দাবির বিপরীতে (দাবি ছিল ২০ জন নিহত হয়েছে) দু'জন লোক নিহত হয়েছিল ওই দুর্ঘটনায় ও আরো একজন নিহত হয়েছিল সম্ভবত কোনো যানবাহনে হামলা চালানোর ফলে।

এদিকে দ্বিমতের বিষয়গুলো হচ্ছে কতোজন সৈনিক ও কতোজন সেনা কর্মকর্তা কি উদ্দেশ্যে পরিদর্শনে এসেছিলেন? মেজর (মে. জে.) সফিউল্লাহ, বাঙালি সেকেণ্ড ইন কমান্ড, ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট দাবি করেছেন ব্রিগেড কমাণ্ডার পাঁচজন কর্মকর্তা ও সত্তর জন জওয়ান নিয়ে এসেছিলেন, অথচ মেজর (ব্রিগেডিয়ার) জাফর, পশ্চিম পাকিস্তানী ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর উল্লেখ করেছেন ব্রিগেড কমাণ্ডার দু'জন কর্মকর্তা ও ত্রিশজন জওয়ান নিয়ে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বাঙালি কর্মকর্তাদের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা এসেছিলো তাদের ব্যাটালিয়ানকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে, যদিও নিরস্ত্রীকরণের কোনো ঘটনা সেখানে ঘটেনি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা উল্লেখ করেছেন এ পরিদর্শন ছিল সমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্যে সংঘটিত একটি নিয়মতান্ত্রিক ঘটনা। হয়তো এটা সত্য যে, এ পরিদর্শনটা রুটিনমাফিক বা এর বাইরেও কিছু একটা ছিল এবং পরিদর্শনটা বিশেষ করে ওই মুহূর্তে বাঙালি ব্যাটালিয়ানের বিশ্বস্ততা যাচাই করার জন্যও হতে পারে, কিন্তু কোনো যুক্তিতেই চূড়ান্তভাবে বলা যাবে না যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা কেবলমাত্র বাঙালি ব্যাটালিয়ানকে নিরস্ত্র করার জন্যই জয়দেবপুর এসেছিলেন।

বাঙালি অফিসারদের নিজেদের দেয়া তথ্য থেকেই জানা যায় ব্যাটালিয়ানের মাত্র একটি কোম্পানী জয়দেবপুরে ছিল। এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে একজন ব্রিগেড কমান্ডার ঢাকা কিংবা অন্যান্য বাঙালি ইউনিটকে নিরস্ত্র না করে ঢাকা থেকে বিশ মাইল দূরের জয়দেবপুর এসেছিলেন একটি মাত্র কোম্পানীকে নিরস্ত্র করার জন্য! অথচ তখনও একটা বোঝাপড়ার লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় মুজিব ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে আলোচনা চলছিল। লে. ক. মাসুদ জানিয়েছেন জয়দেবপুরে তার কাছে ছিল মাত্র ২৫০ জন সৈন্য। মেজর জাফরের মতে, পরিদর্শনকারী দলটিতে ৩০ জন সৈন্য ছিল ও মেজর সফিউল্লাহর মতে, ওই দলে ৭০ জন সৈন্য ছিল এবং তাদের হাতে সাধারণ অস্ত্র ছিল; পক্ষান্তরে বাঙালিদের হাতে স্বভাবতই ছিল অধিক সংখ্যক সৈন্য ও অনেক বেশি গোলাবারুদ। প্রকৃতপক্ষে মেজর সফিউল্লাহর দাবি অনুযায়ী তার সৈন্যদের পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকার অবস্থায় দেখে ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব জয়দেবপুর পৌছানোর পর নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় যে, ব্রিগেডিয়ার পরিস্থিতি বুঝতে এসেছিলেন এবং জয়দেবপুরে তার অভিজ্ঞতার পর তিনি ব্যাটালিয়ানটির পরিবর্তন হওয়া দরকার বলে মনে করেছিলেন। অপরদিকে উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য কমান্ডিং অফিসারকে সরিয়ে অন্য একজন বাঙালি কমান্ডিং অফিসারকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার (লে. জে.) আরবাবের ব্যাপারে অভিযোগ হচ্ছে, তিনি সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আরবাব আমার সাথে কথা বলতে অপারগতা প্রকাশ করেন ও ওই ঘটনার উপর তার কোনো মতামতও প্রকাশিত হয়নি। মেজর জাফর যিনি তার সাথে চাকরি করেছেন ও ওই দিন জয়দেবপুরে তার সাথে ছিলেন তিনি আমাকে বলেছেন যে, ব্রিগেডিয়ার সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অপর একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার যিনি ব্রিগেডিয়ার আরবাবের সাথে পূর্ব পাকিস্তানে চাকরি করেননি তিনি তাকে নিষ্ঠুর হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সংকট নিরসনে কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেনা কমান্ডারদের মত পার্থক্য থাকতে পারে যেমন জয়দেবপুর বাজারের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, এখানে ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে ওই দুর্ঘটনার পর সেখানে দায়িত্বরত কমান্ডিং অফিসারকে সরিয়ে দেয়ার জন্য তাকে খুব কমই দোষারোপ করা যায়। দু'জনের লাশের জন্য বাঙালি সৈনিকদের তেষট্টি রাউণ্ড গুলি খরচ করার সংবাদে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের অসন্তুষ্টির অভিযোগে বাঙালি অফিসার মেজর সফিউল্লাহ মন্তব্য করেছেন ব্রিগেডিয়ার আরবাব তেষট্টি জনের লাশ দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর বিকল্প ব্যাখ্যা দেয়াও সম্ভব; সর্বপরি যেখানে মাত্র দু'জন নিহত হয়েছিল সেখানে তেষট্টি রাউণ্ড গুলি খরচের সংবাদ দেয়াটাই ছিলো এক অস্বাভাবিক ব্যাপার।

সম্ভবত বাঙালি কর্মকর্তারা পরিদর্শনকারী পশ্চিম পাকিস্তানী দলটাকে, বিশেষ করে

www.pathagar.com

ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে কিছুটা নাটকীয় ভাষায় ও তাদের বর্ণনায় অত্যন্ত খারাপ কিছু হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন- অন্যদিকে তারা নিজেদেরকে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থক হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। বলেছেন তারা গোপানীয়তার সাথে স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায়। মেজর সফিউল্লাহর দাবি ছিল যে বাঙালি কর্মকর্তারা কোনো প্রকার শক্তি প্রয়োগ না করে সংকট নিরসন করতে পারতো। সেই কৃতিত্ব তাদের দেয়া হয়নি। কীভাবে তিনি জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন ও ব্যর্থ হয়েছিলেন সে ব্যাপারেও কোনো স্পষ্ট মন্তব্য নেই। তার আগের দিনও জনগণকে ব্যারিকেড স্থাপনের চেষ্টা করা থেকে বিরত করতে তারা চেষ্টা করেন ও ব্যর্থ হন। জনতা আওয়ামী লীগ কর্মীদের কথায়ও কান দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে জনতাকে ইতোপূর্বে উত্তেজিত করা হয়েছিল, অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়েছিল, আগত সামরিক যানগুলোকে আক্রমণ করা হয়েছিল এবং এমনকি বাঙালি সেনাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিনিয়ে নিয়েছিল জনতা।

প্রকৃতপক্ষে জয়দেবপুরের দুর্ঘটনাটি হচ্ছে সে সময় সমগ্র প্রদেশব্যাপী ঘটে চলা অকার্যকর কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার একটি প্রতিচ্ছবি। জনগণের অবস্থান ছিল উত্তেজনার শীর্ষে- যাদেরকে একদিকে সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্ররোচিত করছিলেন আবার তারাই ক্ষমতা নেয়ার জন্য অন্যদিকে সামরিক সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জড়ো হওয়া জনতা ছিল অস্ত্রসজ্জিত ও হিংস্র এবং তাদের সে পথ দেখিয়েছেন ওই নেতারাই। তারা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল জয়দেবপুরে বাঙালি সেনাদের অস্ত্র নিয়ে নেয়া হবে বলে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের ছড়ানো গুজবে। কিন্তু যখন গুজব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় তখন পরিস্থিতি তাদের উসকানিদাতা ও (পূর্ণমাত্রায় অস্ত্র সজ্জিত) বাঙালি রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সংঘর্ষে বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের সংখ্যা দশগুণ বাড়িয়ে প্রচার করে। এক ধরনের জাতীয়তাবাদী কল্পকাহিনী প্রচার করা হয় প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে। প্রচার করা হয় যে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনারা কোনো কারণ ছাড়াই নিরীহ ও নিরস্ত্র জনসাধারণকে গুলি করে হত্যা করেছে। শেখ মুজিব এ প্রচারণাকে কাজে লাগান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে চলমান সমঝোতায় দরকষাকষির ক্ষেত্রে তার অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৩

সেনা অভিযান

ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট'

'১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতটি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলংকিত রাত হিসেবে সাক্ষ্য দেবে।'

-আর্চার ব্লাড, মার্কিন কনসাল জেনারেল,[১] ঢাকা, (১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত)

'মি. প্রেসিডেন্ট, সেখানে তেমন বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় নেই, আপাতঃ দৃষ্টিতে ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন।'

-রিচার্ড নিক্সনকে হেনরি কিসিঞ্জার, ২৯ মার্চ ১৯৭১[২]

২৫-২৬ মার্চের রাতে পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে কোনো পরিস্থিতিতে এ নীতিকে সঠিক হিসেবে চিহ্নিত করা মোটেই যুক্তিসংগত বলা যাবে না এবং প্রমাণিত হয়েছে যে এটাই পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটির সর্বনাশ ডেকে আনে। একটি রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ থেকে ভারতের সাথে পুরাদমে যুদ্ধের মধ্যদিয়ে দেশটি ভেঙ্গে যায়; পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ নাম নিয়ে স্থান লাভ করে বিশ্বের মানচিত্রে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যার ক্ষত সারতে দীর্ঘ সময় লেগে যায় ও নতুন স্বাধীন দেশ-বাংলাদেশের অনেক বাঙালির মনে পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্রেক হয়।

কোন পরিস্থিতি সেনা অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল তা স্পষ্ট নয়। ২৫ মার্চের শেষ সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক আলোচনা চলছিল যখন হঠাৎ করে কাউকে না জানিয়ে অস্বাভাবিকভাবে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করে চলে যান। অনেকেই শেখ মুজিব ও তার আওয়ামী লীগকে আলোচনায় তাদের অনমনীয় অবস্থানে অনড় থাকার জন্য দায়ী করেন। আবার অন্যরা যাদের মাঝে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী উভয় পক্ষের লোকই রয়েছেন তারা দোষারোপ করে বলেন, সামরিক জান্তা আলোচনার ব্যাপারে আন্তরিক ছিল না বরং সে সময় তারা সামরিক ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষ্যে একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করছিল। জান্তা অভিযোগ করে যে, আওয়ামী লীগ নিজেই একটা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছিল। আবার অনেক বাঙালির মতে বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা শেখ মুজিবকে 'শুরুতেই আক্রমণ' করার জন্য আহ্বান

www.pathagar.com

জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে তাদের শান্ত করেন।[৩]

বিস্ময়ের উপাদান

হেনরী কিসিঞ্জার থেকে জানা যায়, পূর্ব পাকিস্তানের চরমপন্থী বাঙালি উগ্রবাদীরা ওই সেনা অভিযানে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। মোটের উপর শেখ মুজিব তখনও পর্যন্ত তার জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল উলা যিনি ২৬ মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পাক সেনাদের মানুষ হত্যাকাণ্ডের ছবি তুলেছিলেন তিনি লিখেছেন ২৫ মার্চ রাতে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যান এ সংবাদ পড়ে যে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে একটা আসন্ন সমঝোতা হতে যাচ্ছে।[৪] ২৬ মার্চ হোয়াইট হাউসের মিটিংয়ে কিসিঞ্জার বলেন 'আলোচনা ভেঙ্গে গেল কি কারণে সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই, অন্যদের মতো আমিও করার লক্ষ্যে হতবাক হয়েছি'।[৫]

সেনা অভিযানের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগকে হটিয়ে দেয়া, তাদের নেতাদের বন্দি করে উগ্রবাদীদের শায়েস্তা করা এবং পুলিশ ও বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করে, সংবাদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব পুন:প্রতিষ্ঠা করা। এর আগে লে. জে. সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের সময়ে যে কোনো অনিশ্চিত পরিস্থিতি মোকাবিলার লক্ষ্যে 'অপারেশন ব্লীৎজ' সাংকেতিক নামের একটি পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। তবে জেনারেল ইয়াকুব শেষ মুহূর্তে পদত্যাগ করেন ও গর্ভণর হিসেবে তার স্থলাভিসিক্ত হন জেনারেল টিক্কা খান। ঢাকায় ২৫ মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সামরিক অভিযান শুরু হয়। পাকিস্তানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের তৎকালীন সচিব জেনারেল গোলাম ওমরকে আমি জিজ্ঞেস করি- 'অপারেশন সার্চলাইট' ও 'অপারেশন ব্লীৎজ'- এর মধ্যে তফাৎ কি? তিনি জানান উভয়ের মধ্যে বস্তুগত কোনো তফাৎ ছিল না কেবল প্রথমটাতে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে সর্বাধিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যেখানে দ্বিতীয়টাতে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার জন্য যতোটুক সম্ভব কম শক্তি প্রয়োগের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।[৬] যাহোক, জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবের ব্যাখ্যা ছিল কিন্তু ভিন্ন রকম।

জেনারেল ইয়াকুব আমাকে বলেন, 'অপারেশন ব্লীৎজ' ছিল তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করার মতো একটি পরিকল্পনা। নির্বাচনের সময়ে যদি তেমন চরম বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হতো তা দমন করার জন্য কঠোর অভিযান চালানো যেতো সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী। যেমন সে সময় যদি বড় ধরনের কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো বা অকস্মাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হতো তাহলে ওই পরিকল্পনা প্রয়োগ করা হতো। তার দৃষ্টিতে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর আর ওই পরিকল্পনার কোনো প্রাসঙ্গিকতাই ছিল না।[৭]

বাংলাদেশী ও পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে দুর্ধর্ষ ও তীব্রদৃষ্টি সম্পন্ন জেনারেল হিসেবে চিহ্নিত জেনারেল ওমর ২৫-২৬ মার্চ রাতে ঢাকার সেনা অভিযানে খুব একটা বেশি ভূমিকা পালন করেননি। তার মতে তিনি কখনোই সেনা গোয়েন্দাতে ছিলেন না, কেবলমাত্র নতুন গঠিত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সচিব হিসেবে যোগদান করেছিলেন, যে নিরাপত্তা পরিষদ তখনও পর্যন্ত একটি কার্যকরী কমিটি হিসেবে আনুষ্ঠানিক কোনো বৈঠক করেনি। তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া দ্বারা গঠিত যৌথ 'কিচেন কেবিনেটের' বিষয়টিও অস্বীকার করেন যে

www.pathagar.com

কেবিনেটের একজন সদস্য হিসেবে তিনি সে সময়ে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিলন। তিনি অবশ্য জেনারেল ইয়াহিয়ার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং দাবি করেন যে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তিনি সারারাত ধরে মুজিবকে ইয়াহিয়ার কাছে এসে আলোচনার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু মুজিব তা করেননি। জেনারেল ওমর নিশ্চিত করেছেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন তবে ইয়াহিয়ার করাচী ফিরে আসার আগেই তিনি করাচী ফিরে যান।[৮]

জেনারেল ওমরের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান ছিল জেনারেল এ ও মিঠার যিনিও একজন দুর্ধর্ষ ও তীক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন জেনারেল হিসেবে জান্তার বিশ্বস্ত বলে বিবেচিত হতেন এবং সেনা অভিযানে নিজের বিশেষ ভূমিকা রাখতে তিনি যারপরনাই সচেষ্ট ছিলেন। জেনারেল মিঠাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এস এস জি (কমান্ডো বাহিনী)-এর কিংবদন্তীর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। মে. জে. হাকিম আরশাদ কোরেশীর বর্ণনা মতে মিঠাকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান সংকট নিরসনের উপায় বের করার লক্ষ্যে তার সফর সম্পর্কে ভিন্ন একটি কাহিনী সাজিয়ে বিশেষভাবে ঢাকায় ডেকে আনা হয়েছিল।[৯] জেনারেল মিঠা ছিলেন সোজাসাপ্টা সৈনিক এবং সৎ ও করিৎকর্মা ব্যক্তি হিসেবে তিনি সমস্যার সমাধান দিয়ে নিজের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করে গর্ববোধ করতেন।[১০]

অনেক বাংলাদেশী তার সম্পর্কে না জেনেই তার ব্যাপারে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। চট্টগ্রামে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের সাবেক কমান্ড্যান্ট ও বাঙালিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা (পূর্ব পাকিস্তানে) জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারও তার সম্পর্কে কুৎসা রটিয়েছেন, অথচ তিনি তার শুদ্ধ নামটি পর্যন্ত জানতেন না বরং তাকে সবসময় জেনারেল 'মিঠা খান' নামেই উল্লেখ করছিলেন।[১১] জেনারেল মিঠা সেনা কর্মকর্তা হিসেবে ছিলেন কঠোর নিয়ম নীতির অনুসারী এবং দুর্বৃত্ত ও আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের দমনের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট ও দৃঢ়। তিনি জাতিগত বা ধর্মীয় কুসংস্কার মানতেন না। বোম্বে নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন ও সেখানেই বড় হয়েছেন। জেনারেল মিঠা এরপর সেখানে প্রবাসী বাঙালি ইন্দু চ্যাটার্জীর প্রেমে পড়ে যান ও তাকে বিয়ে করেন।[১২] ইন্দু চ্যাটার্জি হয়ে যান ইন্দু মিঠা। এ ইন্দু মিঠা ছিলেন ভারত নাট্যমে পারদর্শী একজন নৃত্যশিল্পী ও প্রাণবন্ত এক মহিলা যিনি জেনারেল মিঠাকে বিয়ে করার পরও ধর্মান্তরিত হননি এবং কট্টর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সমর্থক জেনারেল জিয়াউল হকের শাসন আমলেও তার ক্লাসিক্যাল নাচ পাকিস্তানে চালু রেখেছিলেন। ১৯৬০ দশকে পূর্ব পাকিস্তানে কুমিল্লায় জেনারেল মিঠা তিন বছর কাটিয়েছেন। মিঠা লিখেছেন, সে সময় ঢাকার ১৪ ডিভিশনের জিওসি ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীতে কুসংস্কার ও পূর্ব পাকিস্তানীদের সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে কথাবার্তা বলা বরদাস্ত করতেন না। তিনি তাকে তার ব্রিগেডে এ ধরনের কোনো কিছু না ঘটার জন্য হুঁশিয়ার করে দিতেন। একদিন ক্লাবে দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা ওইরূপ আচরণ করলে জেনারেল মিঠা তাদের ক্লাব থেকে বের করে দেন ও ইয়াহিয়া পরদিনই তাদের অন্যত্র বদলির আদেশ দেন।[১৩]

পূর্ব পাকিস্তানের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটলে ১৯৭১ সালে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল হিসেবে কর্মরত জেনারেল মিঠাকে প্রথমবারের মতো আবার পূর্ব পাকিস্তানে ডাকা হয় ৭/৮ মার্চ তারিখে। সে সময় সেনানিবাসগুলোতে সকল প্রকার পণ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সড়ক ও রেলপথ ভ্রমণ হয়ে পড়েছিল বিপদজনক। মিঠা বার দিন ধরে সব সেনানিবাস পরিদর্শন করেন ও তাদের সমস্যা দূর করে দেন। ২৩ মার্চ পুনরায় তাকে

www.pathagar.com

ঢাকায় তলব করলে তিনি অবাক হয়ে যান ও ২৪ মার্চ ঢাকায় পৌঁছে জানতে পারেন পরদিন সেনা অভিযান শুরু হবে অর্থাৎ পরদিনই হচ্ছে- 'ডি- ডে'। লে. ক. মোহাম্মদ তাজ আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি ঢাকা অভিযানে সকল সেনা ইউনিটের সার্বিক দায়িত্বে থাকার পরও তাকে অপারেশনের ব্যাপারে জানানো হয়েছিল ২৪ মার্চ-এ। তিনি বলেন, ২৩ মার্চ সেনা অভিযানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[১৪]

জেনারেল মিঠা লিখেছেন "আমি ২৪/২৫ মার্চ রাত ও ২৫ মার্চ পুরোদিন ঢাকায় পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড হেডকোয়ার্টার- এ অতিবাহিত করি এবং সকল অভিযানই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছিল।[১৫] কিন্তু বাস্তবে কি অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছিল? মার্কিন লেখক সিসন ও রোজ উল্লেখ করেন, অভিযানটি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাত ব্যর্থ হয়, কারণ কেবলমাত্র শেখ মুজিবই প্রথম সুযোগে গ্রেফতার হন বাকী অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতরা পালিয়ে যান। বাঙালি পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ব্যাপক রক্তপাতের মাধ্যমে এবং অসংখ্য বাঙালি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায় ও পরবর্তীতে ওইসব অস্ত্রশস্ত্র পাক সেনাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়। সেনাবাহিনী অবশেষে পুরো প্রদেশ নিয়ন্ত্রণে আনে কিন্তু তাতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।[১৬]

ঢাকায় মার্কিন কনসাল আর্চার ব্লাডের নাম উল্লেখ করে হেনরি কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বলেন, 'ঢাকার কনাসালের স্নায়ু খুব একটা শক্ত নয়, তিনি দুর্বল চিত্তের মানুষ'। ব্লাড সংকটে হস্তক্ষেপ না করার মার্কিন নীতির বিরোধিতাকারী ছিলেন ও এ ব্যাপারে তার অপর বিশ জন সহকর্মী কর্তৃক 'ভিন্নমত পোষণ করে পাঠানো বার্তা'র সমর্থক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হেনরি কিসিঞ্জারের কথার প্রেক্ষিতে নিক্সন উল্লেখ করেন, দিল্লীতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত 'কিটিং-এরও স্নায়ুও শক্ত নয়'। অথচ 'তারা সবাই ঘটনার মধ্যে বসে আছে'।

এটা আশা করা যায় যে, যারা 'ঘটনার মাঝে বসে আছেন' ও যারা আছেন ঘটনা থেকে দূরে, ঘটনা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু যারা 'ঘটনার মধ্যে' অবস্থান করছিলেন তারাও কি একই ঘটনা একরকমভাবে দেখেছেন বা বর্ণনা করেছেন? রাশোমন'র বর্ণিত চাক্ষুষ সাক্ষী যারা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন, যারা অংশ নিয়েছেন, দেখেছেন ও যারা ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বেঁচে গিয়েছেন তারা একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন। এমনকি ১৯৭১ সালের ব্যাপারে 'রাশোমনে'র মতে মৃতদেরও অনেক কিছু বলার আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা

৮৮, ৯৯-এর জন্য। প্রথমদিকে জগন্নাথ ও ইকবাল হল থেকে প্রচুর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। বোঝা গেছে, এ পর্যন্ত শেষ (রজার সো ফার ওভার)।

-পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তাদের মাঝে বেতার যোগাযোগ, ঢাকা ২৫-২৬ মার্চ রাত ১৯৭১।[১৭]

আমার জীবনে এ প্রথম মানুষ হত্যা করা দেখি এবং আহতদেরও ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করা হয়েছিল।... ইতোমধ্যে দুটি দলকে আনা হল ও তাদের হত্যা করা হলো। অবশিষ্ট তিনটি হত্যাকাণ্ডকে ফিল্মে ধারণ করেছি।

-অধ্যাপক নূরুল উলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়[১৮]

www.pathagar.com

সামরিক অভিযানের ইতিহাসে একক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করলে ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছিল তাকে 'কলঙ্কিত এক রাত' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। 'বিদ্রোহী' একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ধূলিস্মাৎ করার জন্য জান্তা সে রাতে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল। এ ঘটনাকে বেশিরভাগ মানুষ সংঘাতকালের সবচেয়ে কালো অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন যা দীর্ঘকাল পর্যন্ত তৎকালীন সামরিক জান্তার জন্য কলংক বয়ে এনেছে। রাজধানী শহরের বুকে ঘটে যাওয়া এটি ছিল অন্যতম একটি ঘটনা যা সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় এবং যা নিয়ে খুব সামান্যই মতবিরোধ রয়েছে। আবার ১৯৭১-এর ঘটনাসমূহ এমনি যে ঘটনা নিয়ে যা মনে হয় হয়তো তার কোনো কিছুই আবার অবধারিত সত্য নয়।

এ অধ্যায়ে ২৫-২৬ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ঘটেছিল সে বিষয়ে সংঘর্ষে জড়িত উভয়পক্ষের প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণ বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ওই রাতে সেনাবাহিনীর অন্যান্য কর্মকাণ্ড যেমন পুলিশ লাইন, গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ কেন্দ্র ও টেলিভিশন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গ্রেফতার, বিচ্ছিন্নতাবাদ সমর্থক সংবাদপত্র অফিস সমূহের ধ্বংস সাধন এবং পরদিন পুরাতন ঢাকার অনেক এলাকা আক্রমণের মতো বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে।

সশস্ত্র উগ্রবাদী না নিরস্ত্র ছাত্র? ওই সময়ের মার্কিন দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ তথ্যানুযায়ী; '৩০ মার্চ মার্কিন কনসুলেট জেনারেল তার প্রতিবেদনে জানান যে, সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত নিরস্ত্র ছাত্রদের হত্যা করেছে'।[১৯] যা হোক, মার্কিন কনসাল আর্চার ব্লাড তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "ইকবাল হলের ছাত্ররা যাদের অনেকের কাছে অস্ত্র ছিল তাদেরকে হয়তো কক্ষেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছে অথবা তারা দলবদ্ধ হয়ে হলের বাইরে এলে তাদের কচুকাটা করা হয়"।[২০]

মোটকথা হলো যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র ছিল এবং সেখানে উভয় পক্ষেই গোলাগুলি করেছে এবং সেখানে অনেকেই নিখোঁজ হয়েছে যা ভারত ও বাংলাদেশে ব্যাপক প্রচারিত খবর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের হত্যা করার খবরগুলোই বিভিন্ন রিপোর্ট ও সংবাদে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। খবরটি এভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, সেনা অভিযানে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজন ব্যাপকভাবে নিহত হয়েছে যাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে সামরিক জান্তা পছন্দ করতে পারেনি।

পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলোতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থকরা প্রকাশ্যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে তাদের শক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আসছিল। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এ অবজ্ঞা প্রদর্শনের কেন্দ্র। মার্চ মাসের শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিক কার্যক্রম না থাকায় প্রদেশটির অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ফিরে যায় তাদের বাড়িতে। অসংখ্য সংবাদ মাধ্যম ও বাঙালি স্বদেশভক্তদের স্মৃতিচারণে বের হয়ে আসে স্তূপিকৃত অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ, মার্শাল প্যারেড, সহিংসতার উস্কানি, বিশেষ শ্লোগান-"বীরবাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"-এমন অনেক বিষয়। তাই একটি ভিন্ন কিন্তু একইরূপ 'দেশপ্রেমিক' বাঙালি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর বর্ণনা এমন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে-যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সশস্ত্র উগ্রবাদীদের সম্পর্কে বলা হতো তারা তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী একটি শক্তির বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ শুরু করে

www.pathagar.com

কিন্তু করুণভাবে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের শহীদ হতে হয়েছে। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বর্ণনা দু'টি সম্ভাব্য কাহিনী সূত্র থেকে দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয় দিয়েছে যেখানে তারা 'বীরত্বের' বিষয়টিকে বাদ দিয়েছে 'নিপীড়নের শিকার' হওয়ার পক্ষে।

যেমন এ ঘটনার কিছুকাল পরেই সাইমন ড্রিং *সানডে টেলিগ্রাফে* লিখেছেন:

'সেনা অভিযানের একমাস পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থক কর্মীরা জোর গলায় বড় বড় বক্তৃতা বিবৃতি দিলেও প্রকৃতপক্ষে সামরিক অভিযানের বিপক্ষে তাদের কোনো প্রস্তুতিই ছিল না। আওয়ামী লীগ চিৎকার, হৈ চৈ করে বিক্ষিপ্তভাবে রাস্তায় তাদের মিছিল প্রদর্শন করলেও তারা সুসংগঠিত ছিল না, ছিল না তাদের কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্র এবং যার ফলে সেনাবাহিনীর এ্যাকশন প্রমাণ করেছে যে ঢাকায় লড়াই করার মতো তাদের কোনো অবস্থানই ছিল না। মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করার ঘোষণা দিলেও তাদের হাতে ১৯৩৯-৪৫ সালের যুদ্ধে ব্যবহৃত কয়েকটি অতি পুরনো রাইফেল, পুরনো পিস্তল ও হাতে তৈরি বোমা ছিল যা ২৫ মার্চ রাতে সেনাদের মোকাবিলায় কোনো কাজেই আসেনি। যখন গুলিবর্ষণ শুরু হয় তখন সকল চিৎকার, উচ্চবাচ্য, পাকিস্তান সরকারের সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়।'[২১]

যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের 'যুদ্ধ করার মতো কোনো প্রকৃত ইচ্ছা' লোপ পায় তখন তাদের মাঝে চলতি সংগ্রামে 'বীরত্বের' বর্ণনাও হারিয়ে যায় ও সেখানে 'খলনায়ক বনাম নিপীড়নের শিকার' জাতীয় কথকতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। বাস্তবতা হচ্ছে এতো কিছুর পরেও অস্ত্রশক্তিতে যতোই অসামঞ্জস্যতা থাকুক না কেন সেখানে অস্ত্র ছিল, বিদ্রোহীদের ছিল প্রশিক্ষণ এবং কয়েকজন বাঙালি সীমিত অস্ত্র নিয়ে ঠিকই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিপক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছিল। 'নিপীড়নের শিকার' তত্ত্বগুলো ওইসব সাহসী ছাত্রদের রুখে দাঁড়ানোকে সামগ্রিকভাবে অবমাননা করেছে ও ঘটনা সম্পর্কে চাক্ষুষ সাক্ষীদের বর্ণনাগুলোকেও করেছে বিতর্কিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রাবাস জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া বামপন্থী কর্মী কালীরঞ্জন শীল লিখেছেন যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেয়ার পরই 'ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়ামে নকল রাইফেল নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করে দেয়.... এবং আমিও ওই প্রশিক্ষণে একটি দলে অংশগ্রহণ করি। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের প্রথম দলটির প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয় ও ছাত্রীদের অনুরূপ একটি দলের প্রশিক্ষণ শেষ হলে উভয় দলই রাস্তায় একটি মার্চপাস্টে অংশগ্রহণ করে।' আর ছাত্রীদের হাতে রাইফেলসহ মার্চপাস্টের ছবি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে ছাপা হয় যা বর্তমানে ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে গর্বের সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে।

'আমরা যারা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলাম এরপর ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ শুরু করি। রাইফেল প্রশিক্ষণের পর ছাত্র নেতারা যুদ্ধে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতেন।...এদিকে ৭ মার্চের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্র সংখ্যা কমতে শুরু করে। ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমন্যাসিয়াম মাঠে স্বাভাবিকভাবেই প্রশিক্ষণ চলেছে'।[২২]

কালীরঞ্জন শীল প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র 'নকল রাইফেল' নিয়ে প্রশিক্ষণের কথা উল্লেখ করলেও তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের লক্ষ্যে পুরো মার্চ মাসে গৃহীত পূর্ণ প্রস্তুতিরও বর্ণনা দিয়েছেন। এরপরও তিনি একই বিবৃতিতে সেনা অভিযানকে 'নিরস্ত্র' ছাত্রদের উপর 'পাক বর্বর নরপিশাচদের' আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন। একদিকে যুদ্ধ শুরুর জন্য প্রশিক্ষণ নিলেও পাক সেনারা যখন সত্যিকারের আক্রমণ করলো তখন তিনি হতবাক হয়েছেন, এমনকি অপমানিত বোধ করেছেন!

www.pathagar.com

শীল আরো নিশ্চিত করে বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই তাদের হল ছেড়ে চলে যায় ও বাইরের লোকজন এসে প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। তাদের কেউ কেউ হয়তোবা ছাত্র ছিল কিন্তু তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল না। একইভাবে নজরুল ইসলামও লিখেছেন, তার আর্ট কলেজের ছাত্ররা হোস্টেল খালি করে নিজ নিজ গ্রামে চলে গিয়েছিল। ছাত্র না থাকায় হোস্টেলের ডাইনিং হল ছিল বন্ধ। তাই তিনি বাইরে রেষ্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করতেন। ওই বিশেষ রাতে তার এক বন্ধু ঢাকায় চাকরির সন্ধানে এসে তার সাথে হোস্টেলে থাকতে চেয়েছিল।[২৩] আসলে মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উগ্রপন্থী ছাত্র বা অছাত্রদের ক্রমাগত আগমন ঘটছিল যা পরবর্তীতে কতোজন বা কারা নিহত হয়েছে এ অপারেশন সার্চ লাইটে তার ব্যাখ্যা দেয়াতে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নিহত হয়েছেন সে বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

দু'পক্ষের যুদ্ধ না এক পক্ষের হত্যাযজ্ঞ? জেনারেল মিঠা লিখেছেন, 'যা আমাকে বলা হয়েছিল ও এতে সন্দেহের কোনো কারণও ছিল না যে উগ্রপন্থী মুসলমান ছাত্ররা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নিয়েছিল এবং লড়াই করার পূর্ণ মানসিকতা নিয়েই তারা প্রস্তুতি নেয় ও লড়াই করে যায়। কিন্তু সেনাবাহিনী তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে ও সেখানে অনেকেই নিহত হয়।'[২৪]

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, কিন্তু ওই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তা ছিল এক তরফা হত্যাযজ্ঞ । আবার এটা নির্ভর করে সংঘর্ষ কোথায় ও কখন হয়েছিল? উভয়পক্ষই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল দু'টি প্রধান স্থানকে কেন্দ্র করে, একটি ছিল হিন্দু ছাত্রদের হোস্টেল জগন্নাথ হল ও অপরটি ইকবাল হল। উভয় হলেই প্রতিরোধ ভেঙ্গে যাবার পর হলের নিরস্ত্র লোকদের উপর ও হল সংলগ্ন শিক্ষকদের এপার্টম্যান্ট সমূহে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়।

২৫ মার্চের সকালে জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত 'আসন্ন সমঝোতা' সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলো নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শহীদ মিনারে লাগাতার মিছিলের আগমন তাঁর কাছে সমঝোতার ভাষা বলে মনে হচ্ছিল না। ওই মিছিলে সে সময়ের বহুল প্রচারিত শ্লোগান ছিল "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর।"

জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ছিলেন ইংরেজীর একজন খ্যাতিমান অধ্যাপক। জন্মস্থান ময়মনসিংহে ও বেড়ে উঠেছেন সেখানেই। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তার সময়ের অনেকের মতোই তাঁরও নাগরিকত্ব জন্মকালীন ছিল বৃটিশ ভারত। স্কুলে অষ্টম গ্রেডে পড়াকালীন তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু যিনি পরবর্তীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন তাঁর ময়মনসিংহ সফরকালে অভ্যর্থনা জানাতে নিজে একটি কবিতা লেখেন ও তা আবৃত্তি করেন। ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের আবাসিক হল জগন্নাথ হলের "প্রভোষ্ট ছিলেন এ হিন্দু শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা।" জগন্নাথ হলের অপর পারে একটি তিন তলা ফ্যাকাল্টি এ্যাপার্টম্যান্ট বিল্ডিংয়ের নীচ তলায় অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতার পরিবার বসবাস করতেন। তার সহধর্মীনি বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিয়ে বলেন, তার স্বামীর বদ্ধ ধারণা ছিল যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলে তিনি গ্রেফতার হবেন, তারপরও তিনি জগন্নাথ হলের প্রভোষ্টের পদ

www.pathagar.com

ছাড়তে রাজি ছিলেন না ও অন্যদের পরামর্শ অনুযায়ী নিরাপদ কোনো স্থানে যেতেও রাজি হননি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ১৯৫০ দশকে ভাষা শহীদদের স্মরণে স্থাপিত শহীদ মিনার অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতার বাসার খুব কাছেই। চা পানের বিরতিতে বিল্ডিং-এর নীচ তলায় অধ্যাপক আনিসুর রহমানের ফ্ল্যাট থেকে ভেসে আসছিল একটি নতুন বাংলা গানের কোরাস "আমরা বীর বাঙালি"। ছাত্রদের হলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কীভাবে প্যারেড করতে হয় তা শিখাচ্ছিল ছাত্ররা। অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতা তার একজন স্টাফ রামবিহারী দাসকে ঠাট্টা করে বলছিলেন যে, অবশেষে তার পুরানো পেটের ব্যথা সেরে যাবে। অত:পর তিনি শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিলেন যেন তারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে চলে যায় এবং তাদের যারা ২৩ মার্চ সেখানে এসেছিল তাদের তিনি তিরস্কার করেন।[২৫]

রাত প্রায় ১০.৩০ মিনিটে শহীদ মিনার, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জগন্নাথ হল ও কলা ভবনের চৌরাস্তায় প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা যায়। যুবকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে রাস্তায় পানির ট্যাংক ও বট গাছের ডালপালা দিয়ে ব্যারিকেড তৈরিতে। অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতা তাদের এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা জবাব দেয় যে তাদের এরকম করা ও প্রতিটি গাড়ি তলাশির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তারা বেশ দেরি করে ফেলেছিল, ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সরওয়ার, সাদা পোশাকে স্পেশাল কমান্ডো অফিসার ক্যাপ্টেন বেলাল ও ব্যাটালিয়ান হাবিলদার মেজর, নায়েব সুবেদার ইয়াকুবসহ ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রেকি করে আসেন[২৬] (যিনি ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন)।

ঢাকায় সেনা অভিযানে যে বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তারা অভিযান শুরু করে ২৫ মার্চের মধ্য রাতে আর অভিযানটি সামগ্রিকভাবে পরিচালিত হয় ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবের ৫৭ ব্রিগেড দ্বারা। এ ব্রিগেডের অধীনে ছিল ১৮ ও ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী ও জয়দেবপুরে অবস্থানরত ২ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট (২ইবিআর)। সেনা অভিযানের ঠিক পূর্বে ২ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. ক. মাসুদকে বদলি করে অপর বাঙালি অফিসার রকিবকে যিনি ২১ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন তাকে সে পদে বসানো হয়েছিল। ২৫ মার্চের রাতে লে. ক. (পরে ব্রিগেডিয়ার) মুহাম্মদ তাজ যিনি ২৮ পাঞ্জাবের কমান্ডে ছিলেন তিনি ২১ পাঞ্জাবেরও অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং সার্বিকভাবে তিনটি ইউনিটেরই দায়িত্বে ছিলেন। ৩২ পাঞ্জাবের দায়িত্ব ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ স্টেশন ও প্রেসিডেন্ট হাউসের নিয়ন্ত্রণ নেয়া। লে. ক. বাশারত সুলতানের কমান্ডে ১৮ পাঞ্জাবের দায়িত্ব ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টেলিভিশন স্টেশন ও পুরানো ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত শাঁখারিপট্টি এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়া এবং ট্যাংকের পাহারা বসিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল রক্ষা করা।[২৭]

ঢাকায় 'সেকেন্ড ক্যাপিটাল' হিসেবে পরিচিত এলাকায় ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। মার্চের প্রথম দিকে ব্রিগেড মেজর জাফর খান, মেজর খালেদ মোশাররফের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিতে ঢাকা পৌঁছেন।[২৮] কুর্মিটোলায় ইষ্টার্ণ কমান্ড হেড কোয়ার্টারে ছিলেন জেনারেল টিক্কা খান। প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কমান্ডাররা স্থান পরিবর্তন করছিলেন। অভিযান পরিচালনার জন্য ১৮ পাঞ্জাব তাদের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে

www.pathagar.com

রেসকোর্সে যেখানে প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন সরওয়ার ও ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার রফি মুনির ছিলেন। ব্যাটালিয়ানের 'এ' কোম্পানি রিজার্ভ হিসেবে ছিল মেজর মদদ হোসেন শাহের[২৯]-এর অধীনে ব্যাটালিয়ান হেড কোয়ার্টারে। 'বি' কোম্পানী ছিল ক্যাপ্টেন আওলাদ হোসেন নখভি'র অধীনে সদরঘাটে।'সি' কোম্পানী মেজর জামিল মাসুদের অধীনে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পাহারায় ছিল এবং 'ডি' কোম্পানী ক্যাপ্টেন সালেহ হাসান মির্জার নেতৃত্বে নিয়োজিত ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাঁখারিপট্টি অভিযানে।[৩০]

অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হলে ১৮ পাঞ্জাবের লে. মোহাম্মদ আলী শাহের দায়িত্ব ছিল এক প্লাটুন সৈনিক নিয়ে চলমান ট্যাংকগুলোকে কাছে থেকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া।[৩১] ২৫ মার্চ সকালে তাকে জানানো হয় রাতে সেনা অভিযান শুরু হবে এবং তাকে তিনটি শ্যাফে ট্যাংক (যা কয়েকদিন আগে নিয়ে আসা হয়েছিল) ও মর্টার প্লাটুন নিয়ে সকলের শেষে সেনানিবাস ত্যাগ করতে হবে। শাহ ওই রাতে ট্যাংক নিয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে ঢাকার সড়কে এগিয়ে যান এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পৌঁছলে দিনের আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে তার যাত্রা শেষ হয়।

তাদের যাওয়ার পথে ছিল বড় গাছের গুড়ি দিয়ে সড়ক অবরোধ করাসহ নানা ধরনের ব্যারিকেড সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা যা তারা রাস্তার পাশে সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর বিশ্ববিদ্যালয় ও ধানমন্ডি এলাকা থেকে গুলির শব্দ তাদের কানে আসছিল। যাত্রাপথে তারা এখানে-সেখানে বেশ কয়েকটি মৃহদেহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখতে পান যা কোনোভাবেই ২০ থেকে ২৫টির বেশি ছিল না।[৩২] তিনি কখনোই চিন্তা করেননি যে তাদের রাতের ওই অভিযান কতোটা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে যাচ্ছে। লে. শাহের মতে ওই রাতে সারা ঢাকাতে এ তিনটা মাত্র ট্যাংকই অভিযানে অংশ নিয়েছিল এবং তা শুধুমাত্র আতংক সৃষ্টি করার জন্য বা শক্তি প্রদর্শন করার জন্য। তিনি জানান ট্যাংকের প্রধান কামান ওই রাতে কখনোই ব্যবহার করা হয়নি, কেবলমাত্র ট্যাংকের পাশের ছোট মেশিনগান থেকে মাঝে মাঝে গোলা ছোঁড়া হয়েছিল শুধুমাত্র শব্দ সৃষ্টি করার জন্য। ট্যাংক ও ট্যাংকের সাথের সৈনিকরা প্রধান সড়কে আড়াআড়িভাবে অবস্থান নিয়েছিল তাদের যাত্রাকালে। তারা কোনো জনবসতিপূর্ণ এলাকা, যেমন নিউ মার্কেট বা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যায়নি।

ছাত্রাবাসে 'সার্চ লাইট': সে সময়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র রবীন্দ্র মোহান দাস যিনি জগন্নাথ হলের সামনের মাঠের কোণায় অবস্থিত স্টাফ কোয়ার্টারে থাকতেন তিনি জানান, হলের ছাদের দিকে তীব্র লাইটের আলো পড়ছিল আর প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছিল।[৩৩] রবীন্দ্র মোহন ছিল আগেই উল্লেখিত রামবিহারী দাসের ছেলে যে প্রভোষ্ট অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার অফিসে চাকরি করতো।

বাসন্তি গুহ ঠাকুরতা লিখছেন, 'আমি প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বা একটার সময় গুলির শব্দে জেগে উঠি। ভাবছিলাম যুদ্ধ কি শুরু হয়ে গেছে? আমার স্বামী বললেন- ও কিছু না, ছাত্ররা প্রাকটিস করছে মাত্র'।[৩৪] শব্দটা ক্রমশ: কাছে এগিয়ে আসে, শীঘ্র তীব্র আলোর সাথে সাথে কান ফাটানো শব্দের মতো হয়ে যায়। ভূমিকম্পের ন্যায় কেঁপে উঠে বাড়িঘর। এ অবস্থায় অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতা পরিবারের সবাই আশ্রয় নেন চৌকির নীচে।

জগন্নাথ হলের অপর দিকে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির কোয়ার্টারের চতুর্থ তলায় বসবাসকারী অধ্যাপক নূরুল উলা লিখেছেন,'মধ্যরাতে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। শীঘ্র শুরু হলো বিরতিহীনভাবে বুলেট ও মর্টার শেলের শব্দ'। কিছুক্ষণ পরই জগন্নাথ

www.pathagar.com

হলের বেশ কিছু কক্ষ আগুনে জ্বলে উঠতে দেখলেন অধ্যাপক নূরুল উলা। আরো দেখলেন টর্চলাইট নিয়ে ঘর থেকে ঘরে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।[৩৫]

কালীরঞ্জন শীল যিনি 'যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ' নিয়েছিলেন তিনিও লিখেছেন যে প্রচণ্ড শব্দে তিনি জেগে যান এবং এমন গুলির শব্দে তার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠে যা তিনি জীবনে কখনোই শোনেননি। আর অবশ্যই শীল সেনাদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে যাননি। তিনি বাথরুমের জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে তৃতীয় তলার কার্নিশে এসে পড়েন, সেখানে চিৎ হয়ে শুয়ে কাটিয়ে দেন সারারাত। শীলের দেয়া বর্ণনানুযায়ী হলের কেউই সেনাদের সাথে ওই রাতে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি। শীল লিখেছেন, তিনি জগন্নাথ হলের বিভিন্ন অংশ আগুনে পুড়তে দেখেছেন আর টর্চলাইটের আলোয় হলের বিভিন্ন তালা ও কক্ষ তল্লাশি চালাতে দেখেছেন। এক সময় সৈনিকরা হলের গেটম্যান প্রীয়নাথকে ডেকে হলের প্রধান গেট খুলে দিতে বলে এবং ঠিক সেই সময় কাউকে যেন গুলি করা হয় হলের দেয়ালের বিপরীত দিকে যেখানে শীল উপরের তলার কার্নিশে শুয়েছিলেন।[৩৬]

দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধের প্রমাণ জানা যায় এক অপ্রত্যাশিত উৎসের মাধ্যমে। সে রাতে সেনা অভিযান চলাকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি [৩৭] সম্পর্কে আর্মি কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে ব্রিগেড কমান্ডার যে প্রশ্ন করেন সে রেকর্ডকৃত বিবরণ থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে নিম্নরূপ:

'৯৯ , ৮৮-এর জন্য। *(ক্যাপ্টেন সফিক এ কে নিয়াজী যিনি ব্রিগেড কমান্ডার ৫৭ ব্রিগেড-ব্রিগেডিয়ার আরব্যাবের সাথে অবস্থান করছিলেন তার কণ্ঠ)* সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক জানতে চাচ্ছেন যে জগন্নাথ, ইকবাল ও লিয়াকত হল থেকে কি ধরনের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ওভার।'

'৮৮,৯৯-এর জন্য।*(লে. ক. বাশারত সুলতান কমান্ডিং অফিসার ১৮ পাঞ্জাব)* প্রথম দিকে জগন্নাথ ও ইকবাল হল থেকে অসংখ্য গুলির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এ পর্যন্ত বুঝেছি ও ওভার।'

আরও বিস্তারিত জানতে চেয়ে মেসেজ পাঠানো হয় যা ছিল নিম্নরূপ:

'৯৯ , ৮৮-এর জন্য। *(ক্যাপ্টেন সফিক এ কে নিয়াজী)* অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানান যে সেখানে বিপরীত দিক থেকে কোনো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও গ্রেনেড ইত্যাদি ব্যবহার করেছে কিনা। ওভার।'

'...৯৯।*(লে. ক. বাশারত সুলতান)* ০.৩০৩ এর প্রচুর গুলিবর্ষণ করেছে। আমরা কোনো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র বা গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাইনি। ওভার।'

ওই যুদ্ধের ব্যাপকতা সম্পর্কে মাঠে উপস্থিত কমান্ডার বা অধিনায়ক সংক্ষেপে যা বলেন তা হলো:

'৮৮। যখন আমরা রোমিও দিয়ে গোলাবর্ষণ শুরু করি তারপর থেকে আর কোন গুলির শব্দ পাইনি। তবে আমরা ক'জনকে শেষ করেছি।' (এখানে রোমিও অর্থ হতে পারে রকেট লাঞ্চার)।

৩২ পাঞ্জাব- এর কমান্ডিং অফিসার লে. ক. (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) মোহাম্মদ তাজ

www.pathagar.com

জানান, তিনি সে রাতে সার্বিকভাবে দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি একমত হন যে ইকবাল ও জগন্নাথ হলে গোলাগুলি হয়েছিল এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল জগন্নাথ হলে। ব্রিগেড মেজর জাফর খান যিনি ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে যোগাযোগ সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তিনি আমাকে জানিয়েছেন জগন্নাথ হলে অবস্থানকারীদের আত্মসমর্পণ করার জন্য মেগা ফোনের মাধ্যমে আহ্বান জানানো হয়েছিল-বাঙালিরা কোথাও আত্মসমর্পণের আহ্বানের কথা উল্লেখ করেনি।[৩৮] মেজর (ব্রিগেডিয়ার) জাফর বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণে আনতে তিন ঘন্টা সময় লেগেছিল যার মধ্যে জগন্নাথ হলই লেগে যায় দীর্ঘ সময়।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের হল 'রোকেয়া হল'কে টার্গেট করে ওই সেনা অভিযানে পাকিস্তানী সেনা কর্তকর্তাদের জড়িত থাকার কথা কোনো বাঙালি প্রত্যক্ষদর্শী, পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তাদের জবানবন্দী বা রেকর্ডকৃত কোনো রেডিও বার্তা থেকে পাওয়া যায়নি। তারপরও এনিয়ে ১৯৭১ সালে একটি গল্প ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। পাক সেনাদের রোকেয়া হল আক্রমণ ও সেখানকার মেয়েদের জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বের হওয়ার কথা আমাকে বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সদস্যরা একাধিকবার শুনিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য হোস্টেলের ন্যায় রোকেয়া হলও ২৫ মার্চের আগেই খালি হয়ে গিয়েছিল এবং এ হলকে সেনাদের লক্ষ্যস্থল বলে মনেও হয়নি। একইভাবে জাহানারা ইমামের বইয়ে মহসিন হলের যে আতংকিত ছাত্রের কাহিনী সংযুক্ত আছে সেখানেও সেনাবাহিনী যায়নি।[৩৯] যা হোক, রোকেয়া হলের তৎকালীন প্রভোষ্ট বেগম আখতার ইমাম পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে বর্ণনা করেছেন কীভাবে পাকিস্তানী সেনারা তার নিজের বাংলোর গেট ভেঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও ছাত্রীদের খুঁজছিল, যারা এর আগে অংশ নিয়েছিল সশস্ত্র মার্চপাস্টে।[৪০] বেগম আখতার ইমামের মতে, রোকেয়া হলের ছাত্রী ধারণ ক্ষমতা ছিল প্রায় আটশ। রাজনৈতিক পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলে ছাত্রীরা হল ত্যাগ করতে শুরু করে এবং ২৫ মার্চ ১৯৭১ এ হলে মাত্র সাতজন ছাত্রী ছিল। ওই রাতে সামরিক বাহিনী দ্বারা ছাত্রী নিবাস আক্রান্ত হলে প্রভোষ্ট জেগে ওঠেন ও ওই সাতজন ছাত্রী হলের হাউজ টিউটর সাহেরা খাতুনের বাসভবনে চলে যায়। সাতজন ছাত্রীই নিরাপদে ছিল এবং ২৭ মার্চ সান্ধ্য আইন তুলে নিলে তারা তাদের অভিভাবকদের সাথে হল ত্যাগ করে।

প্রভোষ্ট ইমাম লিখেছেন, ওই রাতে পাক সেনারা তার বাসায় দু'দফায় অনুপ্রবেশ করে। প্রথমবার সৈনিকরা গেট, দরজা ও জানালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে বেয়নেটের মুখে প্রভোষ্ট ইমামের কাছে জানতে চায় হলের লোকজন কোথায়? হল সুপারিনটেন্ড্যান্ট জাহানারা, হাউজ টিউটর সাহেরা খাতুন এবং হলের কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা কর্মচারী সে সময় প্রভোষ্ট ইমামের বাসায় ছিলেন। প্রভোষ্ট সৈনিকদের কাছে পুরুষ গেটম্যান ও চাপরাশীদের কর্মচারী ও গরীব মানুষ উল্লেখ করে এদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ঠিক তখনই একজন সেনা কর্মকর্তা ওই স্থানে উদয় হয়ে সৈনিকদের মহিলাদের সাথে খারাপ আচরণ বা ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ না করতে হুকুম দিয়ে ওদের নিয়ে চলে যান। সৈনিকরা রাগে রাইফেলের বাট দিয়ে তাদের আঘাত করে এবং স্থান ত্যাগ করে।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই হাজির হয় সৈনিকদের দ্বিতীয় দলটি। তারা প্রত্যেককে বাসার বাইরে লাইনে দাঁড় করিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদের সন্ধানে পুরো বাসা তছনছ করে। মিসেস ইমাম তার একটি চাপরাশীকে বাঁচাতে দু'দফায় লাইন থেকে বের হয়ে আসেন। সৈনিকদের সাথের সেনা কর্মকর্তাটি বিশ্বাসই করতে চাইছিলেন না যে এ বেগম আকতার ইমাম হলের প্রভোষ্ট। অফিসারটি জানতে চাইছিলেন বিগত সপ্তাহগুলোতে যে ছাত্রীরা সামরিক প্রশিক্ষণ

www.pathagar.com

নিয়েছে তারা কোথায়, হলের অস্ত্রশস্ত্র কোথায় রাখা হয়েছে এবং লাইনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সকলে মুসলমান কিনা?

মিসেস ইমাম তাকে বললেন যে, সকল ছাত্রীই হল ত্যাগ করে চলে গেছে, হলে কোনো গোলাবারুদ বা অস্ত্র নেই এবং লাইনে দাঁড়ানো সকলেই মুসলমান। কিন্তু অফিসারটি হুমকির সুরে কথা বলেন, গালিগালাজ করেন এবং দু'দফাতেই সৈনিকরা বাসায় লুটতরাজ চালিয়েছে।[৪১]

১৮ পাঞ্জাবের ক্যাপ্টেন সারওয়ার রাতটা শুরু করেছিলেন একটা এলোমেলো ঘটনার বর্ণনা দিয়ে; যখন তিনি দেখলেন যে তাদের সেনারা রেসকোর্সের কাছে একটা ছোট ঘরে কয়েকজন লোককে গুলি করে হত্যা করেছে উগ্রবাদী স্বাধীনতাকামী সন্দেহে। এভাবে রাতে ঘুরতে ঘুরতে এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেন সারওয়ার শহীদ মিনারের কাছে আসেন যা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তিনি সেখানে কয়েকজন বিদ্রোহীর মৃতদেহ দেখলেন। অকস্মাৎ কেউ একজন পিস্তল হাতে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লে ক্যাপ্টেন সারওয়ার তার পিছনে ধাওয়া করেন, তারপর রাস্তা পার হয়ে এক কানা গলি পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে একটি পরিত্যক্ত বাথরুমে তাকে গুলি করে হত্যা করেন।[৪২] এদিকে শহীদ মিনার ধ্বংস করতে বেশ সময় লেগেছিল। বর্বরদের দ্বারা অহেতুক এ সুন্দর স্থাপনাটির ধ্বংস সাধন বাঙালিদের ক্রোধ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেনা অভিযানে ১৯৫০- এর দশকের ভাষা আন্দোলনের শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ ধ্বংস করার কোনো যুক্তিই ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে বাঙালি ছাত্রদের প্রতিরোধের ক্ষমতা সম্পর্কে সেনা কর্তৃপক্ষের প্রত্যেকে বিশেষ কোনো ধারণা করতে বা বুঝতে পারেননি। লে. (পরবর্তীতে কর্ণেল) মোহাম্মদ আলী শাহ- এর মতে সেনা অভিযান শুরু হওয়ার প্রথম দুই তিন দিন বাঙালি রা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল ঠিকই তবে গোলাগুলি ও সংখ্যার বিচারে বাঙালিদের প্রতিরোধের বিষয়টি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয়েছিল। অপরদিকে সেনাবাহিনীর মঝে বিরাজ করছিল দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হওয়ার মতো পরিবেশ। অবশ্য গোলাবারুদ খরচের পরিমাণ নিয়ে যে রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছিল তা ছিল ব্যাখ্যাতিতভাবে বেশি। অভিযানের প্রথম দুই তিন দিনে ব্যাটালিয়ানের 'ডি' কোম্পানীর দু'জন নিহত হয় ও পাঁচজন আহত হয়। যা হোক লে. (কর্ণেল) শাহ বিপুল পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের কথা নিশ্চিত করেছেন। তার হিসেবে দুই ওয়াগান ভর্তি প্রায় তিনশো প্রকার অস্ত্র উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের বন্দুক, ছোরা, তলোয়ার, রক্তমাখা তলোয়ার-ইত্যাদি যা কিছু সবই উদ্ধার করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। লে. ক. (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) মোহাম্মদ তাজ আমাকে জানান যে, সে সময় ছাত্রদের হল থেকে ভারতের তৈরি রাইফেলও উদ্ধার করা হয়েছে।

মনে হয় সে সময় প্রকৃত অর্থে লড়াই করে হাতে গোনা ক'জন বাঙালি। অদ্ভুত ব্যাপার যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বলেছে জগন্নাথ হল ও ইকবাল হল থেকে প্রতিরোধ এসেছিল এবং তারা ০.৩০৩ রাইফেল নিয়েই শক্তিশালী পাক সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ও অনেকে নিহতও হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশী পক্ষের দেয়া তথ্যানুযায়ী হয় ছাত্ররা ঘুমিয়ে ছিল, কিছুই করছিল না অথবা যে 'বীর বাঙালিরা' প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, মার্চপাস্ট করে যুদ্ধ আর সংগ্রামের বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিল বাস্তবে তাদের সামনে যখন লড়াইয়ের ক্ষণ এলো তখন 'কারো মাঝেই লড়াইয়ের কোনো ইচ্ছে জাগেনি'!

www.pathagar.com

কোনো যুদ্ধবন্দী নেয়া হয়নিঃ জগন্নাথ হল

মাঠের পশ্চিম দিকে যেখানে জগন্নাথ হলের প্রধান ডরমিটরি অবস্থিত সেখানে হঠাৎ করেই প্রায় বিশ জন পাক সেনা হাজির হলো দু'জন আহত ছাত্রকে সাথে নিয়ে। সেনারা ছাত্র দু'জনকে বেশ যত্নের সাথে নিজেদের কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে এসে দু'টি চাটাই-এর পাশে বসতে দিল যা দেখে মনে হয়েছিল তারা তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাবে। একটু পরই তারা চাটাই দুটো টেনে নিলে আমি দেখতে পেলাম ওই চাটাই-এর নিচে বেশ ক'টি মৃতদেহ ঢাকা পড়ে আছে। আহত দু'জন বসেছিল পূর্বদিকে মুখ করে আর সেনারা ছিল তাদের পিছনে। দু'জন সৈনিক আরও পূর্ব দিকে সরে গিয়ে ছাত্র দু'জনের মুখোমুখি হলো এবং তাদের রাইফেল বাঁকাভাবে রাখলো কিছুক্ষণের জন্য। আমি দেখলাম ছাত্র দু'টি হাত প্রসারিত করে ওই সৈনিক দু'জনের কাছে অনুনয় বিনয় করছে। এরপরই গুলি করা হলো তাদের।[৪৩]

উপরের এ ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন অধ্যাপক নূরুল উলা। তিনি মাঠের বিপরীত দিকে রাস্তার অপর পাড়ে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং-এর চতুর্থ তলার জানালা দিয়ে এ দৃশ্যটি অবলোকন করেন। যদিও বর্তমানে ওই ক্যাম্পাসে অনেক নতুন অবকাঠামো তৈরি হয়েছে তারপরও আমি ওই স্থানটি পরিদর্শন করে নিশ্চিত হয়েছি যে অধ্যাপক নূরুল উলা'র বর্ণনানুযায়ী তার ওই চতুর্থ তলা থেকে ঘটনার সময় স্থানটি স্পষ্ট দেখা যেত।
এরপর পশ্চিম দিক থেকে সৈনিকরা কয়েকজন আহত লোককে নিয়ে আসলো। তাদের একইভাবে মাঠে গুলি করে হত্যা করা হলো, আর মাঠে গুলি আঘাত করায় ধূলি উড়তে দেখা গেল। ঠিক সে মুহূর্তে তার এক জ্ঞাতি ভাই অধ্যাপক নূরুল উল্লাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, কেন তিনি ওইসব ঘটে যাওয়া ঘটনার ছবি তুলে রাখছেন না? নূরুল উলা'র ছিল জাপানে তৈরি একটি পোর্টেবল ভিডিও রেকর্ডি ক্যামেরা যা সম্ভবতঃ সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র তারই ছিল। তিনি ক্যামেরাটি জানালার শার্সিতে স্থাপন করলেন এবং মাইক্রোফোনটি জানালার কিছুটা বাইরের দিকে মুখ করে রাখলেন। অধ্যাপক নূরুল উলা যখন তার ক্যামেরা স্থাপন করছিলেন তখন সেনারা আরো দু'টি দলকে ওই মাঠে এনে হত্যা করে। তিনি তার ক্যামেরায় আরো তিনটি দলের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য ধারণ করেন। তাহলে বলা যায় অধ্যাপক নূরুল উলা মোট সাত দফায় নিরস্ত্র ছাত্র ও সেখানকার মানুষদের হত্যা করতে দেখেছেন।
পরের দফায় মাঠের পূর্ব দিক থেকে মানুষ এনে পাক সেনারা একই কায়দায় হত্যা করেছে আগের স্তূপিকৃত লাশগুলোর পাশে। এসময় অধ্যাপক নূরুল উলা প্রায় চল্লিশজন লম্বা চওড়া ও ফরসা সেনাদের মাঠের উত্তর প্রান্তে লাইন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। ওই সেনারা হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়নি। হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয়া সেনারা ছিল তুলনামূলক আকারে ছোট ও কালো বর্ণের। প্রায় দশজন এ রকম সৈনিক মাঠের পূর্ব দিক থেকে ২৫-২৬ জন লোককে নিয়ে আসে যাদের দেখে নূরুল উলা ভেবেছিলেন এদেরকে আনা হয়েছিল মৃত দেহগুলোকে সরানোর জন্য, কিন্তু না- তাদেরও গুলি করে হত্যা করা হয়। একজন দাঁড়িওয়ালা লোক হাত বাঁধা অবস্থায় সৈনিকদের কাছে অনুনয় বিনয় করছিল, এমনকি গুলি খাওয়ার পরও অনুনয় বিনয় করে। একজন সৈনিক তাকে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলেও তিনি হাটুগেড়েই বসে রইলেন। এঅবস্থায় তাকে আবারও গুলি করা হয়। হত্যাকারী সেনারা এবার মরদেহগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর শেষবারের মতো আবারও কয়েকটি গুলি করে উত্তর দিকে চলে গিয়ে লাইন ধরে দাঁড়ায় এবং প্রচলিত সামরিক

www.pathagar.com

কায়দায় মার্চ করে চলে যায়। অধ্যাপক নূরুল উলা মাঠে মৃতের মোট সংখ্যা কতো ছিল বলতে পারেননি।

ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টার-এর ৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এ হত্যাযজ্ঞ: ক্যালিফোর্নিয়ার সান ক্লীমেন্টের ওয়েস্টার্ন হোয়াইট হাউসে ১৯৭১-এর ৩১ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উর্ধ্বতন পর্যালোচনা দলের বৈঠকের কথোপকথন নীচে বর্ণনা করা হলো :

হেনরী কিসিঞ্জার: 'তারা কি অধ্যাপক রাজ্জাককে হত্যা করেছে? সে আমার ছাত্র ছিল।'

ডেভিড বী (সিআইএ): 'আমার তো তাই মনে হয়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগণিত লোককে হত্যা করেছে।'

হেনরী কিসিঞ্জার: 'তারা তো ৪০ কোটি মানুষকে এতো বছর ধরে শুধু ভদ্রতার মাধ্যমে শাসন করেনি।'[৪৪]

অধ্যাপক রাজ্জাকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেও অনেকটা অস্বাভাবিকভাবেই কিসিঞ্জারকে গণহত্যা নিয়ে বিচলিত হওয়ার পরিবর্তে ভারতের মুসলমান শাসকদের শাসনামল সম্পর্কে মন্তব্য করতে দেখা যায়।

অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ থাকতেন সেই ৩৪ নম্বর এপার্টম্যান্টেই থাকতেন অধ্যাপক রাজ্জাক। তিনতলা বিল্ডিংটির মাঝখানে সিড়ি ছিল যার উভয় দিকেই ছিল ফ্ল্যাট। একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ যিনি ওই বিল্ডিংয়ের সর্বোচ্চ তলার ফ্ল্যাটে থাকতেন তিনি ১৬ মার্চ ব্যাংককের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেছিলেন। অন্যদিকে থাকতেন পরিসংখ্যানের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন দ্বিতীয় তলায়। নিচতলায় থাকতেন অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতা ও বাংলার মরহুম অধ্যাপক আব্দুল হাই -এর পরিবার।[৪৫]

আমি অধ্যাপকদের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জানতে চাইলে লে. ক.(পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) মোহাম্মদ তাজ আমাকে জানান 'ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারে তাদের কেউ যায়নি'। কিন্তু হত্যাকাণ্ড কেউ ঘটিয়েছিল বিশেষ করে ৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এ। পাঁচটি পরিবারের সদস্যরা যারা সেখানে বাস করতেন তারা সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে সেখানে কি ঘটেছিল। সিআইএ'র দেয়া তথ্যও ভুল ছিল; অধ্যাপক রাজ্জাক ওই রাতে ৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এ ছিলেন এবং তিনি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান।

গুহ ঠাকুরতা পরিবারের জ্যোর্তিময়, বাসন্তী ও মেঘনা গুহ ঠাকুরতা বিশ্ববদ্যিালয়ে ছাত্রদের হলগুলোয় হামলা হলে চৌকির নিচে আশ্রয় নেন। যখন গুলিবর্ষণ কমে এসেছে বলে মনে হয় তখন বাসন্তী জানালা দিয়ে মুখ বের করেন ও একটি জীপসহ লাইন দিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ি আসতে দেখেন যারা চৌরাস্তায় দেয়া ব্যারিকেডের কাছে এসে থেমে যায়। একজন অফিসার তাদের বিল্ডিং-এর গেটের চেইন খুলে ফেললে সৈনিকরা হুড়মুড় করে বিল্ডিং-এর সব তলায় পৌছে যায় ও প্রত্যেক তলার প্রত্যেক ফ্ল্যাটে দরজায় লাথি মারতে শুরু করে।

একজন অফিসার মেঘনা'র ঘরের জানালার শার্সি ভেঙ্গে ফেলে জানালায় লাগানো জাল বেয়োনেট দিয়ে কেটে পর্দার একপাশে সরিয়ে দেন। মিসেস গুহ ঠাকুরতা তখন চিন্তা

www.pathagar.com

করছিলেন অফিসারটি হয়তো বিছানার নিচ থেকে রেরিয়ে থাকা তাদের পা লক্ষ্য করে ফেলেছে। যাহোক মুহূর্তের মধ্যে অফিসারটি বিল্ডিং-এর পাশে তাদের বাগানে গিয়ে ঢুকলো। মিসেস গুহ ঠাকুরতা তার স্বামীকে *পাঞ্জাবী* দিয়ে বললেন, "প্রস্তুত হও, তারা তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছে।" ইতোমধ্যে অফিসারটি পিছন দিয়ে রান্না ঘরে প্রবেশ করে বাসার চাকরানিকে একপাশে *ঠেলে* বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। এরপরই মিসেস গুহ ঠাকুরতা অফিসারটির মুখোমুখি হন। তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দুতে অফিসারটির সাথে যে কথা বলেছিলেন সে সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বলেন:[৪৬]

অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন, *'প্রফেসার সাব হ্যায়'* (অধ্যাপক সাহেব আছেন)? মিসেস গুহ ঠাকুরতা বললেন *'হ্যায়'*। অফিসারটি বললেন, 'উনকা লে জায়েঙ্গে' (উনাকে নিয়ে যাব)। মিসেস গুহ ঠাকুরতা জানতে চাইলেন, *'কাহা লে জায়েগা, ভাই?'* (তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে ভাই?)

অফিসারটি বললেন, 'লে জায়েগা' (তাকে নিয়ে যাব)।

তার পিছনে যেতে যেতে মিসেস গুহ ঠাকুরতা অফিসারটিকে বললেন, 'আপনারা বাসার ভেতরে ঢুকে গেছেন, তাহলে কেন তারা এখনও সামনের দরজা ভাঙ্গছে?'

অফিসারটি চিৎকার করে সাথের সৈনিকদের বললেন, *'হ্যাম ইধার পার হ্যায়, ইয়াকুব। দরওয়াজা মাত ভাঙ্গ।'* (আমি এখানে আছি ইয়াকুব, দরজা ভেঙ্গো না)। এ কথায় দরজায় ধাক্কা মারা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল।[৪৭]

এরপর তাদের শোয়ার ঘড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন, *'আওর কই জওয়ান আদমী হ্যায়?'* (আর কি কোনো যুবক এখানে আছে?)। মিসেস গুহ ঠাকুরতা বললেন, *'হামারা এক হি লেড়কি হ্যায়।'* (আমাদের একটি মাত্র মেয়ে)। অফিসারটি বললেন, *'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়, লেড়কি কো কই ডর নেহি হ্যায়'* (ঠিক আছে, ঠিক আছে মেয়ের জন্য ভয়ের কোনো কারণ নেই)। শোয়ার ঘড়ে তখন পর্যন্ত অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা *পাঞ্জাবীটি* ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অফিসারটি অধ্যাপকের বামবাহু আঁকড়ে ধরেন। মিসেস গুহ ঠাকুরতা তার স্বামীকে *পাঞ্জাবী* পড়ালেন এবং বললেন 'তিনি তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছেন।' অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন, *'আপ প্রফেসর সাব হ্যায়?'* (জনাব,আপনিই কি অধ্যাপক সাহেব?)। অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতা উত্তর দিলেন, *'হ্যা'*। *'আপকো লে জায়েঙ্গে'* (আপনাকে নিয়ে যাব)। অধ্যাপক সাহেব জানতে চাইলেন 'কেন'? কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে তাকে বাগানের ভিতর দিয়ে জোর করে টেনে নিয়ে গেল পাক সেনারা।

মিসেস গুহ ঠাকুরতা দৌড়ে তার স্বামীর স্যাণ্ডেল নিয়ে ফিরে আসলেন, কিন্তু তাদের আর দেখতে পেলেন না। ইতোমধ্যে সিঁড়িতে প্রচণ্ড হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে যেখানে মিসেস গুহ ঠাকুরতা মিসেস মনিরুজ্জামানকে দেখলেন সিঁড়িতে বসে কাঁদছেন। সৈনিকরা টেনে হেচড়ে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসছিল অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, তার পুত্র, ভাগ্নে ও অপর একজন ভদ্রলোককে। এই পরিবারটি সবেমাত্র ৫ মার্চ ওখানে এসেছে। মিসেস গুহ ঠাকুরতা তাদের সকলকে সৈনিকদের সাথে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন অন্যথায় তারা গুলি করে দিতে পারতো এবং বললেন যে, তার স্বামীকেও এইমাত্র সেনাবাহিনীর লোক ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। ঠিক এসময় বাইরে দু'টি গুলির শব্দ হলো এবং মেঘনা গুহ ঠাকুরতা তার কানে হাত দিলেন।

www.pathagar.com

এদিকে ওই অফিসারটি ফিরে আসলেন ও ডাইনিং কক্ষ ভাঙ্গার চেষ্টা করলে মিসেস গুহ ঠাকুরতা তাড়াতাড়ি তার জন্য তালা খুলে দিলেন। তিনি সকল বাথরুমে তল্লাশি চালালেন। মেঘনার বাথরুমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, *'মুজিবর রহমান কাহা রাহাতা হ্যায়?'* (মুজিবুর রহমান কোথায় থাকে?)। তালগোল পাকিয়ে ফেলে মেঘনা গুহ ঠাকুরতা বললেন, 'আমরা তাকে চিনি না' (কোনো রাজনৈতিক নেতা হবেন)। একথা শুনে অফিসারটি তার দিকে ফিরে চিৎকার দিয়ে উঠলেন ও বাগানের ভিতর দিয়ে চলে গেলেন।

এ সময় সিঁড়িতে একসাথে অনেক গুলির শব্দ হলো এবং অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ও অন্য তিনজকে দেখা গেল সেখানে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে গভীর আর্তনাদ করছেন এবং সেনারা সেখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। কেউ একজন পানি চাইছিল। এর মাঝে রাস্তা থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে নেয়া হয় ও সামরিক বাহিনীর এগারোটি গাড়ি সেখান দিয়ে চলে যায়। মিসেস গুহ ঠাকুরতা তখনও চিন্তা করছিলেন যে হয়তো ওই একটি গাড়িতে তার স্বামী আছেন। মিসেস মনিরুজ্জামানের চিৎকারের পরই কেবল জানা যায় যে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা গেটের বাইরে পড়ে আছেন ও মিসেস গুহ ঠাকুরতা বুঝতে পারলেন আসলে তার স্বামীর কপালে কি ঘটেছে।

অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতা গেটের কাছে ঘাসের উপর চিৎ হয়ে পড়েছিলেন। অসাড় হয়ে পড়ে থাকলেও তার জ্ঞান ছিল ও কথা বলতে পারছিলেন। তাঁকে ভিতরে নিয়ে আসা হয় এবং ২৭ মার্চ সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে চারদিন থাকার পর ৩০ মার্চ তিনি সেখানে মারা যান। তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতার মরদেহ হাসপাতালে রেখেই চলে যেতে হয়েছিল এবং তারা আর কখনোই জানতে পারেননি তাঁর মরদেহের শেষ পরিণতি। তার স্ত্রী ও কন্যার মাধ্যমে অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতার যে সাক্ষ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে অফিসারটি তাকে হলের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে তার নাম ও ধর্ম জিজ্ঞেস করেন এবং উত্তর পাওয়ার পরপরই তার গলায় রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করেন।

৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এর ঘটনা সম্পর্কে অন্যান্য সকল বাঙালিদের দেয়া বিবৃতি ছিল সঙ্গতিপূর্ণ; এগুলোর মধ্যে ছিলো অধ্যাপক আনিসুর রহমান, জাহানারা ইমাম ও কালীরঞ্জন শীলের দেয়া বর্ণনা। অধ্যাপক আনিসুর রহমান তার সামনের একটি দরজায় বড় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে ভিতরে স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে একদম নিশ্চুপ বসে ছিলেন যাতে বাইরে থেকে মনে হয় যে ফ্ল্যাটে কোনো লোকজন নেই। জাহানারা ইমামের দেয়া তথ্য অনুসারে অধ্যাপক হাই-এর পরিবারও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন।[৪৮] অধ্যাপক আনিসুর রহমান ভিতর থেকে শুনতে পান যে অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের ফ্ল্যাট থেকে লোকজনকে টেনে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামানো হচ্ছে এবং নিচের সিঁড়িতে গুলি চলছে। তার দরজার সামনে এসে সেনাদের বুটের আওয়াজ থেমে যায় এবং কেউ একজন দরজায় ধাক্কা দেয় ও জোরে কলিংবেলে চাপ দেয়, কিন্তু আবার চলে যায়। তিনি জওয়ানদের পরের বাড়িত যেতে দেখেন, সেখানে অধ্যাপক গোবিন্দ দেব বাস করতেন। ২৬ মার্চ খুব সকালে তিনি সৈনিকদের ফ্ল্যাটের উপর তলায় ফিরে আসতে ও ওই বিল্ডিং থেকে মৃতদেহ সংগ্রহ করতে দেখলেন; ২৭ মার্চ তিনি একটি মরদেহ স্ট্রেচারে করে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে দেখলেন; প্রকৃতপক্ষে ওই স্ট্রেচারে শায়িত ছিলেন গুরুতর আহত অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতা। ওইদিন সান্ধ্য আইন তুলে নেয়া হলে সকলেই ওই বিল্ডিং থেকে পালিয়ে যান ও অধ্যাপক রাজ্জাক অন্যদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মেডিকেল কলেজে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

www.pathagar.com

২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের লক্ষ্য করে কোনো তালিকা তৈরি করা হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে আমি ব্রিগেডিয়ার তাজকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান-এ ধরনের কোনো তালিকা তারা তৈরি করেননি। সে সময়ের পাকিস্তান ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারী- জেনারেল ওমরও এ ধরনের তালিকার কথা অস্বীকার করেন, তবে তিনি জানান যে, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের জন্য অবশ্য একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছিল যেখানে শেখ মুজিবের নাম দিয়ে তালিকা শুরু করা হয় এবং তাদের গ্রেফতারের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয় বিশেষ কমান্ডোদের। ব্রিগেডিয়ার তাজ বলেন একমাত্র কামাল হোসেন নামের একজন রাজনীতিবিদকে গ্রেফতারের জন্য তিনি একটি দলকে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি।[৪৯]

রাজনীতিকদের গ্রেফতারের তালিকায় হোসেন নামে অন্য একজন ছিলেন এবং তাকে পাওয়া গিয়েছিল। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন শেখ মুজিবের সাথে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী। একটি পৃথক বর্ণনায় তার স্ত্রী ও তার প্রতিবেশী আব্দুল্লাহ খালেদ বলেন ২৬ মার্চ খুব সকালে একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একদল সৈনিক তার সন্ধানে আসে। মোয়াজ্জেম সাধারণত রাতে অন্য ঠিকানায় থাকতেন, কিন্তু ওই রাতে ছিলেন নিজের বাড়িতে। বাড়ির চারজন লোক, অন্য একজন প্রতিবেশী, খালেদ, একজন বালক চাকর ও মোয়াজ্জেম হোসেনকে বাইরে লাইন করে দাঁড় করায় পাক সেনারা এবং একজন অফিসার তাদের নাম জিজ্ঞেস করেন। তিনজনকে ফিরে যেতে বলা হয়। প্রতিবেশী খালেদ দাবি করেন তিনি অফিসারকে বলতে শুনেছেন যে তাকে শেষ করে দাও, এরপর গুলির শব্দ হলো, পিছনে ফিরে দেখলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম পড়ে যাচ্ছেন রক্তাক্ত অবস্থায়। মিসেস হোসেন লিখেছেন, তিনি উপরের জানালা দিয়ে দেখলেন বাইরে তার স্বামীর মরদেহ নিয়ে চলে যেতে।[৫০]

রেডিও যোগাযোগের ধারণকৃত রেকর্ডে গলার শব্দ পাওয়া যায় বেশ উচ্চস্বরে ও স্পষ্ট করে: *'২৬ মার্কর কো বাতাইয়ে কে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম কো পাকরানে গায়ে থে, তু উসনে রেজিসট্যান্স কিয়া, জিসমে উ্য মারা গায়া, লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম মারা গায়া, ওসকি বডি হামরা পাস হ্যায়, ওভার'।*

('মার্কর' কে জানাও যে আমরা লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিলাম, তিনি প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন এর ফলে তিনি নিহত হন। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন নিহত হয়েছেন। তার মরদেহ আমাদের কাছে আছে।)'২৬' সম্ভবত ৩২ পাঞ্জাবের জন্য সাংকেতিক নম্বর ছিল, কারণ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যে ইউনিটটি পাঠানো হয়েছিল সেখানেও একই কোড ব্যবহার করা হয়েছিল। ৩২ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার লে. ক. (ব্রিগেডিয়ার) তাজ লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে গ্রেফতার করার চেষ্টা বা তার হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করতে পারেননি। একমাত্র আইনজীবী রাজনীতিবিদ একজন 'হোসেন'-এর নাম তার স্মরণে ছিল যিনি ছিলেন কামাল হোসেন যাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেও তারা সফল হননি। কেবল যে অফিসারটি লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম-এর নিহত হওয়ার ব্যাপারে রিপোর্ট করেছিলেন তিনিই কেবল ব্যাখ্যা দিতে পারতেন যে কি পরিস্থিতিতে লে. কমান্ডার প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন এবং কেন তাকে জীবিত নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এ ফ্যাকাল্টি কোয়ার্টারে সৈনিকদের সব এপার্টমেন্টের দরজায় লাথি মেরে ভাঙ্গার চেষ্টা ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যার চেষ্টা থেকে বোঝা যায় হত্যা করার জন্য তারা নামের কোনো তালিকা করেনি। তারপরও অফিসারটি গুহ ঠাকুরতার

www.pathagar.com

বাসভবনে প্রবেশ করে 'প্রফেসার সাব' বলে ডাকতে থাকেন এবং তার কন্যা মেঘনাকে জিজ্ঞেস করেন 'মুজিবর রহমান' কোথায় বাস করেন। মেঘনার মনে হয়েছিল অফিসারটি প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক আনিসুর রহমানের সন্ধান করছিলেন যিনি উপর তলায় থাকতেন। আবার অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের ব্যাপারে একটি দ্বন্দ্ব থেকে যায়। যদি সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো নামের তালিকাই থাকতো তাহলে ওই নামটা হতো বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের যিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু যে অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে টেনে হেচড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে তাকেসহ আরো তিনজন ও তার পরিবারের সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক।

শববাহক হওয়ার যাতনা: এক সময় রাতের অপারেশনে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটগুলোর মাঝে মৃহদেহগুলো সরানোর ব্যাপারে রেডিওতে কথাবার্তা হয়, সকল ইউনিটের জন্য একটি সংবাদ আসে; *'২৬,৭৭ থেকে বার্তা। মার্কর কো ইনফর্ম কারেন কে ইমাম নে কাহা হ্যায় ফাষ্ট লাইট সে পেহলে পেহলে জিতনে ইয়ে ডেড বডিস হ্যায় ইতনে [অস্পষ্ট], আউর সাব কনসার্নিং কো বাতা দে, ওভার'* (মার্কর কে বলে দাও যে ইমাম বলেছে যে সকাল হওয়ার আগেই যতোগুলো লাশ আছে ততোগুলোই [অস্পষ্ট] অন্যান্য সংশ্লিষ্টদেরও বলে দাও)।

সেনা অভিযানের প্রধান যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল ১৬, ৪১ ও ৮৮ কোডের ইউনিটগুলোকে যে তারা ওই সংবাদটা পেয়েছিল কিনা? অনেক ঝামেলার পর হেড কোয়ার্টার ৪৪ কোডের ইউনিট যেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিল তাদের সাড়া পেয়েছিল এবং বলা হয়েছিল স্থানীয় মজুরদের ব্যবহার করে জনবসতি থেকে দূরে কোথাও লাশগুলো সমাহিত করতে।

এর মাঝে, রবীন্দ্র মোহন দাস ও তার পরিবারকে বের করে দিয়ে তাদের স্টাফ কোয়ার্টারে আগুন জ্বালিয়ে দেয় সৈনিকরা। সেনারা তার ভাইকে পেটাতে থাকে, কিন্তু সে হিন্দিতে কথা বলা শুরু করলে তাকে চলে যেতে দেয়া হয়। ওই সময় তার বড় ভাইসহ সকলেই সেখান থেকে চলে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু তখনও একত্রিশ জন সেখানে ছিল যখন সেনারা তাদের মধ্যে পনের জনকে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য হুকুম দেয়। এ লোকগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয় ওই এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃহদেহগুলোকে সংগ্রহ করে জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে এক জায়গায় যেখানে লং জাম্পের জন্য বালু থাকতো সেখানে জমা করার। এরপর তাদেরও ওইখানে গুলি করে হত্যা করে পাক সেনারা। সেনারা আবার ফিরে এসে বাকী লোকদের নিয়ে যায় এবং তাদের ভাগ্যে একই পরিণতি ঘটে কেবল দু'জন বালক বাদে, একজন রবীন্দ্র মোহন দাস ও অপর একজন বালক যাদের বয়স খুব কম হওয়ায় চড়-থাপ্পড় দিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

দাস এক অদ্ভুতরকম শান্ত থেকে ও নির্ভুলভাবে ওই ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বর্তমানে প্রভোষ্ট দফতরে কাজ করেন যেমনটি তার বাবা করতেন। আমরা তার সাথে কথা বলছিলাম জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে। সে স্টাফ কোয়ার্টার ও লাশ জমা করে রাখার অর্থাৎ বালির গর্তের জায়গাটা আমাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। সে যখন সেদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ বেলা একটার সময় ওই স্থান ছেড়ে চলে যায় তখনও লাশগুলো ওই বালির গর্তে গাদা মেরে রাখা ছিল। কতগুলো লোককে এখানে ওই দিন হত্যা করা হয়েছিল তার একটা ধারণা পেতে রবীন্দ্র মোহন দাসকে বলা হলে সে যা বলে তা হলো আনুমানিক

www.pathagar.com

পঁচিশ জন। লাশগুলো জড়ো করতে যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ও পালা করে হত্যা করা হয় তাদের সংখ্যাও ছিল এ রকম।

কালীরঞ্জন শীল যিনি জগন্নাথ হলের কার্নিশে লুকিয়ে ছিলেন তিনি পাক সেনা চলে গেছে এ চিন্তা করে ২৬ মার্চ সকালে সেখান থেকে নিচে নেমে আসলে ধরা পড়ে যান। শীল এসে দেখলেন যে যারা বেঁচে আছে তাদের দিয়ে মাঠে মৃতদেহ বহন করানো হচ্ছে। তাকেও এ কাজে লাগানো হলে তিনি তার পরিচিত গেটম্যান প্রিয়নাথের লাশ বহন করা দিয়ে তার কাজ শুরু করেন। এ সময় ঝাড়ুদার স্টাফ ও ছাত্রদের একটা ছোট দলকে দিয়ে লাশ নিচে নিয়ে আসা হলো এবং তারা লাশগুলো একটি গাছের নিচে জমা করতে লাগলেন। সৈনিকরা ধূমপান করছিল এবং তারা বাংলাদেশ চাওয়ার জন্য সকলকে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ করছিল। ঝাড়ুদাররা সৈনিকদের নিকট অনুনয় বিনয় করে তাদের ছেড়ে দিতে বলে কারণ তাদের যুক্তি ছিল যে তারা বাঙালি নয়।

কালীরঞ্জন শীল ও কয়েকজনকে সেই এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতা থাকতেন। শীল সেখানকার সিঁড়িতে অনেক লাশ দেখলেন যাদের তারা সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। শীল জানান সেনারা বিভিন্ন স্থান থেকে বাংলাদেশের পতাকা সংগ্রহ করে ও মূল্যবান দ্রব্যাদি লুট করে নিয়ে যায়।

শীল লিখেছেন, তার তার মনে নেই তিনি কতগুলো লাশ বহন করেছিলেন। শেষ বারের মতো শীল সুনীল নামে অন্য এক ভদ্রলোকের লাশ বহন করে মাঠে লাশের স্তূপের উপর এনে রাখেন ও আগেই পৃথক করে দেয়া ঝাড়ুদার / মেথরদের গুলি করে হত্যা করতে দেখেন। অন্য বালকরা যারা মরদেহগুলো জমা করে এবার তাদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঝাড়ুদার মেথরদের স্ত্রীলোকদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করে পাক সেনারা। লাশের স্তূপের উপর সুনীলের লাশ রাখতে গিয়ে শীল দেখতে পায় অধ্যাপক গোবিন্দ দেবের ধুতি পরা লাশ- তিনি তার পাশে শুয়ে পড়েন। পরে শীল জেগে ওঠেন চৌকিদার, মালি ও ঝাড়ুদারদের পরিবারের শোকবিলাপ আর আর্তনাদে। লাশের স্তূপে পড়ে থাকা মানুষগুলোর কেউ কেউ তখনও বেঁচে ছিল। একজন আহত লোক হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কোথাও সামরিক বাহিনীর লোকজনকে দেখা যাচ্ছিল না। এরপর শীল বস্তিতে পালিয়ে যান।[৫১]

আমি আমেরিকায় প্রথম এক বাংলাদেশী বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম যে কেউ একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরস্ত্র সাধারণ লোকজনকে পাক সেনাদের গুলি করে হত্যা করার দৃশ্য ক্যামরায় গোপনীয়তার সাথে ধারণ করেছিলেন। এরকম একটি ফিল্ম হতে পারে জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সকালে ঘটে যাওয়া ঘটনার অমূল্য ও তর্কাতীত সাক্ষী। সকলেই আশা করতে পারে এরূপ একটি প্রমাণ্য দলিল জাতীয় সম্পদ হিসেবেই বিবেচিত হবে, ব্যাপকভাবে টেলিভিশনে প্রচার পাবে এবং প্রধান রিসার্চ আর্কাইভে সহজলভ্য হবে। যখন আমি বাংলাদেশে যাই তখন আমি আশা করেছিলাম যে আমি ওই ফিল্মটি দেখতে পাব।

ঢাকার অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, তারা অনেক বছর আগে টেলিভিশনে ওই দৃশ্য দেখেছেন কিন্তু যারা ফিল্মের দুনিয়ায় বাস করেন অর্থাৎ যারা এ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়েই সর্বক্ষণ কাজ করেন তাদের কোনো ধারণাই নেই সেটি কোথায় আছে। ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরেও এটি নেই। আমি অধ্যাপক নূরুল উলা'র সন্ধান করেছি যিনি ওই ফিল্মটি তৈরি

www.pathagar.com

করেছিলেন, পরে জেনেছি তিনি ও তার পরিবার বিদেশে চলে গেছেন এবং অধ্যাপক নূরুল উলা মারা গেছেন। অবশেষে আমি বৃটেনে বসবাসরত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের নিয়ে ১৯৯০ দশকে বৃটিশ চ্যানেল ৪-এ প্রচারিত কয়েক সেকেণ্ডের একটি ফুটেজ দেখেছিলাম। এ ফুটেজের উপর অন্য শব্দ বসানো হয়েছিল এবং মাত্র একটি দলকে গুলি করার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল যেখানে অধ্যাপক নূরুল উলা লিখেছেন যে, তিনি ওই রকম তিনটি দলকে গুলি করার দৃশ্যের ছবি তুলেছিলেন।[৫২] ভিডিও চিত্র হচ্ছে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চূড়ান্ত দৃশ্যমান বস্তু যার মূল কপিটি সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়ার কথা এবং এটি আর্কাইভে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা খুবই প্রয়োজন।

কতজন হতাহত হয়েছিল?

'৩০০ জন নিহত হয়েছে? কেউ আহত হয়েছে, ধরা পড়েছে? ওভার'।
'৮৮, আমি শুধু একটি ব্যাপারে বিশ্বাস করি, তা হচ্ছে ৩০০ নিহত হয়েছে। ওভার।'
'৮৮, হ্যা, আমি তোমার সাথে একমত। এটা খুব সহজ... তোমার আর বিশেষ ব্যাখ্যা দেয়ার দরকার হবে না।'

-বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুর্ঘটনার বিষয়ে সেনা কর্মকর্তাদের মাঝে কথোপকথন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন সংঘর্ষ চলছিল তখন সেখানে উপস্থিত ইউনিট থেকে পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার বরাবর একটি বার্তা পাঠানো হয়: '৭৭, ৮৮ থেকে সর্বশেষ খবর: ইউনিট কাজে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু ওখানে অনেক বিল্ডিং যেগুলোয় যেতে হচ্ছে পালা করে। এ যাবত ইউনিটের কেউ হতাহত হয়নি, তবে অন্যপক্ষ থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। যা কিছু হাতের কাছে আছে তাই ব্যবহার করা হচ্ছে। ওভার'।
৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. ক. (ব্রিগেডিয়ার) তাজ যিনি ওই রাতে ঢাকায় সার্বিকভাবে সবগুলো ইউনিটের দায়িত্বে ছিলেন তিনি নির্ভুলভাবে হতাহতের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেন ইকবাল হলে বার জন মারা যায়, যার মধ্যে দু'জন ছিল মহিলা ও এদের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। জগন্নাথ হলে নিহত হয় মোট বত্রিশজন এবং সকলেই ছিল পুরুষ মানুষ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি প্রধান ছাত্রাবাসে হতাহতের ব্যাপারে ব্রিগেডিয়ার তাজের হিসেব যোগ করলে তা দাঁড়ায় ৪৪-এ। এ সংখ্যা রবীন্দ্র মোহন দাস মাঠে স্তূপিকৃত যতো লাশ দেখেছিলেন তার চেয়ে বেশি হলে ওই পরিস্থিতি বিবেচনায় খুব একটা তারতম্য হয়েছে বলা যাবে না। আগের লাশগুলো স্তূপিকৃত করার পর যে অতিরিক্ত ২৯ জন স্টাফকে গুলি করে হত্যা করা হয় তাতে মোট নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩-এ।
রোকেয়া হলের প্রভোষ্ট আখতার ইমাম হলের সাতজন স্টাফের নাম বলেছেন (গেটম্যান, মালি, পিওন ও একজন লিফটম্যান) যাদের ২৫-২৬ মার্চ রাতে পাক সেনারা হত্যা করে। অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ওই সব স্টাফদের স্ত্রী, সন্তান, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনরাও পাক সেনাদের দ্বারা নিহত হয়েছিল এবং রোকেয়া হলের রেকর্ড অনুসারে সেখানে মোট পঁয়তাল্লিশ জন নিহত হয়েছে।[৫৩]
লে. ক. (ব্রিগেডিয়ার) তাজের দেয়া মৃতের সংখ্যা নিয়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসে তারই সহকর্মী লে. ক. বাসারতের দেয়া তথ্যের সাথে যিনি ২৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

www.pathagar.com

অপারেশন চলাকালীন খুব সকালে (২৬ মার্চ) রেডিও কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের যে কথপোকথন ধারণ করা হয়েছিল তা নীচে বর্ণনা করা হল। ওই রেডিও কমিউনিকেশনে ব্রিগেড কমান্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ে হতাহতের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন:

(অফিসার এ): '....বিশ্ববিদ্যালয়ে হতাহতের সংখ্যা কেমন হতে পারে? তোমার মতে কত হতে পারে আমাকে জানাও। কতগুলো মারা গেছে, কতগুলো আহত বা ধরা পড়েছে? আমাকে কেবল একটা ধারণা দাও। ওভার।'

(অফিসার বি): '৮৮।... আনুমানিক ৩০০ জন হবে। ওভার'।

(অফিসার এ): 'ওয়েলডান, ৩০০ জন নিহত হয়েছে? কেউ আহত হয়েছে বা ধরা পড়েছে? ওভার।'

(অফিসার বি): '৮৮। আমি কাজে বিশ্বাস করি, ৩০০ জন নিহত হয়েছে। ওভার'।

(অফিসার এ): 'হ্যা আমি তোমার সাথে একমত, তুমি জান এটা অনেক সহজ, কিছু করতে বলা হয়নি, কিছু করাও হয়নি। তোমাকে আর কিছুই ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই। আবারো বলছি খুব ভালো, ওয়েলডান...'।[৫৪]

উপরের এ বাক্য বিনিময়ে মনে হয়েছে যে ব্রিগেড কমান্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্রোহীদের আহত বা গ্রেফতারের আশা করছিলেন, তিনি তার পদস্থ কর্মকর্তাকে সকল বিদ্রোহীদের হত্যা করার নির্দেশ দেননি। তবে ওই সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। ব্রিগেড কমান্ডার তার অধীনস্থ অফিসারকে তার নেয়া সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষমা করে দেন এবং আশ্বস্ত করেন যে ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই। কঠিন বাস্তব যে অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতার কন্যা মেঘনা গুহ ঠাকুরতার দেয়া মৃতের সংখ্যাও ছিল ৩০০ জন। যে কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশে অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতাকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছিল তিনি কাউকে গ্রেফতার করে কয়েদি করায় বিশ্বাস করতেন না।[৫৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরিষতলায় উপাচার্যের বাসভবনের সামনে ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা নিহত হয়েছেন তাদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। পুরো বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র ও কর্মচারী যারা নিহত হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ১৪৯ জন। কিছু কিছু ছাত্র ও বিভিন্ন বিভাগের কেউ কেউ বিভিন্ন সময়ে অন্য স্থানে নিহত হয়েছেন। ২৫-২৬ মার্চ রাতে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হয়েছেন তাদের সংখ্যা ১৪৯ জনের কম হবে এ তথ্য পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব দেয়া তথ্য থেকে। মজার বিষয় যে রবীন্দ্র মোহন দাস প্রায় সঠিক হিসেব দিয়ে বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী নিহত হয়েছে ২৯ জন।

কীভাবে একজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের দেয়া হিসেব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ৪৪-এর সাথে ৩০০ মেলাবেন যেখানে তাদেরই তো তা ভালো জানার কথা ছিল? বাঙালি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্মৃতিচিহ্ন থেকে যে নিহতের সংখ্যা পাওয়া যায় তাও কোনোভাবেই ৩০০ জনের আশপাশে নেই। এটা কি সেসব গণা-গুণতি ছাড়া 'বাইরের লোক' যারা সেখানে এসেছিল সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য যাদের কারণেই মৃতের সংখ্যা বেড়েছে? নাকি আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয়েই যেভাবে হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়ে বলেছে তার কারণে এমনটি ঘটেছে মৃতের সংখ্যার ক্ষেত্রে?

www.pathagar.com

মৃতদেহগুলোর ভাগ্যে কি ঘটেছিল? আমার প্রশ্নের ধরণ আঁচ করতে পেরে লে. ক. (ব্রিগেডিয়ার) তাজ একটু মুচকে হেসে জবাব দিলেন যে, মাঠে কোনো মৃতদেহ মাটি চাপা দেয়া হয়নি, সব মৃতদেহ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে । ভোর হওয়ার সময়টায় তাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন না। তিনি আমায় বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে গিয়েছিলেন কারণ সেখানে নিয়ন্ত্রণ আনতে দীর্ঘ সময় লাগছিল। তিনি সেখানে পৌঁছে পুলিশ লাইনে কয়েকটি মর্টার শেল নিক্ষেপের নির্দেশ দেন যাতে প্রচণ্ড শব্দ হয় এবং এতে শত্রুদের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে। একটি গোলাবারুদের ভাণ্ডারে আগুন ধরে যায়। সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজারবাগ পুলিশ লাইন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি।[৫৬] যা হোক তার ব্যাটালিয়ানকে হয়তো পরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাঠানো হয়েছিল অভিযানে সহায়তা করার জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত '৮৮' সাংকেতিক নামের ইউনিটকে যখন অভিযান পরিচালনায় আর কতো সময় লাগবে বলে জিজ্ঞেস করা হয় তা নিয়ে রেডিও যোগাযোগের একটি বার্তায় একটি বিশেষ সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে:

"৮৮, ৭৭-এর জন্য। এখন পৌনে সাতটা বাজে। আমি এ স্থান থেকে আটটায় চলে যাবো। এখানকার মৃতদেহগুলো সংগ্রহ করে সেগুলোকে সরিয়ে ফেলতে আমার প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগবে। ওভার '।

ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার: '৮৮ রজার। তুমি সব মৃতদেহ একস্থানে নিয়ে এসো এবং ২৬ কল সাইনকে এগুলো নিয়ে যাওয়ার কথা বলা যেতে পারে। ইমাম বলেছেন লাশগুলোর শেষ ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এখনকার জন্য পুলিশ ও বোসমরিক লাশগুলোকে পৃথক করে গণনা করা যেতে পারে এবং কল সাইন ২৬ তাদের উপর নজর রাখতে পারে আর তুমি তোমার এলাকায় চলে যাও। ওভার'।

'...৮৮ রজার। আপাতত আমরা এগুলো সংগ্রহ করছি যা একস্থানে জমা করব... এবং তারপর আমরা কল সাইন ২৬-কে ডাকবো। অনেক ধন্যবাদ আর কিছু? ওভার'।

[কল সাইন ২৬ বলতে এখানে ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কোড বা সাংকেতিক নামকে বোঝানো হয়েছিল যার কমান্ডে ছিলেন লে. ক. (ব্রিগেডিয়ার) তাজ।]

অধ্যাপক নূরুল উলা ২৬ মার্চ দুপুর একটার সময় তার এপার্টমেন্ট বিল্ডিং থেকে পালিয়ে যাবার আগে একটি বড় বুলডোজারকে খেলার মাঠে মাটি খুঁড়তে দেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন সারওয়ারও তার স্মৃতি থেকে জানালেন যে তিনি সে সময় বুলডোজার আসতে দেখেছেন। অন্যদিকে তখন তিনি শহীদ মিনার ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তবে তিনি তাতে অশুভ বা ক্ষতিকর কিছু দেখেননি। তিনি ভেবেছিলেন জনস্বাস্থ্যের স্বার্থেই মরদেহগুলো যেখানে পড়েছিল সেগুলো মাটি চাপা দিতেই বুলডোজার যাচ্ছিল। ২৭ মার্চ সান্ধ্য আইন উঠে গেলে অন্যান্য অনেকের মতো কলাবাগানের ড. আবুল কালাম আজাদও সাহস করে রাস্তায় বের হন। তিনি আমাকে জানান জগন্নাথ হল মাঠে তিনি মাটি ফুড়ে মানুষের হাত বের হয়ে থাকতে দেখেছেন।[৫৭]

যখন আমি জগন্নাথ হলের বাইরের মাঠে একটি গণকবরের কথা প্রথম শুনি তখন আমি আশা করেছিলাম বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরপরই মাটি খুঁড়ে লাশগুলো গণনা করে তাদের পরিচিতি জেনে লাশের আত্মীয়-স্বজন দ্বারা যথাযথ ভাবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। মনে করেছি যাবতীয় তথ্য সম্বলিত একটি স্মৃতিস্তম্ভও ওই স্থানে স্থাপন করা

www.pathagar.com

হয়েছে। কিন্তু সেখানে আমি এসব কিছুই দেখিনি। সেখানে একটি স্মৃতিচিহ্ন আছে তবে তা মাঠের একপাশে। মেঘনা গুহ ঠাকুরতা মনে করেন কিছু লাশ সেখান থেকে তুলে অন্যত্র সরানো হয়েছে এবং বাকী লাশগুলো ওই মাঠের নিচেই আছে। এমনকি অত্যুৎসাহী মুক্তিযোদ্ধারাও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি যুদ্ধের শেষে কেন ওই কবর থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লাশগুলো তুলে তার বিস্তারিত তথ্য নেয়া হলো না? আর কেনইবা ওইসব হতভাগাদের আপনজনেরা তাদের প্রিয়জনদের লাশ পুনরুদ্ধার করার দাবি করলো না? অনেক বাংলাদেশী অবশ্য দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামরিক শাসনের প্রত্যাবর্তন-এর কথা বলে অব্যাহতি পেতে চেয়েছেন। কিন্তু শেখ মুজিবতো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রচণ্ড দাপটের সাথে ক্ষমতায় ছিলেন এবং তখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথেষ্ট সমবেদনা ছিল। আর স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলোতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত ছিল অনেক ক্ষেত্রেই। এমনকি যে সামরিক শাসক যিনি ১৯৭৫ সালে ক্ষমতায় আসেন সেই জিয়াউর রহমানও বিদ্রোহ করে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তিনিও এনিয়ে কিছু করেননি।

বহুল প্রচারিত একটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট রাজধানী শহরের বিশেষ একটি স্থানের গণকবরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খনন করে যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার ব্যর্থতা বাংলাদেশীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও গণহত্যার দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। হতে পারে যে হয়তো বাংলাদেশীদের দাবির চেয়ে ওই স্থান খনন করলে কম সংখ্যক লাশ পাওয়া যেত। এটাও সম্ভব যে খনন করলে হয়তো অনেক লাশই পাওয়া যেত যারা বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র নয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রামাণ্য তথ্য বের করা সম্ভব যদি বাংলাদেশীরা সে ব্যাপারে ইচ্ছে পোষণ করে।

ভিন্ন মত পোষণ: রাতের সেনা অভিযানের পর লে. ক. (ব্রিগেডিয়ার) তাজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে যান। সেখানে তখন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ও বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের লোকজন অবস্থান করছিলেন। সাংবাদিকরা ঘোষণা দিলেন তারা ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ শুনেছেন এবং শহরটা ঘুরে নিজেরা পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখতে চান। লে. ক. তাজ তাদের বললেন বেসামরিক লোকদের কাছে এটা ব্যাপক গোলাগুলি হতে পারে তবে সামরিক বাহিনীর মাপকাঠিতে এটা তেমন ভয়াবহ কোনো গোলাগুলির ঘটনা নয়। তিনি জানালেন সংবাদ মাধ্যমের লোকজনদের শহরের সর্বত্র নিয়ে যেতে তার আপত্তি নেই তবে এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে। লে. ক. তাজের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি অনুমতির জন্য বলেছিলেন, কিন্তু পরে প্রকৃতপক্ষে কি হয়েছিল সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না কেননা শীঘ্রই সে সময় প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকিকে হোটেলে পাঠানো হয়েছিল এবং তড়িঘড়ি করে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[৫৮]

সামরিক অভিযানের পর পাকিস্তানে মার্কিন কূটনীতি ছিল বিসদৃশ্য। ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ওয়াশিংটনে ৬ এপ্রিল একটি বিশেষ ও বহুল প্রচারিত বার্তা পাঠান যাতে তিনি ঢাকায় চাকরিরত মার্কিন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের কুঁড়িজন কর্মকর্তাকে সমর্থন দেন যারা পূর্ব পাকিস্তান সংকটে হস্তক্ষেপ না করার মার্কিন সরকারি নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। উইলিয়াম রজারস, একজন মার্কিন সচিব ওই বার্তা পাওয়ার পর প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে হেনরী কিসিঞ্জারের নিকট অভিযোগ করেছিলেন, কিসিঞ্জারও একমত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন।[৫৯] মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এ ব্যাপারে মার্কিন নীতিতে ছিলেন অটল। মুখ্য বিষয় ছিল ধীর স্থির ও শান্ত থাকা এবং কোনো কিছুই করার প্রয়োজন নেই এমন অবস্থানে অবিচল থাকা।[৬০] ওই বার্তাটি পাঠানোর পরই ব্লাডকে ঢাকা থেকে বদলি করে দেয়া হয়। সিআইএ পরিচালক রিচার্ড হেমস ঘোষণা দিয়েছিলেন আমেরিকা কারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জড়িত হবে না এবং এ থেকে যতোদূর সম্ভব দূরে অবস্থান করবে।[৬১] হোয়াইট হাউস ছাড়াও ইসলামবাদের মার্কিন দূতাবাসও কনসাল জেনারেল ব্লাডের পাঠানো তথ্যের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল।[৬২]

এদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে দেখা দেয় বিভক্তি। ১৯৭১- এর ৪ এপ্রিল লে. জে. এ এ কে নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তান পৌছান ও ১০ এপ্রিল তিনি জেনারেল টিক্কা খানের কাছ থেকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অপারেশনাল কমান্ডের দায়িত্ব বুঝে নেন এবং টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তার বইয়ে এবং আমার সাথে আলোচনায় জেনারেল নিয়াজী ঢাকায় ২৫-২৬ মার্চের পাক বাহিনীর অভিযানকে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের বৃটিশদের হত্যাকাণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা দিয়ে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে যে, তিনি এ জন্য সমালোচনা করছেন না যে সামরিক অভিযানের প্রয়োজন ছিল না বরং তা করছেন এ জন্য যে ওই সামরিক অভিযানটি অন্যভাবে হতে পারতো। তার মতো জেনারেল টিক্কাকে দেয়া দায়িত্ব থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছিলেন। জেনারেল টিক্কাকে বলা হয়েছিল বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করতে হবে, বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের গ্রেফতার করতে হবে এবং বেসামরিক লোকজনকে রক্তপাত থেকে রাখতে হবে দূরে। জেনারেলের ধারণা এ পদ্ধতি অবলম্বন করলেই বিদ্রোহীরা কয়েক দিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করতো।[৬৩]

নজরুল ইসলাম ও তার এক বন্ধু ২৫-২৬ মার্চ রাতে আর্ট কলেজ হোস্টেলে কাটিয়েছিলেন অথচ তার সন্নিকটেই ছিল ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর তাঁবু। রসবোধের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত শাহ্নওয়াজ নামে আরো একজন বন্ধু তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হতো বাইরে কি হচ্ছে, শাহ্নওয়াজ বলতেন, 'জয় বাংলা, ঠেলা সামলা।' তারা পালানোর আগেই পাক সেনারা সেখানে পৌছে যায় এবং ওই বিল্ডিং- এর ছাদে উঠে নিচে বস্তিতে পাউডার জাতীয় এক ধরনের বস্তু ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় আর সাথে সাথে বস্তিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। বস্তি থেকে লোকজন বের হয়ে দৌড় দিলে সেনারা তাদের গুলি করে হত্যা করে। নিচে এসে দরজায় ধাক্কা দিলে ওই তিনজনকে পেয়ে যায় ও তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে তিনজনকেই গুলি করে দেয়। সেনারা লুটপাট করে চলে গেলে নজরুল ইসলাম রক্তাক্ত হয়ে সেখানে পড়ে থেকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

ওই দিনই পরে সেনাবাহিনীর আর একটি দল সেখানে এসে হাজির হয়। নজরুল ইসলাম যখন তার চোখ বন্ধ করে পড়েছিলেন তখন তাকে অবাক করে একজন সৈনিক উর্দুতে বলে উঠল, 'আহারে কে এ সব তরুণদের গুলি করেছে এবং কেন করেছে? খোদা তো হ্যায় (আল্লাহ তো আছে)। তারা তিনজনকে নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, 'একজন (ইসলামকে দেখিয়ে) এখনও বেঁচে আছে, পানি দাও বেঁচে গেছে'। তারা তাকে পানি দিল, আর গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'বেটা জিন্দা রাহ, বেটা জিন্দা রাহ'। 'বেটা বেঁচে থাক, বেটা বেঁচে থাক'।[৬৪]

www.pathagar.com

অধ্যায় ৪

অসভ্যতার যুদ্ধ

উচ্ছৃঙ্খল জনতা, বিদ্রোহ ও উন্মাদনা

'আমাদের সরকার নৃশংসতাকে ঘৃণা করতে ব্যর্থ হয়েছে..., আমাদের সেখানে হস্তক্ষেপ করতে দেয়া হয়নি, এমনকি নৈতিকভাবেও না; এ অজুহাতে যে তা আওয়ামী সংঘাত ও তাতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বহুবার উচ্চারিত গণহত্যা প্রসঙ্গটি জড়িত রয়েছে এবং এ সব একটি স্বাধীন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমেরিকানরা তাদের বিরক্তিভাব প্রকাশ করেছে। আমরা পেশাদার সরকারে চাকুরে বা পাবলিক সার্ভেন্ট হিসেবে সরকারের নীতির সাথে দ্বিমত পোষণ করেছি।....'

-ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনালের আর্চার ব্লাডের সমর্থন নিয়ে ১৯৭১ সালের ৬ এপ্রিল ঢাকাস্থ মার্কিন বিদেশ মন্ত্রণালয়ের বিশজন কর্মকর্তার দ্বিমত পোষণ করে ওয়াশিংটনে পাঠানো বার্তা।

উইলিয়াম রজারস্: *'তারা নৃশংসতাকে নিন্দা করা সম্পর্কে কথা বলেছে। তারা পূর্ব পাকিস্তানী লোকদের হত্যাকাণ্ডের চিত্র দেখিয়েছে।'*

হেনরী কিসিঞ্জার : *'হ্যাঁ,সেখানে একজন পূর্ব পাকিস্তানী একটি খন্ডিত মস্তক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল... তোমরা কি স্মরণ করতে পার যখন তারা বলে যে সেখানে এক হাজার মানুষের লাশ আছে, তাদের কবর আছে এবং তারপর আমরা বিশজনের লাশও পাইনি?'*

-টেলিফোনে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজারস্ ও প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার -এর কথোপকথন, ৬ এপ্রিল ১৯৭১।[১]

কোলকাতার কারাগারে তার কক্ষে বসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আহত লে. সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ্ প্রশ্নের পর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতে এক সময় ভারতীয়দের দেয়া একটি সাময়িকীর প্রতি নজর দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এটা টাইম বা নিউজ উইক সাময়িকী হবে যাতে একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বাঙালিরা একজন পশ্চিম পাকিস্তানীর বিচ্ছিন্ন মস্তক ধরে আছে। লে. আতাউল্লাহর চমকানোর যথেষ্ট কারণ ছিল কেননা ছবিতে যার মস্তক দেখানো হয়েছে তাকে তিনি চিনতেন এবং এ ঘটনার আগের মুহূর্তে তারা একসঙ্গেই ছিলেন।

www.pathagar.com

লে. আতাউল্লাহ ২৭ বালুচ রেজিমেন্টের ১৫৫ জন অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে বেঁচে যাওয়া ১১ জনের একজন যাদেরকে সংখ্যায় অনেক বেশি বিদ্রোহী বাঙালিরা কুষ্টিয়ায় আক্রমণ করেছিল ও বিপুল সংখ্যক সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিককে হত্যা করেছিল। ১২ এপ্রিল ১৯৭১ সংখ্যার নিউজ উইকে একটি ছবিতে দেখানো হয় একদল লোক হাসিমুখে একটি বিচ্ছিন্ন মাথা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটির শিরোনামে লেখা ছিল বাঙালি বিদ্রোহীরা সরকারি বাহিনীর একজন সৈনিকের বিচ্ছিন্ন মাথা প্রদর্শন করছে, তারা অবশ্যই মরবে। কিন্তু লে. আতাউল্লাহ আমাকে বলেছেন শিরচ্ছেদকৃত যে লোকটির ছবি তিনি ভারতে বন্দি থাকা অবস্থায় দেখেছিলেন তিনি সেনাবাহিনীর কেউ ছিলেন না, ওটি ছিল কুষ্টিয়ায় কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানী সিভিল সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা ওয়াকার নাসিম বাটের ছবি। বাট পশ্চাদপসরণকারী সেনা ইউনিটের সাথে চলে যেতে অস্বীকার করে বলেছিলেন আমি যাদের সাথে দীর্ঘদিন একত্রে কাজ করেছি ও থেকেছি আমার সেই স্বদেশীরা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।[২]

স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঢাকা থেকে ৬ এপ্রিলের পাঠানো সংবাদের জবাব দেয় ৭ এপ্রিল। সংবাদটির খসড়া তৈরি করেন নিকট পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিসকো এবং এটি অনুমোদন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজারস। 'অভিযোগকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানে সেনা অভিযানকে দোষারোপ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সিসকো লক্ষ্য করেছেন যে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী সংবাদ আসছিল।'[৩] হেনরী কিসিঞ্জার তার স্মৃতিকথায় বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন যে সে সময় পাকিস্তানের সাহায্যে চীনের সাথে গোপন কূটনীতি চলছিল যার ফলে আমেরিকা প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা অভিযানের ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেনি বা বিরত থেকেছে, উইলিয়াম রজারস-এর দৃষ্টিতে প্রতিক্রিয়া না দেখানোটাই ভালো সিদ্ধান্ত ছিল কারণ পরস্পর বিরোধী সংবাদ আসছিল সেনা অভিযান ও বাঙালি উগ্রবাদীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।

সেনা অভিযানের অব্যবহিত পরে কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষ্যপ্রমাণ সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটায় এবং এ প্রেক্ষিতে নিক্সন প্রশাসন সতর্কতার সাথে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি ও পাকিস্তানের জনগণকে যে কষ্টের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছে সে ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এ ক্ষেত্রে কোনো একটি পক্ষকে দ্রুত সমর্থন জানানো হতে বিরত থাকা হয়।[৪]

এ অধ্যায়ে দশটি স্থানে সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ও সে সব ঘটনার সম্ভাব্য বর্ণনা করা হয়েছে। স্থানগুলো হচ্ছে: শাখারীপট্টি (পুরাতন ঢাকার হিন্দু এলাকা), জিঞ্জিরা, জয়দেবপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, সান্তাহার, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া ও কুমিলা। এখানে উভয়পক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী, সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী ও সংঘর্ষে বেঁচে যাওয়াদের স্মৃতিকথা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

শাঁখারিপট্টি: ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় সেনাবাহিনীর আক্রমণ

শাঁখারিপট্টি পুরাতন ঢাকার একটি সরুগলি যেখানে ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু শাঁখা ব্যবসায়ীরা বসবাস করতেন এবং এখনো করেন। দোকানের সম্মুখ দিকটা হচ্ছে গলির মুখোমুখি এবং বাসিন্দারা রাস্তার উভয় পাশে অবস্থিত বাড়ির উপরের দিকে বাস করে যার নিচেও সারিবদ্ধভাবে রয়েছে অসংখ্য দোকানপাট। শাঁখার ব্যবসা এখন কমে এসেছে ও অধিকাংশ

www.pathagar.com

দোকান অন্য জিনিসপত্র বেচাকেনা করছে। শাঁখের করাত বা যন্ত্র যা দিয়ে শাখ কাটা হয় তা নিয়ে একটি বিশেষ বাংলা প্রবাদ রয়েছে যেখানে কিনা ওই করাত দুই দিকেই কাটে!

অমিয় কুমার সুরের প্রামাণিক সাক্ষ্য

অমিয় কুমার সুর এখনও পর্যন্ত শাঁখা ব্যবসায় আছেন।তার দোকানে, ঠিক যেখানে তিনি ছোট তক্তপোশের উপর পা ভাঁজ করে বসে থাকেন তার পিছনেই উপরের দিকে ঝুলছে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। তার চারদিকে বিবাহিত হিন্দু মহিলাদের জন্য তৈরি করা ঐতিহ্যবাহী হাতের শাঁখা থাকে থাকে সাজানো। তার পিছনে ছোট ঘরে একজন পূর্ণ মানুষের আকারের মাটির তৈরি হিন্দু দেবী মাতার মূর্তি সহজেই চোখে পড়ে। অমিয় বাবু আমাকে বললেন ১৯৩০ দশকের শেষ দিকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এ এলাকায় এসেছিলেন এবং ঐতিহ্যবাহী 'শংখধ্বনীর' মধ্যদিয়ে মিছিল সহকারে এ গলির ভিতর পদযাত্রা করেছিলেন। অমিয় বাবুর দুই ছেলে অন্য ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে কিন্তু তার ইচ্ছা যে তার কনিষ্ঠ পুত্র তার এ বাবা-দাদার ঐতিহ্যবাহী ব্যবসায় আসুক কারণ তার রক্তের সাথে বরাবরই মিশে আছে এ ব্যবসা।[৫]

১৯৭১ সালে অমিয় কুমার সুরের বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর। মৃদুভাষী অমিয় স্মৃতি হাতড়িয়ে ঈষৎ মুখ বাঁকা করে বললেন- ওই বছরটা ছিল তার জীবনে ভয়াবহ দু:খ ও আনন্দের। ২৬ মার্চ দিনের বেলায় পাক সেনারা আসে শাঁখারীপট্টিতে।[৬] সেনারা বাড়ির ছাদে উঠেছিল। চলিশ নম্বর দোকানের নীলকান্ত দত্ত তার বাড়ির এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছুটে যাচ্ছিল এবং এক পর্যায়ে তাকে খোলা জায়গা অতিক্রম করতে হচ্ছিল; একজন সৈনিক তাকে ছাদ থেকে গুলি করে, অমিয় ও তার পরিবার তাদের বাড়ির ভিতর ছিলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তারা অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান।

এন্থনী ম্যাসকারেনহাস পূর্ব পাকিস্তানে সেনা অভিযানের নিন্দা করে *সানডে টাইমস* -এর প্রতিবেদনে ও পরবর্তীতে তার বইয়ে লিখেছেন, শাঁখারিপট্টিতে পাকিস্তানী সেনারা রাস্তার দুই প্রান্ত বন্ধ করে দেয় এবং বাড়ি বাড়ি খুঁজে শিশু, নারী, পুরুষ হত্যা করে যা ছিল আনুমানিক সংখ্যায় আট হাজার।[৭] এটা কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর দেয়া বর্ণনা নয় ও এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস সেখানে ছিলেনও না এবং তিনি তার লেখায় দেয়া তথ্যের উৎসর কোনো নামও উল্লেখ করেননি; আর তাই যে কোনো বিবেচনায় এ ঘটনার জন্য এ তথ্য সম্পূর্ণরূপে ভুল।

১৯৭১ সালে ম্যাসকারেনহাসের প্রতিবেদন অন্যান্য অনেক বিদেশী সংবাদের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন সব তথ্যের মিশ্রণ দিয়ে তৈরি, যেখানে প্রতিবেদক কি প্রতিবেদনটি বিশ্বস্ততার সাথে উপস্থাপন করেছিলেন নাকি স্রেফ একজনের কাছ থেকে শোনার পর প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল তা বিবেচনা করে দেখার বিষয়। ২৬ মার্চ শাঁখারীপট্টিতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল তা সেখানকার বেঁচে যাওয়া বাসিন্দারাই ভালো বলতে পারতেন। সেখানকার বাসিন্দা যারা সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন ও এখনও বেঁচে আছেন তাদের মতে সেদিনের ঘটনা ছিল খুবই ভয়ংকর। কিন্তু সে কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শাঁখারিপট্টিতে বেঁচে যাওয়া বাসিন্দাদের মতে সেনাবাহিনী প্রত্যেক বাড়িতে তল্লাশি চালায়নি। তারা একমাত্র একটি বাড়িতে প্রবেশ করেছিল যার নম্বর হচ্ছে ৫২। কেউ আমাকে বলতে পারেনি কেন সেনারা ওই বিশেষ বাড়িটিকে লক্ষ্য করে সেখানে প্রবেশ করেছিল, সম্ভবত ওই বাড়িটি অন্য সব বাড়ি থেকে বড় ছিল এবং সম্ভবত তারা ধারণা

www.pathagar.com

করেছিল যে সেখানে ধনসম্পদ বেশি থাকতে পারে। অমিয় সুর নিজে ওই বাড়ির উঠানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মৃতদেহ দেখেছেন যার মধ্যে একটি শিশুও ছিল যে ছিল তার বাবার কোলে। অমিয় সুরের মতে সংখ্যায় মরদেহগুলো চৌদ্দ কিংবা ষোল হবে। অন্য বাসিন্দা যারা বাড়ির ভিতরে ছিল তারা বেঁচে গিয়েছিলেন। এরপর আর কেউ জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তারা শাঁখারীপট্টি ত্যাগ করতে শুরু করেন। অমিয় সুরও দুই একদিন পর বাড়ি ত্যাগ করে চলে যান, ওই দিনটি ছিল রবিবার, কাজেই তিনি ২৮ মার্চ শাঁখারীপট্টি ত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে প্রায় সকলেই শাঁখারীপট্টি ছেড়ে চলে গেলে ওই এলাকা একদম ফাঁকা হয়ে যায়। সে সময় এক ডজন কিংবা তার বেশি মরদেহ সেখানে পড়েছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে অমিয় সুর ফিরে আসেন। তিনি এসে তার ধ্বংসপ্রাপ্ত খালি বাড়ি পেলেন, সম্ভবত বিহারীরা তদের অনুপস্থিতিতে ওই বাড়িগুলো দখল করে রেখেছিল। অমিয় সুর বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যে সাহায্য পেয়েছিলেন তা বেশিও নয় এবং যথেষ্টও নয়, তবে তিনি এ ব্যাপারে নির্বিকার।

অমর সুরের প্রামাণিক সাক্ষ্য

৫২ নম্বর বাড়িতে অমিয় সুর পড়ে থাকা লাশগুলোর মধ্যে যে দুটো লাশ দেখেছিলেন তার একটি চন্দন সুর ও অপরটি তার শিশু পুত্র বুদ্ধদেব সুরের। আমি তাদের কাহিনী চন্দন সুরের বড় ছেলে অমরের কাছে শুনেছি। অমর সুরের দোকানের নম্বর হচ্ছে ৪৭ ওতাদের বাড়ির নম্বর ৫১। ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সুশ্রী চেহারার অধিকারী অমর সুর স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলেন, আর প্রবল রসবোধ সম্পন্ন একজন মানুষ যিনি কিনা চমৎকার করে গল্প বলতে পছন্দ করেন। অমর সুর ও তার পরিবার একদিকে যেমন পাক সেনাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ও নির্যাতিত হয়েছেন, ঠিক একইভাবে স্বাধীন বাংলাদেশেও তার পরিবার ন্যায় বিচার ও ন্যায্য অধিকার থেকে হয়েছে বঞ্চিত।[৮]

১৯৭১ সালে অমর সুর এক দুর্দান্ত বালক যে তার পিতা-মাতা ,চার ভাই ও তিন বোনের সাথে থাকতেন। ২৫ মার্চ রাতে গলির বাইরে প্রচণ্ড গোলাগুলি হচ্ছিল। অমিয় সুরও জানান ওই রাতে গলির বাইরে পুলিশ পোষ্টটিতে হামলা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী প্রকৃতপক্ষে শাঁখারিপট্টিতে ২৬ মার্চ বিকালে পৌছায়। সেনাদের দেখা যায় বাড়ির ছাদে। অমরের পিতা তাকে দেয়াল টপকিয়ে বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়ে দৌড়াতে বলেন। অমর তার এক বাতব্যাধিগ্রস্ত ছোট বোনকে নিয়ে দৌড়ে পালান। তার পিতা সর্বকনিষ্ঠ ভাইটিকে নিয়ে পালাচ্ছিলেন। ওই সময় প্রত্যেকে তাদের জীবনের ভয়ে পালাচ্ছিল, চারিদিকে সৃষ্টি হয়েছিল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির। অমর বলেন পাক সেনারা মহিলাদের কিছুই বলেনি যাদের অনেকেই ঘরের ভিতরে অবস্থান করছিলেন; তারা (পাক সেনা) হত্যা করেছিল কেবল বয়স্ক পুরুষদের।

সেনাবাহিনী চলে যাবার পর অমর বাড়ি ফিরে তার পিতা ও কনিষ্ঠ ভাইয়ের মৃতদেহ দেখতে পান। ৫২ নম্বর বাড়ির ভিতরে চৌদ্দ কিংবা পনের জনের মৃত দেহ পাওয়া গিয়েছিল। অমর জানান তার পিতার মরদেহ তখনও পর্যন্ত দণ্ডায়মান ছিল কাপড় রাখার আলনার পানে মুখ করে এবং ছোট ভাইটি পড়েছিল মেঝেতে। পরে লোকজন লাশগুলোকে ঘরের বাইরে এনে উঠানে নামিয়ে রাখে।

তখন কে যেন চন্দনসুর ও তার শিশু পুত্রটির লাশের ছবি তুললো। অমর জানতে পারেননি কে ছবি তুলেছিল। পরে কেউ একজন তাকে বলে যে ছবিগুলো কোলকাতার একটি

www.pathagar.com

স্টুডিওতে প্রদর্শন করা হয় এবং তারা শরণার্থী হয়ে কোলকাতায় অবস্থান করার সময় ঐ স্টুডিওর মালিক তাদের ছবির একটি কপি দিয়েছিলেন।[৯] পরবর্তীতে খবরের কাগজে ও বইয়ে ছবিগুলো ছাপা হয়েছে।[১০]

অমর সুরের দেয়া তথ্যানুসারে ওই গলির ৫২ নম্বর বাড়িটি গলির কালি মন্দিরের সম্পত্তি। বাড়িটি আশপাশের বাড়িগুলো অপেক্ষা অনেক বড়। ওইদিন সেখানে নিহতদের মধ্যে ছিলেন তার পিতা চন্দন সুর ও অন্য একজন -চিত্ত দা,[১১] আর এ দু'জনই ছিলেন রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় আর বাকীদের রাজনীতির সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। প্রত্যেকেই পালাচ্ছিল। অমর ও তার পরিবারের লোকজন নদীর ওপারে অল্প দূরত্বে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে সেনাবাহিনী সেখানেও পৌঁছে যায়।[১২] লোকজন আবারও সেখান থেকে পালাতে থাকে। অমর সেই পঙ্গু বোনকে কাঁধে নিয়ে ছুটছিল আর তার মা পালাচ্ছিলেন মেজ ভাইটিকে নিয়ে। এরপর এক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে তারা একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুলির আঘাতে এক বোন পড়ে যায়। তারা সকলেই পালিয়ে যাচ্ছিল আর যে গুলিতে আহত হচ্ছিল তাকে ছেড়েই চলে যেতে হচ্ছিল। অমরের কোলে যে বোনটি ছিল তার মাথায় গুলি লাগলে সে মারা যায়। অনেক দিন পর অমর তার মায়ের সাক্ষাত পায় ও তার সেই বোনটির মৃত্যুর খবর মাকে জানায়। তার মা তাকে জানান তিনি তার ভাইকে এক অচেনা পলায়নরত ব্যক্তির জিম্মায় দিয়ে এসেছেন এবং তাকে হারিয়ে ফেলেছেন।

আর মা তাকে বলতে থাকেন তার যে বোনকে গুলি করা হয়েছিল সে নিশ্চয় বেঁচে আছে। অত:পর অমর আবার তার বোনের খোঁজে ফিরে এসে দেখেন কেউ একজন তার বোনটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে এবং গুলি তার শরীরের ভিতরে তখনও রয়ে গেছে। চিকিৎসক অপারেশন করার জন্য টাকা চাইলে অমর চিকিৎসককে ব্যাংক থেকে টাকা এনে দেন। এরপর অমর তার পরিবারের কাছে ফিরে যান। সে সময় একজন পরিচিত মুসলমান অমরকে তার নামের প্রথম অক্ষর 'অ' র স্থলে 'উ' প্রতিস্থাপন করে 'উমর' নামটি রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এরপর অমরের পরিবার নৌকা করে ভারতে পালানোর চেষ্টা করে। একজন দালাল তাদের মাথা পিছু একশ' টাকা দাবি করলে অমর রাজি হয়ে নৌকায় চড়ে বসেন। কিছুক্ষণ পর পাক সেনারা বোট নিয়ে নদীতে টহল দিতে আসলে সকলে আবার পালিয়ে যান। অবশেষে অমররা ভারতে পৌঁছায়। কোলকাতার ব্যারাকপুর ও বউবাজারে বিশাল শাঁখারি সম্প্রদায়ের বাস। সেখানে অমর কোলকাতার রাস্তায় একজন ফেরিওয়ালা হিসেবে ফিতা ও এ জাতীয় পণ্যের ফেরি করা আরম্ভ করেন জীবিকার তাগিদে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তারা জানতে পারেন হাসপাতালে তাদের আহত বোনটিকে অপারেশন করা হয়েছিল এবং ওই চিকিৎসক তাকে এক আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে রেখেছিলেন। অন্যদিকে হারিয়ে যাওয়া ভাইটির কথা ছাপা হয় খবরের কাগজে। এর প্রেক্ষিতে একজন মুসলমান ভদ্রলোক তাদের সাথে যোগাযোগ করে তার কাছে যেতে বলেন এবং নিশ্চিত হতে চান যে যুদ্ধের সময় তার জিম্মায় দেয়া শিশুটি কি তাদের প্রকৃত ভাই কিনা? হ্যাঁ, ওই শিশুটিই ছিল তাদের হারিয়ে যাওয়া ভাই। জানা যায় যে অমরের মা যার কোলে তার শিশুটিকে সেদিন দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন অনেকগুলো সন্তানের এক গরীব পিতা। তিনি ওই শিশুটিকে সন্তানহীন এক ধনী ব্যক্তির কাছে দিয়ে দেন। এ

www.pathagar.com

ভদ্রলোক শিশুটিকে নিজ সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করেছেন। তিনি শিশুটিকে তার প্রকৃত পিতা-মাতার কাছে ফেরত দিয়েছিলেন বটে, তবে তারপরও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন ছেলেটিকে লালন-পালন করার। ফলে এক বন্দোবস্তের মাধ্যমে শিশুটিকে উভয় পরিবারের সাথে থাকার জন্য সময় ভাগ করে দেয়া হয়। এ ভাইটি পরবর্তীতে ভারতে চলে যায়।
অমর সুর এখন খুব হতাশাগ্রস্ত। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশ তাদের কোনো সাহায্যই করেনি যদিও তারা শহীদ পরিবারের সন্তান। তিনি বিশেষভাবে হতাশ যে তাদের বাড়িটি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে এবং তাদের আবেদনে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া তারা পাননি। এমন কি আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ও না, যে দলটিকে সমর্থন দেয়ার জন্য ১৯৭১ সালে এ হিন্দু এলাকাটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

জিঞ্জিরা: সেনা অভিযান ও বেসামরিক লোকের হতাহত হওয়ার ঘটনা

২৬ মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে সেনা অভিযান বন্ধ হয়ে আসলে সম্ভাব্য গোলযোগপূর্ণ অন্য স্থানগুলোর ব্যাপারে সেনা অভিযানে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেনা ইউনিটগুলোর মধ্যে আলোচনা শুরু হয় সেনাবাহিনীর যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।[১৩]
(ব্রিগেড মেজর জাফর খান, হেড কোয়ার্টার): 'হ্যালো ৮৮, নদীর দক্ষিণে জিনজিরা নামে একটি জায়গা আছে- আমি বলছি 'জুলিয়েট' 'ইন্ডিয়া' 'নভেম্বর' 'জুলিয়েট' 'ইন্ডিয়া' 'রোমিও' 'আলফা'-জিনজিরা। জায়গাটি ঠিক নদীর দক্ষিণে। পূর্বে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এখানে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা করা হয়েছে। রোমিও অথবা সিয়েরা ইউনিট এ ব্যাপারে তথ্য পেয়ে থাকবে। এর উপর তোমার নজর দেয়া দরকার। ওভার।'
লে. ক. বাসারত সুলতান, কমান্ডিং অফিসার ১৮ পাঞ্জাব: 'নিশ্চয়ই আমি এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে যাচ্ছি। ওভার '।
ঢাকায় সেনা অভিযান শেষ হলে সেনাবাহিনীর ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে নদীর অপর পাড়ে জিনজিরা যেতে ও বিদ্রোহীদের দমন করতে নির্দেশ দেয়া হয়। সেনাবাহিনীর উপর জিন-জিরা থেকে মর্টার শেলসহ গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল, কাজেই এক রাতে লে. মোহাম্মদ আলী শাহ নৌকায় দুই প্লাটুন সৈনিক নিয়ে নদী অতিক্রম করে জিনজিরার পূর্ব দিকে অবস্থান নেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্য কোম্পানী দিনের আলো শুরু হওয়ার সাথে সাথে হামলা শুরু করে।[১৪] তাদের আশা ছিল বিদ্রোহীরা পালালে পূর্বদিকেই পালাবে।
কিন্তু যা চিন্তায়ও আসেনি তা হলো গুলিবর্ষণ শুরু হলে নিরস্ত্র বেসামরিক লোকজন দিকবিদিক পালানো শুরু করে। ঝাঁকে ঝাঁকে সাধারণ নিরস্ত্র মানুষ লে. মোহাম্মদ আলী শাহের দিকে ছুটে আসছিল। তাই কোনো উপায় না দেখে তাদের খুব চিন্তাভাবনা করে গুলি চালাতে হচ্ছিল জনতার মাথার উপর দিয়ে।
এরপর তারা আবার উল্টোদিকে যেদিক থেকে অন্য কোম্পানীর সৈনিকরা গুলি করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল সেদিকে দৌড় দিচ্ছিল। এ রকম এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ হিসেবে করে গুলি চালাতে হচ্ছিল পাক সেনাদের। এ অভিযানে লে. মোহাম্মদ শাহ্-এর ওয়ারলেস অপারেটর নিহত হন চোরাগোপ্তা গুলিতে। জিনজিরার ওই অভিযানে মর্টারসহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয় এবং বিদ্রোহীরা প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারেনি।

www.pathagar.com

জয়দেবপুর ও গাজীপুরঃ বিদ্রোহী বাঙালি সেনাদের হাতে অবাঙালি সেনা ও তাদের পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড

২৫-২৬ শে মার্চ গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানার ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ঢাকায় আটকা পড়ে যান। ঢাকায় তিনি এসেছিলেন গাজীপুর কারখানার নিরাপত্তা রক্ষা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী ও অন্যান্য অবাঙালি পরিবারের সদস্যদের ঢাকায় নিয়ে আসার জন্য জেনারেল টিক্কা খানের কাছে কমপক্ষে এক কোম্পানী পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিকের জন্য সনির্বন্ধ মিনতি জানাতে।[১৫] ২৬শে মার্চ ঢাকা যখন সেনা অভিযানের আওতায় তখন ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ গাজীপুরে ওয়্যারলেসযোগে জানতে পারেন যে কারখানার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা মেজর আসাদ লতিফ যাকে তিনি ভালোভাবেই চিনতেন তার অধীনে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট থেকে এক প্লাটুন সৈনিক সেখানে এর মাঝেই পৌঁছে গেছে।

২৭-২৮ মার্চ ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ গাজীপুরে ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নতুন কমান্ডিং অফিসার লে. ক. রকিব ও অন্যান্যদের থেকে খবর পান তিনি যেন শীঘ্র কারখানায় ফিরে যান। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা ব্যতীরেকে তাকে সেখানে না যাবার পরামর্শ দেয়া হয় এবং কোনো পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিক সে সময় হাতের কাছে ছিল না। ২৯ মার্চ সকালে গাজীপুরে পাকিস্তানী সমরাস্ত্র কারখানায় ওয়্যারলেস বিকল হয়ে যায় এবং জয়দেবপুরে ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথেও যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। পিছনের কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ গাজীপুরে তার পশ্চিম পাকিস্তানী ও অন্যান্য অবাঙালি সেনাদের জন্য আতংকিত হয়ে পড়েন। এর কিছুক্ষণ পরেই ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব নিশ্চিত করেন যে জয়দেবপুরে ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছে।

ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার আরবাবসহ অন্যান্য অফিসার ও ৮ বালুচ রেজিমেন্টকে সাথে নিয়ে জয়দেবপুরের পথে রওনা হওয়ার সময় বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে (চট্টগ্রামস্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের কমান্ডান্ট) সাথে নেয়া হয় যাতে তিনি (ব্রিগেডিয়ার মজুমদার) লাউডস্পীকারের মাধ্যমে বাংলায় বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করার অনুরোধ করতে পারেন। ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর সফিউল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আগেই ২৫ মার্চ জয়দেবপুর পরিদর্শন করে সৈনিকদের বলেছিলেন সৈনিক হিসেবে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের আদেশ মেনে চলা।[১৬] ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ'র গ্রন্থিত লগ থেকে ২৯ মার্চ জয়দেবপুর ও গাজীপুরে যা ঘটেছিল তার একটি পরিপূর্ণ চিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়।

জয়দেবপুর রাজবাড়ি যেখানে ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট অবস্থান করছিল সেখান থেকে সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ান তাদের সব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে চলে গিয়েছিল। কেবলমাত্র একজন ক্যাপ্টেনসহ বাঙালি কমান্ডিং অফিসার লে. ক. রকিব সেখানে অবস্থান করছিলেন সাদা পোশাকে। কখন ও কীভাবে সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ানটি পালিয়ে যায় সে বিষয়ে লে. ক. রকিব না জানার ভান করেন। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহর রেকর্ড অনুযায়ী- 'পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নিতে সিনিয়র জেসিও জেসিওদের বাসস্থানের দিকে দৌড়ে যান। শীঘ্রই ওই সব কোয়ার্টার থেকে শোনা যায় হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া কান্নার শব্দ। জেসিও-র পরিবারের

www.pathagar.com

সকল সদস্যকে (৮জন) নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তারপর রাজবাড়ি খোঁজা হয় তন্নতন্ন করে। সেখানে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও সৈনিকদের হত্যা করা হয়েছিল পৈশাচিকভাবে। আরো দশটি মরদেহ উদ্ধার করা হয় এবং অন্য যারা নিখোঁজ হয়েছিল তাদের রক্তমাখা কাপড়-চোপড় পাওয়া য়ায় ওই রাজবাড়িতে।'

ওই সময়ের বাঙালিদের মধ্যে উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মজুমদার পরবর্তীতে তার স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন যাতে দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন কীভাবে রাজনৈতিক দরকষাকষির মাঝে তিনি শেখ মুজিবকে পাক সেনাবাহিনীর উপর আগবাড়িয়ে বা প্রথমে বাঙালিদের দ্বারা আক্রমণ পরিচালনার জন্য রাজি করাতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি আরো লিখেছেন- ওই বছরের পরের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি হিসেবে থাকাকালীন তাকে কীভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল, কিন্তু তার ওই স্মৃতিকথায় কোথায়ও তিনি যে ২৫ ও ২৯ মার্চ জয়দেবপুর পরিদর্শন করেছিলেন তার উল্লেখ করেননি।

২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. ক. মাসুদ উল হোসেন খান যাকে ২৩ মার্চ ঢাকায় বদলি করা হয়েছিল তিনিও ওই সময়ের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে যা প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ও পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানে তার বন্দি জীবন ও অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। লে. ক. মাসুদ লিখেছেন ২৫-২৬ মার্চ রাতে তিনি ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর সফিউল্লাহকে ঢাকা থেকে ফোন করে জয়দেবপুর ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছেন মেজর সফিউলাহ তার ফোন পাওয়ার পর অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ তার সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ান নিয়ে চলে যান।[১৮]

মেজর (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) সফিউল্লাহ এ ফোন কল পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন তার লেখায়, কিন্তু দাবি করেছেন তিনি আগে থেকে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং সে হিসেবে তার সৈনিকদের সব ধরনের প্রস্তুতির মধ্যে রেখেছিলেন বিদ্রোহের জন্য মার্চ মাসের শুরু থেকেই। পরবর্তীতে '২৭ মার্চ কমান্ডিং অফিসার হিসেবে আমি জয়দেবপুর, গাজীপুর ও রাজেন্দ্রপুর যাই বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলগুলোকে তত্ত্ব তালাশ করতে এবং প্রত্যেককে আমাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে বলি কীভাবে তাদের নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করে ময়মনসিংহে আবার একত্রিত হতে হবে। সে পরিকল্পনানুযায়ী সকলেই ২৮ মার্চ নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করে এবং ২৯ মার্চ ময়মনসিংহ পৌঁছায়।'[১৯]

সফিউল্লাহ 'তার পরিকল্পনানুযায়ী' জয়দেবপুর ত্যাগ করে চলে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে তার লেখা বাংলা নিবন্ধে একদম নীরব থেকেছেন। তিনি তার লেখা একটি ইংরেজী বইয়ে লিখেছেন যে তিনি আগেই চলে যান এবং রাতে ব্যাটালিয়ানের অন্য সদস্যদের সমন্বয় করে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেখে যান মেজর মঈনুল হোসেনকে। অন্যরা সবাই মুক্তাগাছায় চলে আসার পর 'সংঘাতপূর্ণ' পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন রিয়াজের 'ক্রসফায়ারে' নিহত হওয়ার খবরে তিনি 'বেদনা' অনুভব করেন বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ জয়দেবপুরে অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা ও তাদের পরিবার-পরিজনদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে তিনি তার বইয়ে কিছুই উল্লেখ করেননি।[২০]

এদিকে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ক্যাপ্টেন নিয়াজীর নেতৃত্বে একটি কোম্পানী নিয়ে গাজীপুরের উদ্দেশে রওনা হন এবং সেখানে যে সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহীরা কারখানা দখল করে রেখেছিল

www.pathagar.com

তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কারখানাটি দখল করার পর তারা দেখেন যে চারজন ছাড়া (যুদ্ধে কয়েকজন নিহত হয়েছিল) সকল বাঙালি সেনা সদস্যরা পালিয়ে গেছে। এ চারজন যারা পালাতে পারেনি ও পালিয়ে যাওয়া বাঙালিদের পরিবারের সদস্যরা এসময় কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এ ভয়ে যে তাদের সবাইকে হয়তো হত্যা করা হবে; কিন্তু তাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করা হবে না। ঘটনাস্থলে বেঁচে যাওয়া পশ্চিম পাকিস্তানী ও অন্যান্য অবাঙালিদের ভাষ্য অনুযায়ী সে দিন বিদ্রোহী বাঙ্গালীরা যা করেছিল তা ছিল অবর্ণনীয়।

তাদের মতে, বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈনিকরা বিদ্রোহ করলে তারা মেজর আসাদ লতিফকে গোলাবারুদাগার এলাকায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারা ওয়্যারলেস অপারেটর নায়েক মোহাম্মদ শরীফকেও হত্যা করে। বিদ্রোহীরা অস্ত্রশস্ত্র,গোলাবারুদ ও মোটরযান নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে নেয় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বাংকার নির্মাণ করে। এরপর তারা সকল পশ্চিম পাকিস্তানী ও অবাঙালি সেনা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যার উদ্দেশ্যে প্রতিটি অংশে অভিযান চালায়। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ৮ বালুচের এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছানোর পূর্বেই বাঙালি বিদ্রোহীরা হত্যা করে একজন নারী ও শিশুসহ পাঁচজনকে ।

মেজর আসাদের মরদেহ পাওয়া যায় ম্যাগাজিন এলাকায়। তার শরীরের তিনজায়গায় গুলি করা হয়েছিল যথাক্রমে গলা, পেট ও বাম বাহুতে। মুখমণ্ডল ছাড়া বাকী দেহটা ছিল কাটা ছেড়ায় ছিন্নভিন্ন। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ মেজর আসাদের মরদেহ দাফন করার জন্য ঢাকা পাঠান। অন্যদের দাফন করা হয় ওই কারখানায়।[২১]

গাজীপুরের ঘটনা সম্পর্কে বিদ্রোহী ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর সফিউল্লাহ লিখেছেন, কোম্পানীটি পালাতে চেষ্টা করলে মেজর আসাদ লতিফ 'তাদের থামাতে চেষ্টা করেন। তখন আমাদের সৈনিকদের সামনে মেজর আসাদকে হত্যা করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না'। এটা স্পষ্ট নয় মেজর লতিফ একা কীভাবে বিদ্রোহীদের থামানোর চেষ্টা করেছিলেন বা কেনইবা তাকে সেখানে বন্দি করে রাখা হয়নি? মেজর সফিউল্লাহ স্বীকার করেছেন টাঙ্গাইলে অবস্থানরত পশ্চিম পাকিস্তানী কোম্পানী কমান্ডারকেও নিরস্ত্র করা হয় এবং বাঙালিরা তাকে সেখানে হত্যা করে।[২২]

মেজর সফিউল্লাহর দেয়া বর্ণনানুযায়ী জয়দেবপুরে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যার জন্য ওখানে অবস্থানরত অন্য একজন বাঙালি অফিসার দায়ী। যা হোক, ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দলত্যাগী নেতা হিসেবে মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর মতামত নেয়া আকর্ষণীয় হতে পারে যে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার প্রক্রিয়া কি কারণে, কি জন্য জয়দেবপুর, গাজীপুর ও টাঙ্গাইলে অবস্থানরত নিরস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা ও তাদের পরিবার-পরিজনদের হত্যায় ইন্ধন জুগিয়েছিল? মেজর খালেদ মোশাররফও বিদ্রোহ করেছিলেন, কিন্তু তার ইউনিটের পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের তিনি বরং ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।

খুলনা: জুট মিলে বাঙালিদের হাতে বিহারী হত্যাকাণ্ড

রুস্তম আলী সিকদার যিনি খেলোয়াড় কোটায় পিওন সুপারভাইজার হিসেবে ক্রিসেন্ট জুট মিলে নিয়োগ পেয়েছিলেন, তিনি সেই ১৯৫৩ সাল থেকেই আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।[২৩] তার দাবি অনুযায়ী তার সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল, অন্যদেরও সামরিক

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং ১৯৬৯ সালেই ৪০০ সদস্যের একটি বাহিনী তিনি সংগঠিত করেছিলেন। তারা ১৯৭১ সালে মার্চের প্রথম সপ্তাহে মাঠে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। তারা মিল গেটে ব্যারিকেড স্থাপন করেছিলেন যাতে সেনাবাহিনী মিলে ঢুকতে না পারে এবং বাঙালি বা বিহারী শ্রমিকরা যাতে মিল থেকে বের না হতে পারে। তারা যোগাযোগ রেখেছিলেন বাঙালি পুলিশ ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ সদস্যদের সাথে, কিন্তু তাদের কাছে ছিল শুধুমাত্র পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র আর তা তারা পেয়েছিলেন মিলের নিরাপত্তা কর্মীদের কাছ থেকে।

প্রথম দিকে তারা বাঙালি ও বিহারীদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য বিহারীদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন, কিন্তু এক রাতে ক'জন বিহারী পান আনার অজুহাতে মিলের বাইরে গেলে রুস্তম আলী সিকদার ও অন্য বাঙালিরা এ যাওয়াটা সহজভাবে গ্রহণ করেনি (যদিও তারা তাদের সন্দেহের পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো কারণ বের করতে পারেনি)।

মিলের স্পিনিং বিভাগের প্রবীণ আব্দুর রব সর্দারেরও দাঙ্গা হাঙ্গামার অভিজ্ঞতা আছে কারণ তিনি আওয়ামী লীগ ও মুসলীম লীগের (বিহারী) একাধিক দাঙ্গায় জড়িত ছিলেন।[২৪] ১৯৭১ সালে দৌলতপুর থানার বাঙালি পুলিশ অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। একই ধরনের কাহিনী অন্যান্য থানা থেকেও শোনা গিয়েছিল। সে সময় জুট মিলে "শান্তি কমিটি" গঠন করা হয়েছিল বাঙালি ও বিহারী উভয় সম্প্রদায়ের পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে যারা লাঠি দিয়ে মিল পাহারা দিত। আব্দুর রব সর্দারের ভাষ্য অনুযায়ী মিল ম্যানেজার রহমতউল্লাহ ও অন্যান্য অফিসাররা ছিলেন ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের এবং তারা সব সময় ন্যায় বিচারের পক্ষে থাকা ও মিলে কর্মরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন।[২৫] ২৪ মার্চের রাত থেকেই মিলের বাইরে গোলাগুলি শুরু হয় এবং পরদিনই সেনাবাহিনী ওই এলাকায় পাহারা দেয়া শুরু করে। তবে মিল গেটে লোহার বীম দিয়ে স্থাপিত ব্যারিকেড থাকার জন্য সৈন্যরা মিলে প্রবেশ করতে পারেনি। দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা যারা অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছিলেন তারা নদী দিয়ে মিলের পিছনে আসেন এবং একটি পানির ট্যাংকের উপর অবস্থান নেন।

একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল পিপলস্ জুট মিলে। ২৭ মার্চ বিহারীরা তাদের কোয়ার্টারে ড্রাম বাজাতে শুরু করে। সর্দারের মতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০ জন। সংখ্যার দিক থেকে বিহারীরা ছিল অনেক বেশি, কিন্তু ওই দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা ও আরো কয়েকজন বাঙালি বিহারীদের দিকে গুলি করলে কয়েকজন বিহারী আহত হয় এবং অন্যরা আতংকিত হয়ে পড়ে। এরপর উত্তেজিত বাঙালি জনতা হাতের কাছে যা পায় যেমন দা ইত্যাদি তাই নিয়ে বিহারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে নির্বিচারে হত্যা করে নারী, পুরুষ ও শিশুদের। তাদের মৃতদেহগুলো ফেলে দেয়া হয় নদীতে। সর্দারের ধারণা একই ঘটনা অন্য জুট মিলেও ঘটেছিল। লাশগুলো ফেলে দেয়ার পর তিনি ওই রাতে খুলনা ত্যাগ করে বরিশাল চলে যান ও সেখান থেকে ভারতে পৌঁছে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

আমি সর্দারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওই দিন কতোজন বিহারী পুরুষ, নারী ও শিশু নিহত হয়েছিল- এক ডজন? শত শত? এক হাজার? 'তাতো হবেই', তিনি বললেন এবং সহজেই একমত হয়ে জানালেন এক হাজার এবং তারপর নিম্নস্বরে ও আকার ইঙ্গিতে বোঝালেন প্রকৃতপক্ষে তার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি। অল্পসংখ্যক আক্রমণকারী বাঙালিও ওই ঘটনায় মারা গিয়েছিল।

www.pathagar.com

খুলনার বাইরে খালিশপুরের নিউ কলোনীর বেঁচে যাওয়া বিহারীরা আমাকে তাদের ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা কথা বলেছেন। দুই বা তিনজন তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন ও এদের মাঝে কেউ কেউ মাথা ঝাঁকিয়ে বা আরো তথ্য যোগ করে বর্ণনাটা আমাকে পরিষ্কার করে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন।[২৬] তবে প্রত্যেকে একমত হয়েছিলেন যে সবচেয়ে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ক্রিসেন্ট জুট মিলে ও তারপরই ছিল পিপলস্ জুট মিল। মার্চের প্রথম দিকে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর রাস্তায় কয়েকজন বিহারীকে হত্যা করা হয়েছিল, ২৮ মার্চ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল মিলের ভিতরে। বিহারীরা জানান সে সময় বাঙালিরা 'ফাঁসির মঞ্চ' তৈরি করে সেখানে বিহারীদের ঝুলিয়ে হত্যা করে।[২৭] সেনাবাহিনী সেখানে পৌঁছলে বেঁচে যাওয়া বিহারীরা পাকিস্তান সরকারের কাছে হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করে। কতগুলো মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল-এর জবারে বিহারীরা বলেন- 'লাখোন' (লাখো)। যেহেতু বাঙালিরাই স্বীকার করেছেন কয়েক হাজারের, তাহলে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যেতে পারে সেখানে ওই একটি ঘটনায় কয়েক হাজার বিহারী নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করেছিল বাঙালিরা ।

৭ মার্চ শেখ মুজিব ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ওতে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকেন। ঠিক সে সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সবুর খানের বাড়ির উল্টোদিকে অবস্থিত খুলনা সার্কিট হাউসে ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের মেজর শামিন জান বাবর অবস্থান করছিলেন।[২৮] তিনি ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের যশোর সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন। গোলযোগের সূত্রপাত হয়েছিল ১ মার্চের পরই। এর পরপরই পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের শাসন শুরু হয়ে যায়। সেনাবাহিনীকে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরেই থাকতে পরামর্শ দেয়া হয় এবং কোনো কিছুতেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করতে বা সাড়া না দিতে বলা হয়। ২৪ মার্চের রাতে খুলনায় বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে শুরু হয় সমন্বয়হীনভাবে বিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণ। ২৫ মার্চ মেজর শামিন জান বাবরকে খুলনা শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। খুলনা রেডিও স্টেশনে সেনাবাহিনীর যে ইউনিটকে পাঠানো হয়েছিল সেটি অতর্কিত হামলার কবলে পড়লে কয়েকজন সৈন্য প্রাণ হারান কিন্তু মেজর বাবর জানান বিদ্রোহীদের নিহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং বাকীরা পালিয়ে গিয়েছিল।

খুলনা নিয়ন্ত্রণে আনতে এক সপ্তাহ বা ওই রকম সময় লেগেছিল। মেজর বাবর নৌকায় নদীপথে মিল এলাকা দেখতে গিয়েছিলেন। নদীতে অগণিত পঁচা ফুলে ওঠা মানুষের দেহতে মেজর বাবরের নৌকা ধাক্কা খায়। এতে তার মতো একজন অদম্য সৈনিকও ওই ভয়াবহ দৃশ্য থেকে দৃষ্টি সড়িয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিলের ভিতরে তিনটি কসাইখানা বানিয়েছিল বাঙালি শ্রমিকরা। হত্যাকাণ্ডের জন্য গিলোটিনের ন্যায় একটা স্থাপনা সেখানে তৈরি করা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা ও অত্যাচার করার জন্য সেখানে বেশ কিছু যন্ত্রপাতিও পাওয়া গিয়েছিল। মেঝে ছিল রক্তের আবরণে ঢাকা। পরে মেজর বাবর সেনা প্রধান জেনারেল হামিদ ও পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল নিয়াজীকে ওই কসাইখানায় নিয়ে এসে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। 'আমি তাদের বলেছিলাম -কেন ওইসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া হয়নি এবং তারা আমাকে বলেন যে, সরকার বাঙালিদের বিরুদ্ধে কোনো 'পাল্টা প্রতিশোধের' ঘটনা ঘটুক তা চায়নি বলেই ওইসব চেপে যাওয়া হয়েছে।'

খুলনা নিয়ন্ত্রণে আসার পর মেজর বাবর বেনাপোলে এক কোম্পানী সৈন্যের কমান্ড নিয়ে

www.pathagar.com

মাঠ পর্যায়ে যুদ্ধের দায়িত্ব পালন করেন ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ হায়াতের অপরাজিত ১০৭ ব্রিগেডের অন্যান্য সকল ইউনিটের সাথে। ঢাকায় আত্মসমর্পণের পরদিন পর্যন্ত তারা খুলনার আশপাশে যুদ্ধ চালিযে যান যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাদের যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয় পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ড থেকে।

আমি খালিশপুরের নিউ কলোনীর বিহারীদের জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা বছরের পরের দিকে বাঙালিদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিল কিনা। তারা জানান 'এটা কীভাবে সম্ভব? কেননা আমরা চারিদিকেই তো বাঙালিদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে ছিলাম'। মেজর বাবর বলেন তিনি শুনেছেন বিহারীরা প্রতিশোধ নিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকার জন্য তার কোনো ব্যক্তিগত ধারণা ছিল না। প্লাটিনাম জুট মিলের একজন বাঙালি ম্যানেজার আমাকে মিলের একটি স্থান দেখান, যেখান থেকে বিহারী শ্রমিকদের একটি 'ডেথ স্কোয়াড' হারুণ নামে একজন বাঙালি লাইন সর্দারকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওই বাঙালি ম্যানেজার তাদের অনুসরণ করে মিলের কর্ণার পর্যন্ত যাওয়ার পর আর সামনে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ তার পরই ছিল মিলের বয়লার। ম্যানেজার ওই 'ডেথ স্কোয়াড' ও হারুণকে আর দেখতে পাননি, কিন্তু তিনি ও সকল বাঙালিই বিশ্বাস করেছিলেন যে হারুণের জীবন ওই বয়লারের ভিতরেই শেষ হয়ে গেছে। ম্যানেজারের মতে এ ঘটনার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যেমন বাঙালিরা ছিল বিহারীদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। যদি বাঙালিরা প্রতিরোধ তৈরি করতো তবে কোনোভাবেই একজন বাঙালিকে ওই রকম ছোট একটি দল এভাবে নিয়ে যেতে পারতো না। কিন্তু দু:খজনক ব্যাপার ছিল যে তারা সবাই বসে বসে দেখছিল এবং কেউ একজনও হাত তুলে অসহায় হারুণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

ময়মনসিংহ: সেনানিবাসে বিদ্রোহ ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যাকাণ্ড

পূর্ব পাকিস্তান সংকটের উপর পাকিস্তান সরকারের ১৯৭১ সালে আগস্টে প্রকাশিত *শ্বেতপত্রে* ব্যাপক নৃশংসতার যে তালিকা দেয়া হয়েছিল তা পাঠকদের জন্য ছিল এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। একটি ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছিল এভাবে: ২৭ মার্চ ময়মনসিংহ সেনানিবাসে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট/ ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ বিদ্রোহ করে এবং তারা তাদের সহকর্মী পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও আবাসিক ভবনগুলোতে আরো যারা ছিলেন তাদের নির্বিচরে হত্যা করে। শ্বেতপত্রে ডিস্ট্রিক্ট জেল এবং শাঁখারিপাড়া ও অন্যান্য নয়টি কলোনীর পুরুষদের হত্যা করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। সকল পশ্চিম পাকিস্তানী ও অবাঙালি মহিলাদের জোর করে ধরে এনে মসজিদ ও স্কুলে জমা করা হয়েছিল এবং ২১ এপ্রিল সেনাবাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ নিলে ওই সব মহিলাদের সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়।[২৯]

ময়মনসিংহ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কয়েকজন পাকিস্তানী অফিসারের স্মৃতিচারণ নিয়ে আমি ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর- এ বিষয়টি উত্থাপন করলে তারা আমাকে প্রথমদিকে জানান যে ওই সময় ময়মনসিংহে কোনো সেনানিবাস ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে-ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ ও ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারকেই ময়মনসিংহে স্থানীয়ভাবে সকলে 'ক্যান্টনমেন্ট' বলত। ময়মনসিংহ শহরের একজন প্রবীণ ভদ্রলোক মুহাম্মদ আব্দুল হক আমাকে ক্যান্টমেন্টের ওই স্থানটি দেখিয়েছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে সেখানে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী অফিসারদের হত্যা করা হয়।

অন্য একজন বাসিন্দা শেখ সুলতান আহমেদ যিনি আবেগে-আপ্লুত হয়ে বর্ণনা করেন

www.pathagar.com

কীভাবে তিনি সে সময় জনতার একজন হয়ে ক্যান্টনমেন্ট ঘিরে চিৎকার দিয়ে ভিতরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তাদের সহকর্মী বাঙালিদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন। আহমেদের দেয়া তথ্যানুযায়ী ঢাকায় সেনা অভিযানের খবর ময়মনসিংহে পৌছানোর পরপরই ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাঝে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। বাঙালিদের পক্ষ নিয়ে হাজার হাজার স্থানীয় বাঙালি জড়ো হয় ক্যান্টনমেন্টের বাইরে। তবে ওই ঘটনায় কোনো বেসামরিক লোক হতাহত হয়নি। ভিতরে বেশ দীর্ঘ সময় ধরেই সংঘর্ষ চলে- পশ্চিম পাকিস্তানীরা যতোক্ষণ পেরেছিল ততোক্ষণ প্রতিরোধ করেছিল। তিনি যে হিসেবে দিয়েছিলেন তাতে আনুমানিক একশ' জন পাকিস্তানী অফিসার ও সৈনিক সেখানে নিহত হয়েছেন।

আহমেদ আরো দাবি করেছেন দাঙ্গার পর তিনি ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে সেনা কর্মকর্তাদের মৃতদেহ দেখেছেন। কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী পালানোর চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের কেটে হত্যা করে। আহমেদ ব্যক্তিগতভাবে ক্যান্টনমেন্টে একজন লোককে দেখেছেন যিনি বিক্ষুব্ধ জনতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে হাত জোর করে প্রাণ ভিক্ষা চাইছিলেন আর বলছিলেন সেখানে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা আছে, কিন্তু তাকেও হত্যা করা হয়েছিল গুলি করে ও দা দিয়ে কুপিয়ে। আহমেদ জানান, ওই দৃশ্য দেখে তার দারুণ কষ্ট হয়েছিল। তিনি আরো জানান নারী ও শিশুদের হত্যা করা হয়েছিল, অনেক নারীকে হত্যা করা হয়েছিল ধর্ষণ করে। আবার কয়েকজনকে অন্য বাঙালিরা উদ্ধার করে অন্যান্য অফিসারদের সাথে নিকটস্থ জেলখানায় রেখেছিল।[৩০]

সান্তাহার: বাঙালি দ্বারা বেসামরিক অবাঙালি হত্যাকাণ্ড

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) শওকত কাদির লিখেছেন 'সময়টা ছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, যা বর্তমানে বাংলাদেশ, সেখানকার উত্তর অঞ্চলের একটি ছোট্ট শহর সান্তাহারে, যেখানে সর্বাধিক সংখ্যায় বিহারীরা বসবাস করতো সেখানে আমার ব্যাটালিয়ন পৌছায়। প্রথম যে জিনিসটা লক্ষ্য করলাম তা ছিল প্রকট পঁচা দুর্গন্ধ যা বাতাসে ছড়িয়ে ছিল আর নাক বন্ধ হয়ে আসছিল। এ দুর্গন্ধ ছিল মৃত মানুষের পঁচা শরীরের'।[৩১]

'এপ্রিল মাসের অন্য একদিন একজন তরুণ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট যিনি ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টে সদ্য বদলি হয়েছিলেন তিনি ও একজন মেজর ট্রেনে রাজশাহী থেকে নওগার পথে তাদের ইউনিটে যোগ দেয়ার জন্য ভ্রমণকালে আচমকা তাদের নাকে মরা মানুষের পঁচা বিকট দুর্গন্ধ প্রবেশ করে। ওই স্থানে রেল লাইনের ফাঁকে ফাঁকে মরা মানুষের লাশ পড়ে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সদ্য আগত দুই জন অফিসারই এ অবস্থা দেখে চমকে উঠেন। তাদের জানান হয়েছিল যে ওই জাগয়াটির নাম সান্তাহার।'[৩২]

'পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটলে ২০৫ ব্রিগেডকে সেখানে পাঠান হয়। ব্রিগেড মেজর আনিস আহমেদ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় এসেছিলেন বিমানে এবং তার ইউনিটের অধিকাংশ চট্টগ্রামে পৌছায় সমুদ্রপথে। আনিস ঢাকা পৌছলে একজন জেসিও জয়দেবপুর থেকে ঢাকায় এসে মেজর আনিসকে জানায় যে ইবিআর জয়দেবপুরে বিদ্রোহ করে সকল পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও তার নিজেরসহ অন্যদের পরিবার-পরিজনকে হত্যা করেছে'।[৩৩]

এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকায় অবস্থানরত মেজর আনিসকে তার ইউনিটসহ বগুড়া যাওয়ার

www.pathagar.com

নির্দেশ দেয়া হয়। তারা রওনা হন ট্রেনে চড়ে। সান্তাহারে পৌছানোর অনেক দূর থেকেই তারা মরা মানুষের বিকট পঁচা গন্ধ পাচ্ছিলেন। মেজর আনিসের ইউনিটটি স্টেশনের কাছাকাছি আসতেই তারা রেললাইন ও প্লাটফরমে লাশের স্তুপ দেখতে পান। তারা সেখানে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। সেখানে বেঁচে যাওয়া বিহারীরা ওই সেনা ইউনিটকে জানিয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সেখানে কি ঘটেছিল'।

১৩ এফ এফ-এর ক্যাপ্টেন (ব্রিগেডিয়ার) কাদির ভৌতিক শহর সান্তাহারের ঘরে ঘরে লাশ খোঁজার সেই ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তল্লাশিকালে একটি ভবনের দরজা খুলতে তাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। 'অবশেষে দরজা খুলতে সক্ষম হয়ে যা দেখেছিলাম তা ছিল আমার জীবনের এক অদ্ভুত, সবচেয়ে আতংকজনক ও কদাকার দৃশ্যাবলী দেখার অভিজ্ঞতা। দশ ফুট লম্বা আর বার ফুট চওড়া একটি ছোট ঘর ভর্তি ছিল শিশুদের লাশে, যাদের বয়স ছিল কয়েক মাস থেকে কয়েক বছরের মধ্যে। দেখে মনে হয়েছিল ওই সব শিশুদের পা ধরে তাদের মাথা দেয়ালে আছড়ে মারা হয়েছিল কেননা দেয়ালের গায়ে সর্বত্র মগজ ও মাথার খুলি লেগে থাকতে আমরা দেখেছিলাম। আমরা ওই সব শিশুদের লাশগুলো দাফন করার সময় গুণে দেখেছি যে ওখানে ছিল চৌত্রিশটি শিশুর লাশ'।[৩৪]

তবে ব্রিগেডিয়ার কাদির এও জোর দিয়ে বলেন যে , 'এ সবের অর্থ এই নয় যে সরকারি বাহিনী অন্য কোনো দোষে দোষী ছিল না বা আতংকজনক কোন তৎপরতার সাথে জড়িত ছিল না, কিন্তু যে ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি তার সাথে অন্য কিছুর তুলনা চলে না।' সান্তাহারে এ ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার কাদিরের একজন লোক বাঙালি উগ্রবাদীদের মাথা ওইরূপ ফাটাতে চেয়েছিল। ঈশ্বরদির পর রাজশাহী যাওয়ার পথে একটি রেল জংশনে ঘটে যাওয়া অনুরূপ একটি ঘটনার কথা বলেছেন ১৮ পাঞ্জাবের ক্যাপ্টেন সারওয়ার।[৩৫] সেই জংশনে বিহারীদের রেলওয়ের কোয়ার্টারগুলোর মাঝখানে একটি পুকুর ছিল। ক্যাপ্টেন সারওয়ার জানান তিনি ও তার সহকর্মীরা দেখেছেন ওই পুকুরটি পুরুষ, মহিলা ও বাচ্চাদের মৃতদেহে পূর্ণ ছিল এবং পুকুরটির আশে-পাশেও অগণিত লাশ ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা দেখে মনে হয়েছিল যে এদের হত্যা করতে ব্যবহার করা হয়েছে দা, ছোরার মতো অস্ত্রের। ক্যাপ্টেন সারওয়ার জানান ওই দৃশ্য দেখে তার এক সহকর্মী অফিসার রাগে ও শোকে 'পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন'। তারা ওই লাশগুলোর ছবি তুলে তাদের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন অফিসারকে দিয়েছিলেন। 'পরবর্তীতে অন্যান্য অফিসারও আমাকে জানিয়েছেন যে ওই পুকুরের লাশগুলোর ছবির কথা এখনো তাদের মনে আছে, কিন্তু তারপরও মনে হয় না যে ওই ছবিগুলো কোনো সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল'।

পাকিস্তান সরকারের 'শ্বেতপত্রে' সান্তাহার নওগায় নিহত বিহারীদের সংখ্যা পনের হাজার (১৫০০০) বলে উলেখ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম: বিশৃঙ্খলার পথে

'নৈরাজ্য- প্রত্যেকে অন্যদের প্রতি যা ইচ্ছে তাই করছিল।' মার্চের শেষের দিকের পরিস্থিতি সম্পর্কে এটাই ছিল সংক্ষেপে একজন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তার সোজা সাপটা বিশ্লেষণ। কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ২৫ মার্চ জেনারেল টিক্কার একটি টেলিফোন কল পান:[৩৬] বাঙালি সৈন্যরা চট্টগ্রামে বিদ্রোহ করেছে এবং সেখানে তার এখনই

www.pathagar.com

যাওয়া দরকার। ব্রিগেডের ইউনিটগুলোর অধিকাংশই উত্তরে সিলেট থেকে দক্ষিণে প্রসারিত চট্টগ্রাম পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কুমিল্লায় ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী ইউনিটকে রেখে ব্রিগেডিয়ার শফি লে. ক. শাহপুরের নেতৃত্বে ২৪ এফ এফ কে নিয়ে ওই রাতে চট্টগ্রামের পথে রওনা হয়ে যান। একশ' মাইল দূরত্বের এ পথে যেখানে দুটি বড় নদী রয়েছে সেখানে পায়ে হেঁটে ও যেখানে ব্রীজ ধ্বংস হয়ে গিয়াছিল সেখানে দেশী নৌকায় পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামে পৌছাতে হতো। এদিকে ওয়্যারলেস সেটও গিয়েছিল বিকল হয়ে। দলটি চট্টগ্রামের কাছে পৌছালে লে. ক. শাহপুর চোরাগোপ্তা গুলিতে নিহত হন।

মেজর জেনারেল মিঠা লিখেছেন 'সবকিছুই পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছিল। কেবলমাত্র ব্রিগেডিয়ার শফির নেতৃত্বে যে দলটি কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের পথে রওনা হয়েছিল তার সাথে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিল না।' তিনি হারিয়ে যাওয়া ইউনিটটিকে হেলিকপ্টার নিয়ে খুঁজছিলেন এবং অবশেষে চট্টগ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে ওই ইউনিটটিকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। 'ব্রিগেড কমান্ডার (ইকবাল শফি, আমি যদি ঠিকভাবে স্মরণ করতে পারি) আমার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন ... তার সাথে ছিল মাত্র একটি ব্যাটালিয়ান এবং ব্যাটালিয়ান কমান্ডার লে. ক. শাহপুর মাত্র দশ মিনিট আগে নিহত হয়েছেন। তাকে খুব শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল... তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই এবং যত শিঘ্র সম্ভব তার দল চট্টগ্রাম পৌছাবে'।[৩৭]

ব্রিগেডিয়ার শফি চট্টগ্রামে পৌছে নৌবাহিনীর আর্টিলারী সাহায্য নিয়ে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার দখল করেন। ২৪ এফ এফ একটা পাঠান রেজিমেন্ট হলেও-এর সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন একজন বাঙালি, মেজর আমজাদ। লে. ক. শাহপুর নিহত হলে ব্রিগেডিয়ার শফি ব্যাটালিয়ানের নেতৃত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেন এবং মেজর আমজাদকে তার সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে রেখে দেন। এ বাঙালি অফিসারটি যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত অনুগত ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি এবং যুদ্ধ শেষে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারতে আটক ছিলেন।

যাহোক, অন্য বাঙালি মেজর ৮ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জিয়াউর রহমান তার নিজের কমান্ডিং অফিসার- এক পশ্চিম পাকিস্তানীকে খুন করে বিদ্রোহ করেন। পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে ব্রিগেডিয়ার শফি ইন্সট্রাক্টর হিসেবে থাকাকালীন জিয়া ও এরশাদ (উভয়ে পরবর্তীতে বাংলাদেশের জেনারেল ও রাষ্ট্রপতি হন) সেখানকার ক্যাডেট ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার শফি আমাকে জানিয়েছেন তিনি পরবর্তী সপ্তাহ ধরে মেজর জিয়াকে চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি ও রামগড়ের ভিতর দিয়ে তাড়িয়ে বেড়ান, কিন্তু জিয়া এরপর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন জিয়া তার দলবল নিয়ে পালানোর সময় পাকিস্তানী সেনা ও বিদ্রোহী মিজোরা তার উপর হামলা চালিয়েছিল, অপরদিকে চাকমারা তাকে তাদের সীমানার মধ্যে সাহায্য করেছিল।[৩৮] শমসের মুবিন চৌধুরী ৮ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে মেজর জিয়ার এ্যাডজুটেন্ট ছিলেন এবং তিনি জিয়ার সাথেই বিদ্রোহ করেন। তিনি তার সাথী বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন হারুণ আহমেদ চৌধুরীকে (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) সাথে নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তার স্বদেশীদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ করেন।

শমসের মুবিন চৌধুরীর ভারতে আর যাওয়া হয়নি। ১১ এপ্রিল কালুরঘাট ব্রীজের একটি যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে বন্দি হলে বছরের অধিকাংশ সময়টা বন্দি হিসেবে চট্টগ্রাম ও ঢাকার সামরিক হাসপাতালে কাটিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৯]

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানে সদ্য আগত ২০৫ ব্রিগেডের ইউনিটগুলোকেও চট্টগ্রামে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। বিমানবন্দর ছিল বিদ্রোহীদের আক্রমণের আওতায় এবং কমান্ডো ফোর্সের প্রতিষ্ঠাতা মেজর জেনারেল মিঠা বিমান বন্দরকে নিরাপদে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।[৪০] এদিকে কর্ণফুলী মিলে বাঙালিরা সকল পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিহারীদের ও তাদের পরিবার পরিজনদের একটি ক্লাব হলে নিয়ে যায় ও সেখানে গুলি করে তাদের হত্যা করে। মেজর আনিস সেখনে যান এবং মৃতদেহের স্তুপ দেখতে পান যেখানে কেবলমাত্র একজন নারী ও একটি শিশু বেঁচে ছিল। হতভাগ্যদের সেখানে গণকবর দেয়া হয়।[৪১] এপ্রিলের শেষ কিংবা মে মাসের প্রথম দিকে আর্মি এভিয়েশনের ক্যাপ্টেন (পরবর্তীতে লে. জেনারেল) আলী কুলি চট্টগ্রাম উড়ে যান। তিনি কর্ণফুলী মিল পরিদর্শন করেন। তখনও সেখানকার দেয়ালে ও সিঁড়িতে মজুত ছিল রক্তের চিহ্নসহ স্পষ্ট খুন খারাবীর আলামত।[৪২] বিদেশী সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছিল মিলে অবাঙালিদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ ।[৪৩]

রাজা ত্রিদিব রায় চট্টগ্রামে উভয়পক্ষের বাড়াবাড়ির কথা লিখেছেন। তাঁর এক চাচা ও দু'জন চাচাতো ভাইকে সেনাবাহিনী নিয়ে গেলে তারা আর কখনোই ফিরে আসেনি। 'অন্যদিকে রাঙ্গামাটিতে ২৬ মার্চ-এর পর থেকে আওয়ামী লীগ, আওয়ামী লীগ সমর্থিত বিদ্রোহী পুলিশ সদস্য ও ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সদস্যরা বিহারীদের ধরে নিয়ে যেতে শুরু করে... বাঙালিদের এ সব অপকর্মের সাথে যোগ না দেয়ায় তারা পাহাড়িদের হুমকি দিয়ে বলে, বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের পর তোমাদের পালা আসবে'। ত্রিদিব রায় অবাঙালি নারী-পুরুষ ও শিশুদের প্রতি বাঙালিদের হৃদয়বিদারক নৃশংসতা নিয়ে অনেক লিখেছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী ক্যাডাররা মানুষকে বাধ্য করতো তাদের অর্থ ও চাল দেয়ার জন্য এবং সেখানে সেনাবাহিনী পৌঁছলে গ্রামবাসী তাদেরকে মনে করতো রক্ষাকর্তা হিসেবে।[৪৪]

টাঙ্গাইল: সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ চুরমার করে দেয়

ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের পথে সাথিয়ারচোরা নামে ছোট একটি গ্রামের অবস্থান। মার্চের শেষ দিনগুলোতে বিদ্রোহী বাঙালি ইপিআর ও পুলিশ সাথিয়ারচোরার দিকে আসে ও সেখানে একটি প্রতিরক্ষাব্যূহ স্থাপন করে। জয়নাল আবেদিন নামে এক গ্রামবাসীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী টাঙ্গাইল থেকে বিদ্রোহী ফজলুর রহমান ফারুক নামের এক বিদ্রোহী ওই স্থানটিতে তাদের প্রতিরোধ তৈরি করার নির্দেশ দেন। সে সময় অন্যদের চেয়ে অনেক খ্যাতিমান বা কুখ্যাত বিদ্রোহী গেরিলা নেতা কাদের (টাইগার) সিদ্দিকী বিদ্রোহীদের ওই দলের সাথে যোগ দেন।[৪৫]

ওই সময় জয়নাল আবেদিন খুলনায় চাকরি করতেন। সেনা অভিযান শুরু হয়ে গেলে তিনি তার গ্রামে ফিরে আসেন। তার একটি বন্দুক ছিল, তার ভাই জুমারত আলী দেওয়ান যিনি শাজাহান সিরাজের সাথে সক্রিয় রাজনীতি করতেন তার অস্ত্রশস্ত্রের কিছু প্রশিক্ষণ ছিল। গ্রামবাসীর অধিকাংশ লোকজনই যুদ্ধের কিছুই জানতো না। আবেদিন জানান বিদ্রোহী ইপিআর ও পুলিশ বাংকার নির্মাণের পর সেখানে তাদের মেশিনগান নিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে।

আবেদিনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এপ্রিলে দিনের বেলা পাক সেনাবাহিনীর একটি কনভয় যাতে ৭০টি যানবাহন ছিল তা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছিল এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও বাঙালি বিদ্রোহীরা গুলিবর্ষণ শুরু করে যাতে পাক বাহিনীর দশ থেকে বারটি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় ও ২০০-২৫০ জন সৈনিক নিহত হয়। এ ঘটনাকে আমার সহকর্মী যারা প্রচণ্ডভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক তারাও অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন। তাদের

www.pathagar.com

মতে বাস্তবে একটি বা দুটি গাড়ি ধ্বংস ও ডজন খানেক সৈন্য নিহত হয়ে থাকতে পারে। তবে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ হয়েছিল তা সত্য। অবশ্য অন্যভাবে একে হয়তো অতিরঞ্জিত বলা যাবে না যখন পাক বাহিনী পাল্টা গুলিবর্ষণ করে, আবেদিন তখন বন্দুক ফেলে পালিয়ে যায়, তার ভাই জুমারত যিনি বাংকারে ছিলেন তিনিও সেখানে নিহত হন। আবেদিন জানান ওই দিন সকালে কাদের সিদ্দিকী সেখানে চলমান যুদ্ধ দেখে নাটিয়াপাড়ার দিকে চলে যান যেখানে পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধ করেন।

এদিকে কথিত আছে বিদ্রোহীদের দমন করে আধা ডজন সৈনিক গ্রামে প্রবেশ করে বাড়ি বাড়ি খুঁজে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং যাকে পেয়েছে তাকেই গুলি করে হত্যা করেছে। আবেদিন জানান সৈন্যরা নারী ও শিশুদের কোনো ক্ষতি করেনি যদিও কিছু মহিলা ও শিশু গোলাগুলির মাঝে পড়ে ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছিল। সেদিন পাক সেনা চলে যায় এবং পরদিন পুনরায় ওই স্থানে এসে জানাজার জন্য লোকজন জমা হলে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়; কেবলমাত্র পাঁচজন লোক জানাজায় অংশ নিয়েছিল এ তথ্য জানান আবেদিনের স্ত্রী শিউলী আবেদিন। সেদিন থেকে দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত কেউই নিজ গ্রামে থাকতো না, অন্য গ্রামে বাস করতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে, যদিও আর সেনাবাহিনীর সাথে কোনো ধরনের সংঘর্ষ সেখানে হয়নি। এরপর বছরের পরের দিকে সেনাবাহিনী সাহায্যকারী শক্তি হিসেবে রাজাকার ফোর্স গঠন করে এবং এ রাজাকাররাই হিন্দুদের লুটতরাজ ও কাউকে কাউকে হত্যাও করেছে।

আবেদিনের দৃষ্টিতে যাদের মুক্তিযোদ্ধা সনদ দেয়া হয় তাদের অধিকাংশ ছিল ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। স্থানীয় রাজনীতিতে তিনি অনেক বিখ্যাত ও বিশেষ পরিচিত বিদ্রোহী নেতা কাদের সিদ্দিকীর বিপক্ষে রাজনীতি করেন এবং কাদের সিদ্দিকীকে একজন 'সুবিধাবাদী' ও 'চরমপন্থী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন যার সাথে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ থেকেও নিছক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হওয়ার কারণে একে অপরের বিপক্ষে প্রচারণা করেছিল অনেকেই। আবেদিনের অভিযোগ হলো কাদের সিদ্দিকী কখনো সাথিয়ারচোরার যুদ্ধের প্রাপ্য স্বীকৃতি দেননি। কাদের সিদ্দিকীর স্মৃতিকথায় যা লেখা হয়েছে তা অনুযায়ী আবেদিনের অভিযোগকে অন্যায় সমালোচনা বলা যায়, কারণ কাদের সিদ্দিকী লিখেছেন সাথিয়ারচোরার একটি 'ফ্রন্টলাইন' ছিল ও ওই যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছিলেন তাদের প্রতি তিনি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং এও মেনে নিয়েছেন যে সেখানে দশ থেকে বারটা যানবাহন ধ্বংস হয়েছিল ও শতাধিক পাক সেনা নিহত হয়েছিল। তিনি আরো বলেন অধিক অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন এবং সেজন্য এ বিশেষ যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি।[৪৬]

কাদের সিদ্দিকী তার স্মৃতিকথায় জয়দেবপুর থেকে বিদ্রোহী ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিয়ে মেজর সফিউল্লাহর টাঙ্গাইল পৌঁছানোর কথা বর্ণনা করেছেন,[৪৭] আর ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের 'বি' কোম্পানী আগে থেকেই টাঙ্গাইলের সার্কিট হাউসে অবস্থান করছিল। ওই কোম্পানীতে পাঁচজন অফিসারের মধ্যে তিনজন ছিলেন বাঙালি এবং দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানের। কাদের সিদ্দিকীর ভাষ্য অনুযায়ী মেজর সফিউল্লাহ ও ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাকী সবাই ময়মনসিংহ চলে গেলে 'বি' কোম্পানীর তিনজন বাঙালি অফিসার ধৃত দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারকে হত্যা করে তাদের লাশ স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে তুলে দেয়। তারা প্রথমে লাশ দু'টো সার্কিট হাউসের পিছনে মাটি চাপা দেয়,

www.pathagar.com

তারপর আবার তুলে মাটি চাপা দেয় নদীর ধারে এবং সবশেষে আরো একবার তুলে দুটো লাশকে টাঙ্গাইল কবরস্থানে দাফন করে।[৪৮]

কুষ্টিয়াঃ বিদ্রোহীদের নিকট সেনা ইউনিট পরাস্ত

লে. আতাউল্লাহ শাহ্ ২৭ বালুচ রেজিমেন্টের সাথে ১৯৭০ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে চাকরিরত ছিলেন।[৪৯] ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি নির্বাচনী দায়িত্বে কুষ্টিয়া যান ও দায়িত্ব পালন শেষে যশোরস্থ বেস- এ ফিরে আসেন। ১৯৭১ সলের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে তাদের চলাফেরা সেনানিবাসের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ২৫-২৬ মার্চ রাতে তাদের 'ডি' কোম্পানী ও 'এ' কোম্পানীর বেশ কিছু সৈনিক নিয়ে তাকে আবার কুষ্টিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ওই দলে ১৫৫ জন সৈনিক ও ৪ জন অফিসার ছিলেনঃ কোম্পানী কমান্ডার মেজর শেখ মোহাম্মদ শোয়েব, সেকেন্ড ইন কমান্ড ক্যাপ্টেন সামাদ আলী, 'এ' কোম্পানীর ক্যাপ্টেন আসলাম ও লে. আতাউলাহ শাহ্। তাদের দায়িত্ব ছিল ডিসি, এসপি ও স্থানীয় এমএনএ 'দের খুঁজে বের করা, পুলিশকে নিরস্ত্র করা ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর নিয়ন্ত্রণ নেয়া।

তারা কুষ্টিয়া জেলা হাই স্কুলে কোম্পানী হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেন। ক্যাপ্টেন আসলামের নেতৃত্বে এক প্লাটুন সৈনিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ -এর। ক্যাপ্টেন সামাদ ও লে. আতাউল্লাহ আর এক পাটুন নিয়ে যান পুলিশ লাইনে এবং সেখানকার অস্ত্রগারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তারা ডিসি, এসপি ও এমএনএ'দের কাউকেই বাড়িতে পাননি। পুলিশ লাইনের অল্পসংখ্যক গার্ডকে নিরস্ত্র করে সেখানে সেনাবাহিনীর নিজস্ব গার্ড বসানো হয়। চৌদ্দজন সৈনিক নিয়ে নায়েব সুবেদার আয়ুব ওয়্যারলেস স্টেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। সেখানে কোনো ধরনের সংঘর্ষই হয়নি। নির্বাচনের সময় থেকেই জায়গাটি বেশ পরিচিত ও স্থানীয় লোকদের সাথে সেনাবাহিনীর সদস্যদের বরাবরই সুসম্পর্ক বজায় ছিল। লে. আতাউল্লাহ্ পুলিশ লাইনে অবস্থান করছিলেন।

পরদিন থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা দলবদ্ধ হয়ে শহর পাহারার ব্যবস্থা করে। কুষ্টিয়ায় কর্মরত ওয়াকার নাসিম বাট নামে একজন পশ্চিম পাকিস্তানী সিএসপি অফিসার কোম্পানী হেড কোয়ার্টারে আসেন। বাঙালি পুলিশ সদস্যরা পালিয়ে যাওয়ায় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। দু'একটি বিছিন্ন ঘটনা যেমন রেল লাইনের ক্ষতিসাধন করার চেষ্টা ইত্যাদি ছাড়া ২৭-২৮ মার্চ বেশ নির্বিঘ্নে কেটে যায়।

২৯ মার্চ সকালের দিকে লে. আতাউল্লাহ কিছু ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে প্রথমবারের মতো সতর্ক হলেন। তিনি দেখলেন মেহেরপুর রোড ধরে শত শত লোক নীরবে শহর খালি করে চলে যাচ্ছে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এভাবে লোকজন চলে যাচ্ছিল।

আতাউল্লাহ লোকজনকে চলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলে তারা তেমন কোনো উত্তর দেয়নি। সন্ধ্যায় ডিসি ও এসপি কোম্পানী হেড কোয়ার্টারে হাজির হয়ে একটি ছোট বিশেষ গুরুত্ব বহনকারী লেখা দেখালেন যাতে বলা হয়েছিল যে কেউ পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাহায্য করবে তাকে হত্যা করা হবে। তারা আরো জানান রাতে একটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেনা কর্মকর্তারা এর পরই রাতে অতিরিক্ত পাহারার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন না সে সতর্ক বাণীটি কি সত্য ছিল, নাকি ছিল নিছক গুজব।

ওই রাতে হঠাৎ উচ্চস্বরে *কালেমা* পড়ার সাথে সাথে চারিদিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায় যার মধ্যে মর্টারের গোলাবর্ষণও ছিল। তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় এবং চারটি সেনা অবস্থানই ছিল একইসাথে আক্রমণের লক্ষ্য। সকাল পর্যন্ত গোলাগুলি

www.pathagar.com

চলে, ইতোমধ্যে আতাউল্লাহ ও তার সৈনিকদের গোলাবারুদ কমে আসে এবং তাদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। এ পর্যায়ে কোম্পানী কমান্ডার সব দলকে স্কুলে কোম্পানী হেড কোয়ার্টারে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। আতাউল্লাহ ও আসলাম তাদের বাকী সৈনিকদের নিয়ে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু আয়ুবের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিকে গুলিবর্ষণ চলে সারাদিন ধরে ।

এ পরিস্থিতিতে প্রথমে তাদের জানানো হয় যে আকাশ পথে তারা সাহায্য পাবে ও সড়ক পথে সেনাদল রওনা হয়েছে, কিন্তু পরে আবার জানানো হয় কোন পথে কোন সাহায্য যাওয়ার সুযোগ নেই বরং তারা নিজেরা নিজেদের মতো করে যেন যশোরে ফিরে আসে। বেঁচে যাওয়া সেনা দলটির সত্তর জন অফিসার ও সৈনিক এবং আহতদের নিয়ে হাতে গোনা মটরযানে গাদাগাদি করে ওই রাতেই তারা যশোরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। রাস্তায় মেজর শোয়েবের জীপটি বৈদ্যুতিক পোলে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এ জীপটিতে লে. আতাউল্লাহ ও ক্যাপ্টেন সামাদ ছিলেন এবং এটি ছিল সর্বশেষ জীপ। তাদের সামনের দুটি জীপ হঠাৎ রাস্তায় পাতা ফাঁদে পড়ে ব্রীজ থেকে খালে পড়ে যায় এবং এর পরপরই শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ। এ অবস্থায় প্রত্যেকেই চেষ্টা করছিল নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য। আতাউল্লাহ উঠে ফিরে এসে দেখেন সে সব জীপ বা যানবাহনে কেউই ছিলেন না, কেবলমাত্র একজন আহত বার্বুচি ছাড়া। তিনি ওই উল্টে যাওয়া জীপ গাড়ি থেকে আহত বার্বুচিকে টেনে তুলে উভয়ে হাঁটা শুরু করলে অকস্মাৎ লাঠি-সোটা হাতে লোকজন তাদের ঘিরে ফেলে।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আতাউল্লাহ তার হাত ও পা বাঁধা অবস্থায় নিজেকে একটি কুঁড়ে ঘরে আবিস্কার করেন। আতাউল্লাহ একজন বাঙালি পুলিশ সদস্যকে চিনতে পেরেছিলেন যে আতাউল্লাহর বুকের উপর চেপে হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে আতাউল্লাহ বাম চোখ উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। ওই পুলিশ সদস্যটির ব্যাচ নম্বর তিনি মনে রেখেছেন যা ছিল- ৭৯। দিনের আলোতে তাকে জীপে করে ঝিনাইদহে নিয়ে যাওয়া হয়। পথে তিনি দেখতে পান একটি ব্রীজ পাহারা দিচ্ছে পোশাকধারী কিছু বাঙালি এবং এর পাশেই ক্যাপ্টেন সামাদ আলীকে মাটিতে ফেলে 'বধ' করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহ পুলিশ ষ্টেশনে কোম্পানীর আরো অনেক সৈনিককে ধরে নিয়ে আসা হয়। ক্ষত-বিক্ষত ডান বাহু নিয়ে পাঠান হাবিলদার মাজুলা পশতু ভাষায় জানতে চায়- আতাউল্লাহ কেমন আছেন? অজ্ঞান হয়ে সারা শরীর আঘাতে ফোলা অবস্থায় নায়েক আশরাফ পড়ে ছিল ঘরের একপাশে। সেখানে সব মিলিয়ে বার থেকে চৌদ্দজন সৈনিক আহত ও রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বাইরে উৎসুক জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল এবং মাঝে মাঝে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। পাশের কক্ষ থেকে টেলিফোনে মেসেজ আদান-প্রদানের শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং সেখান থেকে তিনি 'ভট্টাচার্য' (বাঙালি হিন্দু ব্রাহ্মণের নাম) নামটা শুনতে পেয়েছিলেন।

বিকালে সকলকে একটি খোলা ট্রাকের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় ও ট্রাকটি রাস্তা ধরে চলতে শুরু করে। ট্রাকে বাঙালি যারা উঠেছিল তারা ইতোমধ্যে মারাত্মকভাবে আহতদের পুনরায় লাঠি দিয়ে এলোপাথারি আঘাত করা শুরু করে। এ রকম একটি আঘাত এসে লাগে লে. আতাউল্লাহর মাথায়। মাঝে মাঝে আবার চলমান ট্রাক থেকে দু'একজন আহত বন্দিকে রাস্তার ধারে অপেক্ষারত উৎসুক জনতার মাঝে টোপ হিসেবে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। একটি জায়গায় আতাউল্লাহকেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

আতাউল্লাহ হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নরম জমির উপর এসে পড়েন। সে সময় তার প্রচণ্ড পানির পিপাসা পায়। তিনি স্মরণ করে বললেন কয়েকজন লোক এসে তাকে তুলে নৌকায়

www.pathagar.com

নিয়ে যায়। নৌকা এক স্থানে থামলে তাকে পুনরায় কোলে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় একটি গ্রাম্য ডিসপেনসারীতে। তাকে একটি টেবিলের উপর শোয়ানোর পর এক গামলা দুধ ও দুটি কলা দেয়া হয় খাওয়ার জন্য। এ লোকগুলোও ছিল বাঙালি, কিন্তু একেবারেই ভিন্ন মানসিকতার। তারা তার বাঁধন খুলে দিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল ও তাকে একটি জামা ও লুঙ্গি দেওয়া হয়েছিল এবং এরপর তাকে কলা ও দুধ খাওয়ানো হচ্ছিল। পরদিন ট্রাকে সামরিক পোশাক পড়া একদল লোক এসে তার হাত ও চোখ বেঁধে তাকে ভারতের সীমান্তবর্তী ছোট শহর চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউসে নিয়ে যায়। সেখানে ১ম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সদস্য চা খেতে খেতে তাকে বিদ্রুপ করে প্রশ্ন করা শুরু করেন। প্রশ্নগুলো ছিল নির্দিষ্ট-তারা কি মহিলাদের ধর্ষণ করেছে? আতাউল্লাহর উত্তর ছিল 'না সূচক'। কতজনকে তারা হত্যা করেছে? আতাউল্লাহ রেল লাইনের অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা ঘটানোর চেষ্টাকালে তাদের গুলিবর্ষণে কেউ একজন গুলিবিদ্ধ হলেও জীবিত ছিল বলে জানান। এরপর তাকে কিছু খাবার দেয়া হয় ও দু'তিন দিন আটক রাখা হয় তালাবদ্ধ ঘরে।

একদিন বিবিসি'র একজন সাংবাদিক এসে তার সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। তার সাক্ষাতদানের পূর্বে ক্ষতস্থানে নতুন ব্যাণ্ডেজ ও তাকে একটি জামা দেয়া হয় পরার জন্য।[৫০] তারপর একদিন তাকে আবার বেঁধে ও চোখে কালো কাপড় পেঁচিয়ে পুনরায় গাড়িতে করে অন্যত্র ভিন্ন একদল লোকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর গাড়িতে আরো ভ্রমণ করার পর অবশেষে কোলকাতায় পৌছে প্রথমে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বিএসএফ কেন্দ্রে ও পরে ফোর্ট উইলিয়ামে অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সেনানিবাসে। সেখানে তাকে ভারতীয়রা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন, যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ট্যাংক রেজিমেন্টের ব্যাপারে জানতে ছিলেন বিশেষভাবে আগ্রহী।

তাকে চিকিৎসাসহ প্রসাধন সামগ্রী ও পত্র-পত্রিকা দেয়া হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে। লে. আতাউল্লাহ একটি সাময়িকীর পাতা উল্টালে দেখতে পান পূর্ব পাকিস্তানে একদল বাঙালি ওয়াকার নাসিম বাটের ছিন্ন মস্তক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াকার নাসিম বাট একজন সিএসপি অফিসার হিসেবে কুষ্টিয়ায় তার কর্মস্থলে ছিলেন এবং আতাউল্লাহর দেয়া ভাষ্য অনুযায়ী যিনি সেনাবাহিনীর সাথে যশোরে চলে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। পরে পানাগড় ক্যান্টনমেন্টে আটক অবস্থায় আতাউল্লাহ সেখানে আরো পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ও বিভিন্ন পদবীর লোকজনকে ভারতীয়দের হাতে আটক দেখতে পান। এরপর নভেম্বর মাসে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রা জেলে। অবশেষ তিনি জানতে পারেন পাক সেনাবাহিনীর যে ১৫৫ জন তার সাথে কুষ্টিয়ায় ছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র ১১জন শেষ পর্যন্ত যশোরে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কুমিল্লা সেনানিবাস: গৃহযুদ্ধ থমকে গেল

যদি কেউ জানতে চায় কীভাবে ১৯৭১ সাল সুস্পষ্টভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সমাজ, সম্প্রদায় ও পরিবারকে ছিন্ন করেছিল তা হলে নিশ্চয়ই তার একটি চমৎকার উদাহরণ হিসেবে কুমিল্লা সেনানিবাসে যা ঘটেছিল সেটিকে উপস্থাপন করা যেতে পারে। উভয়েই বাঙালি, উভয়েই পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে একই রেজিমেন্টে, একই স্থানে ও একই কমান্ডিং অফিসারের অধীনে চাকরি করেছেন। ১৯৭১ সালে একজন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি অনুগত থাকলেন অপরদিকে অন্যজন বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দিলেন ও তার চাচাতো ভাই -এর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনলেন। তারা যুদ্ধ করেন একে অপরের বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

যুদ্ধ শেষে একজন যুদ্ধ বন্দি হিসেবে ভারতে যেতে বাধ্য হলেন আর অপরজন বিদ্রোহ করে যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে বীরের বেশে ফিরে আসলেন। উভয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের নিজ নিজ সেনাবাহিনীতেই থেকে যান। আনুগত্যপোষণকারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে অবসর গ্রহণ করে পাকিস্তানে বসবাস করছেন। বিদ্রোহী সেনাকর্মকর্তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে একজন মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর নিয়ে বাংলাদেশে বসবাস করছেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান দয়া পরবশ হয়ে ঢাকায় তার বাসায় সন্ধ্যার পরে আমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। চা পানে আপ্যায়িত করে তিনি ১৯৭১ সালের উপর তার লেখা বই- এর কথা আমাকে উল্লেখ করেন। বইটি ইংরেজী মাধ্যমে ছিল; কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ঘটনার বাংলায় বর্ণনা বইটির আগেই প্রকাশিত হয়েছিল একটি সম্পাদনা গ্রন্থের আকারে। অন্যদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার আবুল লাইস আহমদুজ্জামান রাওয়ালপিন্ডির তার বাসায় সন্ধ্যার পর আমাকে সানন্দে গ্রহণ করেন সারাদিনব্যাপী অসংখ্য ব্যস্ততার পর। তিনি ও অপর একজন বাঙালি অফিসার কর্ণেল কামাল উদ্দিন চা পানের সাথে সাথে কীভাবে তারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি আনুগত্যশীল ছিলেন সে ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন।

১৯৭১ সালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টে ক্যাপ্টেন এ এল এ জামান ও লে. ইমামুজ্জামান চাকরি করতেন। তাদের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে. ক. ইয়াকুব মালিক ও ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি।[৫১] ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ঘটে যাওয়া ঘটনার যে বর্ণনা লে. ইমামুজ্জামান দিয়েছেন তা কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে প্রকাশিত হয়েছে- বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে একটি সম্পাদনা বই হিসেবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উপর তার বইয়ের অংশ হিসেবে ইংরাজী মাধ্যমে এবং ১৯৭১ সালে ১৩ এপ্রিল আগরতলা থেকে সিডনী শ্যানবার্গ-এর পাঠানো একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে যা ১৭ এপ্রিল ছাপা হয় *নিউ ইর্য়ক টাইমসে*। এখানে লে. ইমামুজ্জামান- এর নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য তার নাম পরিবর্তন করে 'দবির' ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়।[৫২]

লে. ইমামুজ্জামানের ভাষ্য অনুযায়ী আসন্ন সামরিক অভিয়ানের প্রয়োজনে কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি সকল ইউনিটের কমান্ডিং অফিসারদের যখন তখন কনফারেন্স ডাকছিলেন কিন্তু কোনো বাঙালি অফিসারকে সেই কনফারেন্সে হাজির হতে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি এ বিষয়টি তার সামনে তুলে ধরলে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফিকে মনে হয়েছিল তিনি বেশ অবাক হয়েছেন। তিনি বললেন, 'অবশ্য সকল কমান্ডিং অফিসারই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী তবে বাঙালি অফিসারদের বাদ দেয়ার মতো কোনো কারণ ছিল না, ক্যাপ্টেন এএলএ জামানকে কখনোই কোনো কনফারেন্সে-এর বাইরে রাখা হয়নি। চাকরির মাত্র ক' মাস হয়েছে এমন একজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান এতোটাই জুনিয়র অফিসার ছিল যে অন্য সব সিনিয়রদের সাথে কনফোরেন্সে থাকার তার তেমন প্রয়োজন ছিল না'।

লে. ইমামুজ্জামান অভিযোগ করেন ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় লে. ক. ইয়াকুব মালিক ঘোষণা করেন সারাদেশে সান্ধ্য আইন জারীর করা হয়েছে এবং তিনি চান 'সম্পূর্ণ কুমিল্লা শহর লাশে ভরে যাক'। বাঙালি অফিসাররা এ রকম দায়িত্ব পালনকে যেহেতু অস্বস্তিকর মনে করতে পারেন

www.pathagar.com

তাই তাদের দাপ্তরিক কাজ দেয়া হয়। তবে লে. ইমামুজ্জামান বলেন তাকে, ক্যাপ্টেন এএলএ জামান, অন্য এক বাঙালি অফিসার ক্যাপ্টেন নূরুল ইসলাম ও একজন বিহারী অফিসারকে প্রকৃতপক্ষে ক্যান্টনমেন্টে একটি ঘরে রাখা হয় তালাবদ্ধ অবস্থায়। লে. ইমামুজ্জামান তার বইয়ে লিখেছেন ক্যাপ্টেন জামান বার বার তার কমান্ডিং অফিসারের সাথে দেখা করতে চাচ্ছিলেন ও একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে তাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কমান্ডিং অফিসার তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেন। লে. ইমামুজ্জামানের দেয়া তথ্য অনুযায়ী কুমিল্লার ডিসি ও এসপিকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হয় এবং পাশের একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন এএলএ জামান নিজেকে একজন গর্বিত পাকিস্তানী হিসেবে মনে করেন এবং জানান যে অন্য বাঙালি অফিসাররা তাকে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনায় বিশ্বাস করে তাদের সাথে রাখতে পারেননি। তালাবদ্ধ ঘরে আটকে রাখার কথা তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি জানান প্রথম থেকেই তাদের ইউনিটের সবধরনের কার্যক্রমের সাথে তাকে জড়িত রাখা হয়। তিনি বলেন, যে সব বাঙালি অফিসারর সেনা অভিযানে অংশ নিতে আগ্রহী ছিলেন না তাদের দাপ্তরিক কাজের দায়িত্ব যেমন টেলিফোনের উত্তর দেয়া- এ ধরনের কাজ দেয়া হয়েছিল, লে. ইমামুজ্জামান ও অন্য দু'জন বাঙালি অফিসাররাও অমনসব কাজে নিয়োজিত ছিলেন। লে. ইমামুজ্জামানও তার বইয়ে একদিন টেলিফোনের দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করেছেন।

মজার বিষয় হচ্ছে লে. ইমামুজ্জামান তার কোনো লেখায় উল্লেখ করেননি যে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য স্থাপনকারী ক্যাপ্টেন জামান তার জ্ঞাতি ভ্রাতা। অথচ ক্যাপ্টেন জামান আমাদের আলোচনার প্রথমেই আমাকে এ সম্পর্কে জানিয়েছেন ও কুমিল্লা শহরে তার অন্যান্য অনেক আত্মীয়-স্বজন থাকার কথাও উল্লেখ করেছেন। আর একটি বিষয় হলো লে. ইমামুজ্জামান উল্লেখ করেননি যে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি ২৫ মার্চ চট্টগ্রামের উদ্দেশে কুমিল্লা ত্যাগ করেছিলেন আর তাই কুমিল্লায় যে গণহত্যার অভিযোগ উঠেছে তাতে ওই ব্রিগেডিয়ার শফির জড়িত থাকা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না ...।[৫৩]

লে. ইমামুজ্জামান কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি সেনা ও বেসামরিক লোকদের গণহত্যার মারাত্মক অভিযোগটি আনেন এবং তাকে ও অন্য বন্দি দু'জন অফিসারকে তার সহকর্মী পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার দ্বারা হত্যা প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি একটি ভয়ংকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন যেখানে তিনি মরার মতো ভান করে পড়েছিলেন এবং অলৌকিকভাবে পালিয়ে বেঁচে যান।

এ ব্যাপারে কিছুটা ভিন্ন মতামত আমাকে দেন অন্য একজন পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার মেজর আব্দুল মজিদ যিনি ৭-৮ এপ্রিল কুমিল্লায় ৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন।[৫৪] মেজর মজিদ ওই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের দিনগুলোতে ছিলেন না, কিন্তু বলেন সেনা ইউনিটে এটা সাধারণ একটা ব্যাপার যে স্থানীয় ডিসি ও এসপিকে হত্যা করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের পূর্বের কার্যকলাপের প্রতিশোধ হিসেবে। যদিও এসপি'র পরিবারের লোকজনকে বলা হয়নি যখন তারা এ বিষয়ে জানতে এসেছিল।[৫৫] ক্যাপ্টেন বুখারী ও লে. ক. ইয়াকুব সম্পর্কে সেখানে গুজব ছিল যে তারা মানুষ হত্যা করেছেন। বুখারী ওই বছরের পরের দিকে নিহত হন অতর্কিত হামলায়। উগ্রবাঙালি জাতীয়তাবাদীরাও খুব একটা ভালো স্বভাবের পরিচয় দেয়নি সে সময়; মেজর মজিদ জানিয়েছেন তারা এপ্রিলে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় পৌঁছালে সেখানে যত্রতত্র মানুষের দেহ ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন যা ছিল বিহ-

www.pathagar.com

ারী নারী ও শিশুদের আর এদের হত্যাকারীরা ছিল বাঙালি।

লে. ইমামুজ্জামানকে হত্যা প্রচেষ্টা ও তার অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার গল্পটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। লে. ইমামুজ্জামান লিখেছেন, ৩০ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার ক্যাপ্টেন আসফ আহমেদ বন্দি ডিসি ও এসপিকে গুলি করেন এবং তাকে ও অন্য দু'জন অফিসারকে তালাবদ্ধ করে গুলি করে একজন জেসিও সুবেদার ফয়েজ সুলতান। তার দেয়া ভাষ্য অনুযায়ী তাকে ও সেই দুই অফিসারকে সাবমেশিন গানের সাহায্যে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল। তবে তার ভাষ্য মতে তাকে গুলি করা হয় যখন তিনি শোয়া অবস্থায় ছিলেন। লে. ইমাম জানিয়েছেন এতে তিনি আহত হন ও পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানে মরার মতো পড়ে থাকার ভান করেন। তিনি আরো জানিয়েছেন বাকী দু'জন অফিসার সেদিন গুলিতে নিহত হয়েছিলেন।

মেজর আব্দুল মজিদ আমাকে বলেছেন, বিহারী অফিসারটি বেঁচে গেছেন, তিনি তাকে কুমিল্লার হাসপাতালে দেখেছিলেন, ক্যাপ্টেন জামানও নিশ্চিত করেছেন যে বিহারী অফিসারটি জীবিত ছিলেন। খুব মজার বিষয় যে,বাঙালি বিদ্রোহী ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর সফিউল্লাহ তার বইয়ে লে. ইমাম ও বিহারী অফিসার গুলি খাওয়ার পর উভয়ের মাঝে কথপোকথনের এক দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন যা তিনি কেবল লে. ইমামের মুখ থেকেই শুনেছেন। ওই কথপোকথনে জানা যায় বিহারী অফিসারটি গুলিবিদ্ধ হন ক্রসফায়ারে ও তিনি লে. ইমামকে পালাতে মানা করেছিলেন।[৬] লে. ইমাম কিন্তু তার ওই তিনটি লেখায় কোথাও এ সব উল্লেখ করেননি।

ক্যাপ্টেন জামান বাইরে দায়িত্ব পালনকালে ওয়্যারলেসে তাকে জানানো হয় যে তার জ্ঞাতি ভাই ও অপর দু'জন পালানোর চেষ্টাকালে তাদের গুলি করা হয়েছে। এতে একজন বাঙালি অফিসার মারা গেছেন এবং তার জ্ঞাতি ভাই ও বিহারী অফিসারটি আহত হয়েছেন। তবে তার ওই ভাই পালিয়ে যান। এই ভাষ্য মতে গুলি ঘরের ভিতর চালানো হয়নি বরং খোলা জায়গায় গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল যেহেতু তিনজন দৌড় দিয়েছিল ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাইরে পালানোর জন্য।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫

বিধবাদের গ্রাম

গ্রামাঞ্চলের 'নিরাপত্তা নিশ্চিত করা'

'বেজন্মাটা যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল' (শালা খুব কমপিটেন্ট ছিল)
-যে পাক সেনা অফিসারটি আব্দুস সাত্তার ও তার গ্রামের সব লোককে গুলি করে হত্যা করেছিল তাকে লক্ষ্য করে ওই ঘটনায় বেঁচে যাওয়া মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার।

'আমি সব আর্মিকে ঘৃণা করি, আপনাদের, আমাদের সবার'।
-মোহাম্মদ জিন্নাতুল আলম, একমাত্র ব্যক্তি যাকে পাক সেনা কর্মকর্তা না মেরে ছেড়ে দেয় কিন্তু গ্রামের সব লোককে গুলি করে হত্যা করে।

রাজশাহী জেলায় পদ্মা নদীর তীরে যেখানে নদীটি ভারতের সাথে সীমান্ত তৈরি করেছে সেখানে থানাপাড়া নামে একটি গ্রামের অবস্থান। ওই এলাকার যারা স্মরণ করতে পারেন তাদের জানা আছে, গ্রামটি 'বিধবাদের গ্রাম' নামে পরিচিত। বেঁচে যাওয়া গ্রামবাসীদের দেয়া তথ্য অনুসারে ১৯৭১ সালে ১৩ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট গ্রামটিতে এসেছিল, যা সারদা পুলিশ একাডেমীর ঠিক পরেই অবস্থিত। পুলিশ একাডেমীটি বাঙালি বিদ্রোহীরা দখল করে নিয়েছিল কিন্তু সেনাবাহিনী সেখানে পৌঁছালে বিদ্রোহীরা চারিদিকে পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনী একাডেমীটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নদীর ধারে থানাপাড়া গ্রামে হাজির হয়, যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল গ্রামবাসী ও পলাতক বিদ্রোহীরা। মহিলা ও শিশুদের পুরুষদের থেকে পৃথক করে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর সব পুরুষ মানুষকে এক জায়গায় জড়ো করে হত্যা করা হয় গুলি করে, এরপর মরদেহগুলো একস্থানে স্তূপাকারে জমা করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় পাক সেনারা।
থানাপাড়া হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি অন্যতম ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যা আমি ১৯৭১ সালের যুদ্ধের উপর আমার গবেষণার কাজ করার সময় শুনেছিলাম। বিশ্বব্যাপী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে ঘৃণা করার জন্য সব উপাদানই ছিল এ রকম ভয়াবহ ও ন্যাক্কারজনক কাজে, যখন তারা পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশে বাঙালি বিদ্রোহীদের উপর দমন নীতি চালিয়েছিল।মনে হয়নি থানাপাড়া নিজেই বিশ্ব প্রচার মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরেছিল। দু:খজনক ব্যাপার হচ্ছে ওই সময় পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম আগে থেকেই পরিপূর্ণ ছিল ভিয়েতনামে মাইলাই হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত মার্কিন সেনাবাহিনীর লে. ইউলিয়াম কেলীর ঘটনা নিয়ে ।

www.pathagar.com

তাছাড়া থানাপাড়া অশুভ কাজের কোনো সাধারণ গল্প নয়। এ অধ্যায়ে থানাপাড়ার সেদিনের ঘটনা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ওখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের সাথে কথা বলে। এর মাঝে যেমন আছে- সেদিনের কোনো বালক, কোনো বালিকা, ওই ঘটনায় বিধবা হয়েছেন এমন কোনো নারী, কোনো পুরুষ যাকে গুলি করে গায়ে আগুন দেয়া হয়েছিল; কিন্তু সে মরেনি, অন্য একজন যাকে দায়িত্বরত পাক সেনা কর্মকর্তা ছেড়ে দিয়েছিল-এমন সব চরিত্র; তেমনি রয়েছে ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত যাত্রায় নেতৃত্বদানকারী একজন পাকিস্তানী কমান্ডিং অফিসার, একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট যিনি সারদা পুলিশ একাডেমী পুনর্দখল করার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ও পদ্মার তীর পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

বালকটি। ১৯৭১ সালে বালক রায়হান আলীর বয়স ছিল প্রায় বার বা তের বছর।[১] তার স্ত্রী মাহমুদা বেগম গিনীও প্রায় একই বয়সের ছিলেন। রায়হান ভেবেছিল সেদিন পাকবাহিনী রাজশাহী থেকে এসেছে সম্ভবত সারদা পুলিশ একাডেমী ও স্থানীয় ইপিআর ক্যাম্প দখল করার জন্য। সারদা বাজারের পাশে রাস্তায় কেউ একজন গুলি করেছিল সেনাবাহিনীর দিকে লক্ষ্য করে। পরে বেলপুকুর নামক স্থানে সম্ভবত সশস্ত্র বিদ্রোহী বাঙালিরা বেশ কিছু গুলিবর্ষণ করে পাক সেনাদের উপর এবং এরপরই পাক বাহিনী তাদের পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয়।

গোলাগুলির জন্য গ্রামবাসী নিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচনা করে পদ্মার তীরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। রায়হানের ধারণা প্রায় তিন হাজার পুরুষ, মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েরা সেখানে জমা হয়েছিল যাদের মধ্যে গ্রামবাসী, আশপাশের এলাকার লোকজন ও কিছু বিদ্রোহী বাঙালি পুলিশও ছিল।[২] সেদিন নদীর তীরটাকে রায়হানের কাছে মনে হয়েছিল মেলার মতো।

নদীতে পানির স্তর ছিল অনেক নীচে ও নদীর তীর খাঁড়াভাবে একদম সোজা পানি পর্যন্ত নীচে নেমে গিয়েছিল। লোকজন নদীর নীচের দিকে ভীড় জমিয়েছিল একেবারে পানির খুব কাছাকাছি এমন জায়গায়। হঠাৎ রায়হান একজন সৈনিককে দেখতে পায় নদীর তীরে ঠিক তাদের উপরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকতে। সৈনিকটি তাদের উপরে আসতে বলে ও তাদের সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে বলে জানায়। সকলে যখন ঠেলাঠেলি করে উপরে উঠে আসছিল তখন একজন যুবক নিজেকে নদীর তীরে আড়াল করে লুকাতে চেষ্টা করে। সৈনিকটি তাকে দেখে সেখানে লাফ দিয়ে নীচে এসে সেখান থেকে যুবকটিকে টেনে বের করে গুলি করে দেয়। বাকীদের সকলকে উপরে এনে পুরষদের একদিকে রেখে বাকী মহিলা ও শিশুদের পৃথক করে দাঁড় করায়।

রায়হান তার পিতা (প্রায় ৪৬ বছর বয়স) তার বড় ভাই (প্রায় ১৭ বছর) এবং তার দুলাভাই (প্রায় ২৭/২৮ বছর) একসাথে বসতে যায়। সে যেখানে বসেছিল তা ছিল পুরুষদের লাইনের প্রায় শেষ প্রান্ত। সে দেখলো একজন সৈনিক কিংবা অফিসার হবে যে তাকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাচ্ছে, সে যেন ওই লাইন থেকে বের হয়ে যায়। রায়হান তার ইঙ্গিত দেখেও না দেখার ভান করে। রায়হানের পাশে বসা লোকটি ভেবেছিল হয়তো তাকেই লাইন থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর সে জন্যই সে লোক উঠে দাঁড়ালে সেখানে দাঁড়ানো সৈনিকটি তাকে লাথি মেরে মেঝেতে ফেলে দেয়। এরপর সৈনিকটি রায়হানের হাত ধরে তুলে এনে বলে সে যেন মহিলা ও শিশুদের লাইনে গিয়ে বসে।

www.pathagar.com

এরপর মহিলা ও শিশুদের সেখান থেকে চলে যেতে বলা হয়। তারা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর সেখানে দায়িত্বরত সেনা কর্মকর্তাটি পুরুষদের জিজ্ঞেস করে-কে হিন্দু, কে পুলিশের লোক তা বলার জন্য। তাদের কেউ একজন উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। বাকীরা সকলেই বসেছিল তবে এরমাঝে রায়হান মহিলাদের সাথে ওই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। রায়হান বর্তমানে থানাপাড়ায় সুইডিস অনুদানে 'সোয়ালোস' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা পরিচালনা করছেন যেখানে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের অনেক বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থান হয়েছে। রায়হানের এ সংস্থার কাজের প্রয়োজনে তাকে অনেক পাকিস্তানীর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে-তবে তাদের সাথে কোনোভাবেই সে নিজেকে মেলাতে পারেনি, কি করবে তাও বুঝতে পারেনি।

বালিকাটি। রায়হানের স্ত্রী মাহমুদা বেগম গিনী ছিলেন মহিলা ও শিশুদের লাইনে।[৩] গিনী বলেন, ঘটনা যখন ঘটছিল তখন সৈনিকরা মহিলাদের পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের অনেকের দৃষ্টিতে ছিল করুণার ছায়া। মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করলে কয়েকজন সৈনিকের চোখেও পানি দেখেছিল গিনী। তাদের সবাই খারাপ ছিল না। 'বালুচ' সৈন্যরা তাদের মধ্যে ভালো ছিল একথা মাহমুদা বেগম গিনী তার ভাষ্যে উল্লেখ করেন।[৪]

শিবলী নামের এক মুক্তিযোদ্ধা যে গ্রামে আসা-যাওয়া করতো তার খোঁজে পাক সেনারা প্রায়ই গ্রামে আসতো। অবশেষে ধান ক্ষেতে তার কয়েক সাথীসহ শিবলী পাক সেনাদের হাতে ধরে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় রাজাকাররাই শিবলী ও সহযোদ্ধাদের পাক সেনাদের হাতে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করে। শিবলীকে চারদিন আটকে রাখার পর ৯ মে হত্যা করা হয়।

আবার সেই বালকের গল্প। রায়হান পরের মাসগুলোতে সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার বেশ কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিল। একবার রায়হান পুলিশ একাডেমীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন পাক সেনা তাকে ধরে নিয়ে যায় বিভিন্ন প্রশ্ন করার জন্য। অবশেষে সেনাটি তাকে বলে যে, সে তাকে ছেড়ে দিতে পারে যদি সে (রায়হান) তাকে বাজার থেকে দুধ এনে দেয়। দুধ আনার জন্য রায়হানকে একটি দুধের পাত্র দিলে রায়হান সেটি নিয়ে বাজারে দুধের দোকানে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। অন্য একবার একজন সৈনিক তাকে সিগারেট এনে দিতে বললে সেবারও রায়হান দৌড়ে পালিয়ে যায় ও তাকে সিগারেট এনে দেয়নি।

একবার রায়হান মাঠের জমে থাকা পানিতে সাঁতার কেটে মাঠ পার হচ্ছিল যখন পাক সেনারা তাকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে কাছে ডেকে আনে ও কিছুক্ষণ পর তাকে ছেড়ে দেয়। একবার পাক সেনারা গ্রামে আসলে রায়হান বাড়ির পাশে গাছপালার ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে কিন্তু প্রতিবেশী এক রাজাকার পাক সেনাদের জানিয়ে দেয় কিছুক্ষণ আগেই সে রায়হানকে বাড়িতে দেখেছে এবং এরপরই তারা রায়হানকে বাড়ির পাশ থেকে ধরে নিয়ে পুলিশ একাডেমীর পাশে সেনাদের জন্য নির্মাণাধীন বাংকার নির্মাণে কাজে লাগিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর একজন অফিসার সেখানে পৌঁছে রায়হানকে কাজ করতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করে- কে তাকে সেখানে কাজে লাগিয়েছে? রায়হান নিশ্চিত যে ওই অফিসারটি বেলুচী ছিলেন, রায়হান দুই সৈনিককে দেখিয়ে বলেন- 'ওনারা'। অফিসারটি এরপর ওই দুইজনকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তিনি তারপর রায়হানকে পঞ্চাশ টাকা (অথবা কুঁড়ি টাকা হবে) তার পকেট থেকে দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বলেন।

www.pathagar.com

বিধবাটি। ওয়াজান জানে না তার বয়স কত। আমি যখন ২০০৪ সালে তার সাথে দেখা করি তখন তার বয়স ছিল আনুমানিক পঞ্চাশ। তাকে দেখেই মনে হয়েছিল সে কঠোর সংগ্রামের মাঝে বেঁচে আছে।[৫]

১৯৭১ সালে যেদিন তার পরিবারের সকলেই পদ্মা নদীর তীরে জমা হয়েছিল সে সময় তার দুটি পুত্র সন্তান ছিল যার একটি ছিল তার কোলে। পাক সেনারা তাদের কাছে আসে ও তাদের বলে বাড়ি ফিরে যেতে। অন্যান্য নারী ও শিশুদের সাথে ফিরে যাওয়ার সময় ওয়াজান দেখতে পান পাক সেনারা পায়ের বড় বড় জুতা দিয়ে কীভাবে তাদের লোকদের লাথি মারছে এবং গুলি করছে। পরে সবাইকে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় গুলি করে হত্যা করার পর।

তার স্বামী, তার ননদের স্বামী ও তার দেবরকে সে সময় হত্যা করা হয়। দু'টি শিশু সন্তান ছেড়ে তার স্বামী ও অন্যান্য আপনজনদের লাশের পাশে নদীর ধারে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে অন্যদের অনুসরণ করে ভারতে তার পিতা-মাতার কাছে চলে যায়, কিন্তু মাত্র তিনদিনের মাথায় আবার ফিরে আসে।

দু'বছর পর 'সোয়ালোস'- এ তাকে একটা চাকরি দেয়া হয়। এখানে কাজ করা সত্ত্বেও সে তার সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি, এখন সন্তানদের একজনের একটি দোকান আছে এবং অপরজন দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার স্বামী ও দেবরও দিনমজুর ছিল; তাদের কেউই কোনো রাজনীতিতে জড়িত ছিল না। ওয়াজানের আর একজন ছোট দেবরকে সে সময় বয়স কম হওয়ায় তাকেও নারী ও শিশুদের সাথে ছেড়ে দিয়েছিল পাক সেনারা। তবে সে বড় হয়ে ওয়াজান ও তার এক বিধবা চাচীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।

পুরুষটি। মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তারকে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিই বলা যেতে পারে।[৬] ইনিই রায়হানের পিতা। প্রায় আটাত্তর বছর বয়েসী আব্দুস সাত্তার লম্বা চওড়া সুঠাম দেহের অধিকারী ও মানসিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী, ১৯৭১ সালের দু:স্বপ্নের সে সব দিনগুলোর অভিজ্ঞতা এখনো পরিষ্কার মনে করতে পারেন। আব্দুস সাত্তারের মতো কাজে ও কথাবার্তায় অসাধারণ সুন্দর ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলার ন্যায় মানুষ খুব কম দেখেছি বাংলাদেশীদের মাঝে।

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার তার দোকান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দুপুরের খাবার খেতে গ্রামের বাড়িতে আসলে হঠাৎ সেখানে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা বলতে থাকে যে গোলাগুলির হাত থেকে বাঁচতে তাদের অবশ্যই নদীর ধারে পালিয়ে যাওয়া উচিত।

কাজেই অন্যদের সাথে আব্দুস সাত্তারও সেখানে পালিয়ে যান। সাত্তার উল্লেখ করেন যে কেউ একজন চলমান পাকিস্তানী সেনা ইউনিটের প্রতি গুলি চালায় এবং অন্যরা আরো কিছুপরে তাদের প্রতি গুলি চালালে পাক সেনারা পাল্টা গুলি চালিয়ে তাদের হটিয়ে দেয়। রায়হান ও অন্য সব মহিলারা ওই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে সাত্তার ও অন্য পুরুষরা সেনা বেষ্টিত হয়ে ওই স্থানে রয়ে যান। তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেনটির কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন আমার কাছে। (এখানে ক্যাপ্টেন বলতে ওই স্থানে সেনাদের নেতাকে বোঝানো হয়েছে যিনি প্রকৃতপক্ষে ক্যাপ্টেন নাও হতে পারেন)। ওই স্থানে পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন ওই অফিসারটি যিনি অন্য সকলকে আদেশ নির্দেশ দিচ্ছিলেন বলে সাত্তার উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

তার প্রশ্নের ধরণ ছিল এ রকম- কারা হিন্দু? কেউ যখন জবাব দিল না তিনি তখন একজনকে ওই লাইন থেকে টেনে বের করে পৃথক করে বললেন- 'বের হও, তুমি হিন্দু'? তারপর তোমাদের মধ্যে কে কে পুলিশের লোক? কেউ যখন কোনো জবাব দিল না তিনি তখন তাদের মধ্যে কয়েকজনকে টেনে আলাদা স্থানে রেখে বললেন- 'তোমরা-তোমরা পুলিশ'।

আমি সাত্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওই অফিসারটি যাদেরকে হিন্দু ও পুলিশ হিসেবে শনাক্ত করে পৃথক করেন তারা কি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও পুলিশের লোক ছিল কিনা? সাত্তার বলেন অফিসারটি একদম ঠিক ঠিক শনাক্ত করেছিল- *শালা কমপিটেন্ট ছিল*। অফিসারটি যাদের চিহ্নিত করেন তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করা হয় ও তাদের গুলি করে হত্যা করে পাক সেনারা।

আজিজুল আলম নামে একজন মোক্তার যিনি রাজশাহী কোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন, তাকেও ওই লাইন থেকে বের করে এনে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আলমকে তার নাম ধাম, ধর্ম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা হয় এবং এ পর্যন্ত তার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে। কিন্তু আলম তার কথা এখানেই থামায়নি, সে অফিসারটির মুখের উপরই কথা বলতে থাকে, বলতে থাকে..., 'আমি আওয়ামী লীগ করি, তোমরা যাই করো না কেন, দেশ স্বাধীন হবেই...'। এরপরই আলমকে গুলি করে সৈন্যরা।

'জিন্নাহ' নামে আজিজুল আলমের এক তরুণ ভাইপো ছিল। সে ছিল লম্বা, ফর্সা ও দীর্ঘ চোখের অধিকারী। সে পড়াশোনা করতো ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ক্যাপ্টেন তাকে বাঙালি বলে মানতে চাননি। তার নাম জিন্নাহ বলাতে ক্যাপ্টেন আরো আশ্চর্য হয়েছিলেন।[৭] সে অফিসারকে বলেছিল যে সে সত্যিই বাঙালি ও ওই পাশের গ্রামে বাস করে এবং ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এ সব শোনার পর ক্যাপ্টেন তার দেয়া তথ্যকে পরীক্ষা করার জন্য তার সাথে ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করেন। তাতেও তিনি বিশ্বাস করতে চাননি যে ওই যুবকটি একজন বাঙালি। এরপর তাকে চলে যেতে বলা হয় এবং অফিসারটিকে পাহারা দিয়ে যেসব সৈনিকরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের তিনি হুকুম দেন- *'জানে দো'*,-ওকে যেতে দাও।

বাকী লোকদের ক্যাপ্টেন বলেন, 'তোমরা সব ভারতীয়, সবাই তোমরা নদী পার হয়ে এখানে এসেছো'। এখানে ভৌগলিক অবস্থানটা লক্ষ্য করার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাত্তার ঘটনাস্থল নদীর তীরে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে ঘটনাস্থল আর অক্ষত ছিল না, কেননা পদ্মা তার প্রাকৃতিক নিয়মে প্রতিনিয়ত ভাঙ্গছিল এবং বর্তমানে ওই স্থানটি নদীর বেশ ভিতরে অল্প পানির নীচে চরের মতো জেগে আছে মাত্র।[৮] আমি নদীর অপর পারে ভারতের জমি ও গাছপালা দেখতে পেয়েছিলাম। ১৯৭১ সালে এপ্রিলে পদ্মা নদীতে তুলনামূলক কম পানিই ছিল ও সহজেই যে কেউ এপার ওপার করতে পারতো।

মনে হয় পাকিস্তানীরা ভেবেছিল লোকগুলো যারা পদ্মার তীরে জমা হয়েছে তারা গ্রামবাসী হতে পারে না, তারা ভারতীয় এজেন্ট, এরা নদী অতিক্রম করে এপারে এসেছে। পাক সেনাদের এই অভিযোগ গ্রামবাসীরা সবাই অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো লাভই হয়নি। ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন ছিল 'যদি তোমরা এখানকার গ্রামের লোক হবে তাহলে সকলে নদীর ধারে কি জন্য লুকাতে এসেছিলে?' গ্রামবাসীদের জবাব ছিল 'তারা গুলির শব্দে ভয় পেয়ে এদিকে পালিয়ে এসেছে', কিন্তু অফিসার তা মানতে রাজি ছিলেন না। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা আমাদের উপর গুলি ছুঁড়েছিলে কি জন্য?' তোমরা যদি সত্যিই এ গ্রামের লোক হও তাহলে আমরা তোমাদেরই সেনাবাহিনী, তোমাদের রক্ষা করবো এবং আমরা

www.pathagar.com

তোমাদের সেবক, কিন্তু তোমরা আমাদের উপর গুলিবর্ষণ করেছো।' সেনাবাহিনীর এ অভিযোগ আব্দুস সাত্তার স্বীকার করেন, বলেন হ্যাঁ, কিছু লোক অবশ্যই গুলি ছুঁড়েছিল। প্রাথমিকভাবে বাছাইকরা লোকদের (যেমন হিন্দু ও পুলিশের লোক) হত্যা করার পর বাকী অন্যদের ক্ষেত্রে একইভাবে জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এরই মাঝে উপস্থিত সেনা কর্মকর্তাটিকে মনে হচ্ছিল যে তিনি কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট থেকে ওয়াকিটকির মাধ্যমে কোনো নির্দেশ গ্রহণ করছিলেন, মনে হয়েছিল সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ওই ওয়ারলেস সেটের মাধ্যমে। এরপর তারা সেখানে যতো লোককে জড়ো করে রাখা হয়েছিল তাদের উপর বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়ে হত্যা করে। সাত্তারের বাম পায়ে ও বাম বাহুতে পাঁচটি গুলি লাগে। সে আমাকে তার আহত অকেজো বাম পা' টি দেখিয়েছে। মৃত ও আহত ব্যক্তিরা সেখানে পড়েছিল। তারপর সৈন্যরা মৃত দেহগুলো একস্থানে জমা করে। সাত্তারকেও টেনে নিয়ে যেয়ে ওইসব মরা ও আধমরাদের সাথে রেখে দেয়। এরপর তাদের উপর কেরোসিন তেল ছিটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয় সেনারা। সাত্তার আগুনের উত্তাপ অনুভব করেন, তবে তখন পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন এবং তার দেহের উপরে ও নীচে যারা ছিল তারা ছিল সকলেই মৃত। তার মনে হয়েছিল সৈন্যরা চলে যাচ্ছে ও চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সে কেরোসিন তেলে জবজবে ভেজা তার গায়ের জামা খুলে ফেলেন ও খুব দ্রুত নিজেকে ওই মরদেহের স্তূপ থেকে বের করতে সক্ষম হন। ততোক্ষণে সৈন্যরা চলে গিয়েছিল। সাত্তার হতবিহ্বল হয়ে টলমল করতে করতে তার নিজের বাড়ির দিকে রওনা দেন। তার আশেপাশে কেউ ছিল না, কেবল কয়েকটি কুকুর করুণস্বরে চিৎকার করছিল আশপাশে। সাত্তার চিৎকার করে তার স্বজনদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে থাকেন। তার গলার আওয়াজ শুনে আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে তার পরিবারের সদস্যরা বের হয়ে আসে। তারা সাত্তারের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়ার চেষ্টা করেন, কারণ তারা জানতো যে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পরদিন তারা ডাক্তারের খোঁজ করেন। সাত্তার কিছুদিন তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন, তার সুস্থ হয়ে উঠতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়। তবে বেশ দীর্ঘ সময় তাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়, এরপর সাত্তার ফিরে আসেন থানাপাড়ায় ।

সাত্তারের ভাষ্য অনুযায়ী সেদিন দু'টি সেনা ইউনিট রাজশাহীর দিক থেকে রাস্তা ধরে এ দিকে এসেছিল। পাঠান ইউনিটটি চলে যায় মুক্তারপুর ক্যাডেট কলেজের দিকে। অপর পাঞ্জাবী ইউনিট থানাপাড়া ও সারদা পুলিশ একাডেমীর দিকে আসে। সাত্তার আমাকে জানান মুক্তারপুর এলাকায়ও অগণিত লোক থানাপাড়ার ন্যায় পদ্মার তীরে জমা হয়েছিল, কিন্তু পাঠান ইউনিটের সেনারা তাদের চলে যেতে বলে, সেখানে কাউকে গুলি করে হত্যা করা হয়নি।

এদিকে সারদা পুলিশ একাডেমীতে অবস্থানরত সেনা ইউনিটগুলোকে বার বার বদলি করা হয়েছিল, তবে সব ইউনিটগুলোই ১৩ এপ্রিলের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ইউনিটের মতো ছিল না। এদের মাঝে অনেকেই ছিলেন ভালো মানসিকতার। সাত্তার এ রকম একজন ভালো অফিসারের কথা স্মরণ রেখেছেন যার নাম মেজর সফিউল্লাহ। ওই মেজর সফিউল্লাহ বছরের পরের দিকে সারদা পুলিশ একাডেমীতে সেনা ক্যাম্পে বদলি হয়ে আসেন। মেজর সফিউলাহ গ্রামবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন ও তাদের সাথে সহযোগিতা করে কাজ করতে চেষ্টা করতেন। তিনি তার নিজের সেনা সদস্যদের মাঝেও নিয়ম-কানুন বজায় রাখতে গ্রামবাসীর সহযোগিতা কামনা করতেন। সফিউল্লাহ তাকে ও গ্রামবাসীকে

www.pathagar.com

বলে দিয়েছিলেন যদি তার কোনো সৈনিক গ্রামে যেয়ে লুটতরাজ বা মহিলাদের সাথে অসম্মানমূলক আচরণ করে তবে তাকে যেন হত্যা না করে পিটিয়ে বিচারের জন্য তার (মেজর সফিউল্লাহ) কাছে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে গ্রামবাসী তার এ নির্দেশ অনুসরণ করেছিল। একবার একজন সিপাহী এক গৃহস্থের বাড়িতে ডুকে 'মুরগা মুরগা' (মুরগি) বলে আওয়াজ দিলে গৃহস্থের বউ শুকনো মরিচ মাখানো ঝাটা দিয়ে তার মুখে বারি দেয়। সিপাহীটি জ্বালা যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এরপর গ্রামবাসী তাকে ধরে মেজর সফিউল্লাহর সামনে হাজির করলে মেজর সাহেব বলেন -মনে হচ্ছে বিচারের আগে তাকে প্রথমে ডাক্তারের কাছে পাঠানো দরকার।

'জিন্নাহ' নামের যুবকটি। রাজনৈতিক 'অস্থিরতার' জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফেব্রুয়ারি মাসে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুহাম্মদ জিন্নাতুল আলম (জিন্নাহ) তার গ্রামের বাড়ি থানাপাড়ায় ফিরে আসেন।[১০] তাদের বাড়িটি ছিল সারদা পুলিশ একাডেমীর ঠিক দক্ষিণ পাশে। বাড়িতে তার ছোট চাচী ও দু'জন চাচাতো ভাই ছিল। অন্য চাচাতো ভাই শিবলী ভারতে ছিল, বাড়িতে ১৯ বছর বয়সের তার ছোট ভাই ও এক ভগ্নিপতিও ছিল।

সে সময় সারদা পুলিশ একাডেমীর বাঙালি অধ্যক্ষ খালেক সাহেব প্রথমে বাঙালি বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিতে ইতস্তত করেছিলেন, কিন্তু ঢাকায় বাঙালি পুলিশ বিদ্রোহের মতো ঘটনা তাকে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ক্যাপ্টেন রশিদ প্রথম থেকেই বিদ্রোহীদের পক্ষে ছিলেন খুব সক্রিয়। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা সারদা পুলিশ একাডেমীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।

সারদায় পঁচিশজন পশ্চিম পাকিস্তানী শিক্ষানবীশ ছিলেন যাদের সকলের বয়স ছিল প্রায় বাইশ বছর, তারা সকলেই বাঙালিদের দ্বারা গ্রেফতার হয়েছিলেন। আন্দোলনে যুক্ত কার্যকরী কমিটির আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা ওই পঁচিশজন পশ্চিম পাকিস্তানী শিক্ষানবীশকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। জিন্নাহ বলেন, সে ও অন্যান্য স্থানীয় বাঙালিরা এতে বাধা দিয়ে ওই পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভারতের বিএসএফ-এর হাতে তুলে দিতে কমিটির সদস্যদের রাজি করান। এ ঘটনাটি ঘটেছিল ১১ এপ্রিল। ওই দিনই বাঙালি অধ্যক্ষ খালেক সাহেব তার পরিবার নিয়ে অন্যত্র চলে যান।

পূর্বেই গোপালপুর নামক একটি স্থানে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল যখন বাঙালিরা এক পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর ও তার স্ত্রী এবং এক ক্যাপ্টেনকে গ্রেফতার করে মেজর -এর কান ও নাক কেটে দিয়েছিল।[১১] ১১ এপ্রিল একজন বিহারী ঈশ্বরদি থেকে পালানোর সময় আওয়ামী লীগ কর্মীরা তাকে ধরে হত্যা করার চেষ্টা করে। জিন্নাহ ও অন্য কয়েকজন তাদের থামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ওই বিহারী লোকটিকে প্রথমে গুলি করা হয়। কিন্তু জিন্নাহর দেয়া তথ্যানুযায়ী আওয়ামী লীগের কর্মীরা ঠিকমতো গুলিও করতে পারেনি আর তাই লোকটি মারা যায়নি। এরপর তারা তাকে জীবিত অবস্থায় বস্তায় ভরে চরে মাটি চাপা দেয়। জিন্নাহ পরে সেখানে যেয়ে মানুষের শব্দ শুনতে পান আর ওই স্থানের বালুর নড়াচড়া লক্ষ্য করেন। হত্যাকারীরা পরে ওই বিহারীকে চরের বালু খুড়ে উঠিয়ে নদীর পানিতে ফেলে দেয় বস্তা বন্দি অবস্থায়। ওই দুর্ঘটনার প্রধান দুস্কৃতিকারী ছিল একাডেমীর ভাইস প্রিন্সিপালের গাড়ির চালক।

১৩ এপ্রিল বিদ্রোহীরা ওয়্যারলেসে খবর পায় ঢাকা থেকে পাকসেনাদের একটি দল রাজশাহীর পথে অগ্রসর হওয়ার (ধৃত পশ্চিম পাকিস্তানী মেজর ও অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের

www.pathagar.com

খবরের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ)[১২]। সেনাদল ঝলমলিয়া নামক স্থানে পৌছালে বিদ্রোহীরা পাকসেনাদের মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে, কারণ সারদা পুলিশ একাডেমীতে মজুদ ছিল কেবলমাত্র দু'তিনশ' থ্রি নট থ্রি রাইফেল। বলা হয় যে ১৫৪ টা গাড়িতে পাক সেনারা আসছিল। কিন্তু সৈনিকরা গাড়ি নয় পায়ে হেটে প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল এবং তাদের চলার পথে যা কিছু সামনে পড়ছিল সবই তারা তছনছ করে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছিল ও এতে সৃষ্টি হয়েছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর। তাদের সাথে এমন কিছু বস্তু ছিল যা গুলির মতো ছুঁড়লে ঘর-বাড়িতে আগুন ধরে যেত যাতে লোকজন আতংকিত হয়ে পড়তো।

জিন্নাহ ও ওই এলাকার অন্যান্য সব লোকজন নিজ নিজ অবস্থান ত্যাগ করে নদীর ধারে পৌছে নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করে। নদীতে তখন পানি কম থাকলেও সেখানে পর্যাপ্ত নৌকা ছিল না। জিন্নাহ ও তার চাচাতো ভাইরা সাঁতরে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অল্পতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ওই সময় তারা একটি কাঠের ভেলা ভেসে যেতে দেখলে জিন্নাহর ভগ্নিপতি তা ধরে নদী পার হতে উদ্যত হয়। তখন জিন্নাহ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন যে, তিনি কীভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছেন? জিন্নাহর ছোট ভাইও ভেলায় চলে যেতে চাইলে তাকেও তিনি থামিয়ে দেন। তবে অন্যান্য মানুষজন ভেলায় চড়ে নদী পার হয়ে অপর পাড়ে চলে যেতে সক্ষম হয়।[১৩]

জিন্নাহ ও অনেকেই এপারে আটকে থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনীর লোকজন সেখানে পৌছে তাদের সকলকে উপরে উঠে আসতে বলে। সৈনিকরা তাদের বলে, ক্যাপ্টেন সাহেব তাদের সাথে কথা বলতে চান এবং তারপর তারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। আমি জিন্নাহকে ওই অফিসারের ইউনিফর্মের বর্ণনা দিতে বললে সে জানিয়েছিল, তার কাঁধের লেবেলে তিনটা ফুল অর্থাৎ তারা ছিল। এর অর্থ ওই অফিসারটি সম্ভবত ক্যাপ্টেন র‍্যাংকের ছিলেন। জিন্নাহ সন্দেহ করেছিলেন ক্যাপ্টেনের মাধ্যমে ডেকে তাদের গুলি করে হত্যা করা হবে, কিন্তু উঠে উপরে না আসা ছাড়া কোনো বিকল্প রাস্তাও ছিল না। তিনি মহিলা ও শিশুদের অন্যদের থেকে পৃথক করে দিতে দেখে সব পুরুষ মানুষকে গুলি করে হত্যা করার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন। অফিসারটি নিজে সবার মাঝ থেকে হিন্দু, পুলিশ ইত্যাদি বেছে বেছে আলাদা করছিল। সে নিজে এক হিন্দুকে গুলিও করে। লোকটি মাটিতে পড়ে গেলে তার শরীর থেকে গলগল করে রক্ত বের হতে থাকে। পরের লোকটিকে পুলিশ হিসেবে বিবেচনা করে পাঁচ ছয়টা গুলি করে হত্যা করা হয় (যদিও লোকটি পুলিশের সদস্য ছিল না)। এভাবেই হিন্দু ও পুলিশ বলে একের পর এক নিজের অস্ত্র দিয়ে নিজেই গুলি করে হত্যা করছিল ওই অফিসারটি। সৈনিকরা স্রেফ জড়ো হওয়া লোকগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। এক সময় পাশে দাঁড়ান তার বন্ধু জিন্নাহকে বলেন, তোমাকে ডাকছে। জিন্নাহ কিছুক্ষণ না দেখার ভান করলেও শেষমেষ তাকে সাড়া দিতে হয় ।

অফিসারটি তাকে উর্দুতে জিজ্ঞেস করেন, তুমহারা নাম কিয়া হ্যায় (তোমার নাম কি?) 'জিন্নাহ'-উত্তর শুনেই অফিসারটি তাকে তার পুরো নাম জানতে চান। জিন্নাহ তাকে বলেন- মুহাম্মদ জিন্নাতুল আলম।[১৪] সে কি করে-এর জবাবে জিন্নাহ জানান সে একজন ছাত্র। কোথায় পড়াশোনা কর? ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। দু'জনই তখন কথা বলেছিলেন উর্দু ও ইংরেজীতে।

অবশেষে অফিসারটি তাকে বলেন, তারা তাকে হত্যা করবে না তবে সে তাদেরকে জানাবে কারা কারা মুক্তিযুদ্ধে জড়িত? জিন্নাহ বলেন, সে ময়মনসিংহ থাকার কারণে তার এলাকার

www.pathagar.com

কে কি করে তার জানা নেই। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে অফিসারটি তার কাঁধে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করেন। তারপরও তাকে সেখান থেকে সরে অল্প দূরে বসতে বলা হয়। আরো কয়েকজনকে সম্ভবত অর্ধ ডজন পুরুষকে এভাবে ভিন্ন কাতারে বসতে বলা হয় ও অনেককে চলে যেতে দেয়া হয়। জিন্নাহ স্মৃতিচারণ করে বলেন এদের মধ্যে একজনের মুরগির খামারের ব্যবসা ছিল।

এদিকে ওয়্যারলেসে সব সময় খবর আসছিল। এক পর্যায়ে জড়ো হওয়া লোকগুলোকে বৃত্তাকারে ঘিরে যে সৈনিকরা দাঁড়িয়েছিল তারা পিছনে সরে বৃত্তটাকে আরো বড় করে দাঁড়ালে ক্যাপ্টেন নিজের অস্ত্র দিয়ে সবার উপর গুলি চালান। একজন সৈনিক ক্যাপ্টেনের পিছনে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা গুলির ম্যাগাজিন ক্যাপ্টেনকে সরবরাহ করে। দৃশ্যটা ছিল ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। তাদের কয়েকজন সৈনিক একটু দূরে বসে আতংকের সাথে এ দৃশ্য দেখছিল।

হত্যাকাণ্ডের পর বাকী লোকদের ছোট দলটাকে ক্যাপ্টেন ও সৈনিকদের সাথে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ একাডেমীতে । একাডেমীতে জিন্নাহ বেশ কয়েকটি আর্মি জীপ ও উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের দেখেছিলেন যাদের মধ্যে একজনকে তিনি ব্যাজ দেখে 'কর্নেল' হিসেবে ধারণা করেন। তারা (উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা) ভালো কাজ করার জন্য ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানান। অবশ্য একই সাথে জানতে চান -এগুলোকেও সাবাড় না করে জীবিত নিয়ে আসলে কেন?

ঠিক এ সময়ে জিন্নাহ খেয়াল করেন যে মৃতদেহের ওই স্তুপের ভিতর থেকে কেউ কেউ উঠে পালাচ্ছে। এ দৃশ্য সৈনিকদেরও কেউ কেউ দেখে ফেলে আবার ওই স্থানে গিয়ে পলাতকদের উপর পুনরায় গুলি করে মাটিতে ফেলে দেয়। ক্যাপ্টেন সাহেব নিজেও আবার তাদের উপর গুলি চালায়। এক সময় জিন্নাহর মনে হয় সে যেন তার ছোট ভাইয়ের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, যাকে সেখানে গুলি করা হয়েছিল। এ দু:স্বপ্নের সারাটা সময় জিন্নাহর বার বার তার বিধবা মায়ের কথা মনে পড়ছিল, অন্যদিকে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে জিন্নাহ হারিয়েছিল তার পিতাকে। সে তার ভাই ও ভগ্নীপতির কথা চিন্তায় আনছিল না, এখন তার বিধবা মায়ের জন্য আর কেউই থাকবে না এ চিন্তাই তাকে সর্বক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল।

জিন্নাহ জানান তার চাচা আজিজুল আলম সামান্য ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতেন কিন্তু গরম আবহাওয়ায় থাকতেন তুলনামূলকভাবে সুস্থ। জিন্নাহ তার চাচাকে মৃত দেহের স্তুপের মাঝে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, এতো জুলুম কেন ? এরপরই ক্যাপ্টেন তাকে গুলি করে ।

এক সময় ক্যাপ্টেনের মনে হতে থাকে যে, তার গুলিতে সবাই হয়তো মারা যায়নি। তিনি ওই ছোট দলটাকে যাদের ইতোমধ্যে গুলি করা হয়নি তাদের সব মরা মানুষের দেহগুলোকে একস্থানে গাদা করার জন্য হুকুম দেন। এভাবে লাশ গাদা করার সময় লাশের মাঝে জিন্নাহ তার একজন শিক্ষকের লাশ বিবস্ত্র অবস্থায় দেখলে তিনি তার শিক্ষকের পরণের লুঙ্গিটা শ্রদ্ধার সাথে সঠিক স্থানে পুনরায় পড়িয়ে দিয়েছিলেন। একজন সিপাহী এ দৃশ্য দেখে তার প্রতি চিৎকার করে বলে ওঠে শীঘ্রি তাকেও এ পরিণতি ভোগ করতে হবে। লাশ গাদা করার সময় জিন্নাহ সামনে রাখা লাশের স্তুপের উপর পড়ে গেলে তার সারা শরীরও রক্তাক্ত হয়ে যায়।

এরপর ক্যাপ্টেন যারা লাশগুলোকে এক জায়গায় গাদা করার কাজে নিয়োজিত ছিল তাদের লাশগুলোর নিকটে লাইন হয়ে দাঁড়াতে হুকুম দেন, এ পরিস্থিতিতে জিন্নাহ মরিয়া হয়ে

www.pathagar.com

উঠে তাকে প্রাণে না মারার জন্য ক্যাপ্টেনের কাছে যাওয়ার মনস্থির করেন। এরূপ জীবন মরণ প্রশ্নে মরিয়া হয়ে ওঠার মতো পরিস্থিতিতে জিন্নাহ অগ্রসর হতে থাকেন ক্যাপ্টেনের দিকে। যে সিপাহীটি তাকে অপছন্দ করেছিল, সে এই দৃশ্য দেখে জিন্নাহকে বিরত করার চেষ্টা করে ক্যাপ্টেনের নিকট যাওয়া থেকে। অন্য একজন সৈন্য বা অফিসার হবে (যা জিন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি) সে সেখানে হস্তক্ষেপ করে জিন্নাহকে ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে সাহায্য করে, জিন্নাহর ধারণা সেই সাহায্যকারী লোকটি ছিল সিন্ধি।[১৫] সেখানে অস্ত্র হাতে দাঁড়ানো ওই অফিসারটির গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। যে সৈনিকটি জিন্নাহকে পছন্দ করেনি অফিসারটি সেই সৈনিকটিকে এ বলে চলে যেতে বলেন যে, একজন লোক যদি তার প্রাণের জন্য কারো অনুগ্রহ কামনা করে তাতে তোমার কি ক্ষতি? এতে সৈনিকটা সেখান থেকে ফিরে যায়। এরপর সিন্ধি অফিসারটি জিন্নাহকে ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে উৎসাহিত করেন যাতে জিন্নাহ সুযোগ পায় প্রাণে বাঁচার। অফিসারটি জিন্নাহর সাথে কিছু দূর এগিয়ে গেলেও ক্যাপ্টেনের কাছে পৌছানোর পূর্বেই জিন্নাহকে ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে যাও বলে থেমে যান ও সেখান থেকে চলে যান।

জিন্নাহ ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়িয়ে তার জীবন ভিক্ষা চায়। সে ক্যাপ্টেনকে তার বিধবা মায়ের কথা বলে। আরো বলে যে তার ভাই ইতোমধ্যে নিহত হয়েছে এবং সেও যদি এখন মারা যায় তবে তার বিধবা মাকে দেখার আর কেউ থাকবে না। ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ তার পানে তাকিয়ে থাকেন এবং কি যেন চিন্তা করে বলেন, 'ও হ্যা তুমি সেই যার সঙ্গে আমার আগেই কথা হয়েছিল আর তুমি কৃষি কলেজে পড়াশোনা করো, তাহলে তোমার মা সত্যি বিধবা? এরপর বললেন, ঠিক আছে তাহলে তুমি যেতে পার, তুমি যাও, আমি তোমাকে যেতে দিলাম।' জিন্নাহ হাটা শুরু করলেও প্রতি মুহূর্তে ভয়ে ভয়ে ছিলেন এ আতংকে যে যদি পিছন থেকে গুলি করে দেয় যা ইতোপূর্বে অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিন্তু কিছুই ঘটেনি, তিনি হেঁটে ওখান থেকে চলে যেতে পেরেছিলেন।

আমি ড. আলমকে (জিন্নাহ) সেই ক্যাপ্টেনের বর্ণনা দিতে বলেছিলাম যার তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন। আলম বলেছিলেন ক্যাপ্টেন তার চেয়েও লম্বা ছিল ও সুন্দর চেহারার নিষ্ঠুর স্বভাবের লোক ছিল। আমি জিন্নাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম অফিসারটি এতো নিরস্ত্র ও অসহায় লোককে হত্যা করেছিল সে পাগল ছিল কি না? একভাবে চিন্তা করলে তাকে পাগল বলা যেতে পারতো- উত্তরে বলেছিলেন জিন্নাহ। তার কাছে আরো জানতে চেয়েছিলাম- কি চিন্তা করে ক্যাপ্টেন তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন? জিন্নাহ নিশ্চিত বলতে পারেননি, তবে তার মনে হয় বিধবা মায়ের কথা ক্যাপ্টেনের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল, হয়তোবা এমনও হতে পারে ক্যাপ্টেন নিজে একজন বিধবার সন্তান ছিলেন। আবার জিন্নাহ নামটার কারণেও হতে পারে। তবে বলা খুব মুশকিল কি কারণে ক্যাপ্টেন তাকে রেহাই দিয়েছিলেন।

আলম বলেছিলেন, 'আমি সব সেনাবাহিনীকে ঘৃণা করি, আপনাদের, আমাদের ও সকলের সেনাবাহিনীকে'। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাশবিক অত্যাচারের ব্যাপারে আমাকে একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ঢাকার ড. আবুল কালাম। প্রকৃত সত্য ও বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে বন্দুক যার হাতেই যাবে সেই সাধারণ মানুষের সাথে এ ধরনের আচরণ করবে এটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক, কেবল পাকিস্তান সেনাবাহিনী-এর ব্যতিক্রম হবে না নয়। জানে বেঁচে যাওয়ার পর জিন্নাহ তার চাচীর বাসায় যান ও চাচীকে তার সাথে আসতে বললে তিনি জিন্নাহকে বলেন যে তার চাচা না আসা পর্যন্ত তিনি বাসা ত্যাগ করতে পারবেন না। অত:পর জিন্নাহ

www.pathagar.com

গ্রাম ত্যাগ করে নানার বাড়ি চলে যান-এরপর সেখানে তার মায়ের কাছে পুরো ঘটনার বর্ণনা দেন। পরদিন তার নানা টমটম[১৬] (ঘোড়াগাড়ি) নিয়ে থানাপাড়া যান নিখোঁজ হয়ে যাওয়া অন্য সব আত্মীয়ের সন্ধানে। শ্রমিকরা যেতে অনীহা প্রকাশ করে, এবং তাদের ভোলানো হয় মিষ্টি কথা বলে ও হুমকিও দেয়া হয়েছিলো। তাদের বাকী গল্প জিন্নাহ আগেই শুনেছিলেন।

তার ভগ্নিপতির লাশটা সেখানে স্তূপিকৃত অন্যান্য লাশ থেকে দূরে পড়েছিল- এবং দেখে মনে হয়েছিলো প্রথম দফায় গুলি করে হত্যা করার পর যারা পালাতে চেষ্টা করেও দৌড়ানো অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তার ছোট ভাইয়ের লাশ তাদের নিজেদের বাড়িতে পাওয়া যায়। আলমের বাকী জীবনটাকে এসব দুঃস্বপ্ন তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। তার ভাই যেভাবেই হোক বেঁচে যান এবং বাড়ি ফিরে আসেন, কিন্তু আহত হয়েছিলেন ও শরীরের একদিক পুড়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তাকে সাহায্য করার কেউই ছিল না। পরে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি দোতলায় তার ঘড়ে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে রান্না ঘড়ে আসেন এবং কুয়া থেকে পানি তুলতে চেষ্টা করেন। অবশেষে সেখানে সঙ্গীহীন অবস্থায় কোনো প্রকার সাহায্য না পেয়ে মারা যান।

আমি ২০০৪ সালে যখন মুহাম্মদ জিন্নাতুল আলম জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করি তখন তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর। তার গায়ের রং সাদা ধবধবে, চোখ ছিল চওড়া নীলাভ ও তার মুখে ছিল দাঁড়ি। জিন্নাহ স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলছিলেন এবং সাবলীলভাবে ইংরেজী ও উর্দুতে কথা বলতে পারেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আমেরিকার ফ্লোরিডা ও আরকানসাসে পড়াশোনা করেন এবং আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। যখন বিল ক্লিনটন আরকানসাসের গভর্ণর ছিলেন ও হিলারী ক্লিনটন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়াতেন সে সময় জিন্নাহ ছিলেন লিটল রকে ।

মুহাম্মদ জিন্নাতুল আলম জিন্নাহর জীবনটা মনে হয়েছে যেন বেদনাত্মক সব ঘটনায় ঘেরা। তার স্ত্রী ক্যান্সারে মারা গেছেন, তার যে কন্যাটি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করেছিল দেশে ফেরার পর সেও মারা যায়। একটি পুত্র সন্তানও মারা যায় তার।

আমি যখন তার সাথে সাক্ষাত করি তখন তার বিধবা শ্যালিকা মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ স্ট্রোক করে মারা যান। আমি বাড়িতে তার একমাত্র বেঁচে থাকা কন্যা, থানাপাড়ার দুর্ঘটনায় বিধবা হয়ে যাওয়া বোন ও তার কন্যাকে দেখেছিলাম। আলম গভীরভাবে তার ধর্মে বিশ্বাসী আর সামনের মাসে আবারও একবার হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। জিন্নাহ আমাকে বলেন তিনি বিশ্বাস করেন কেউ অতীতে কোন খারাপ কাজ করলে তার জন্য তাকে খারাপ পরিস্থিতিতে পরতে হবে। যদিও তিনি আমাকে সেভাবে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, কিন্তু আমি যেটা প্রচণ্ডভাবে উপলব্ধি করেছি সেটা হচ্ছে জিন্নাহ তার ভাই ও ভগ্নিপতিকে নদীতে কাঠের গুড়ি ধরে পদ্মা নদীর অপর পাড়ে যেতে দিতে বাধা দেয়ার জন্য তাদের যে মৃত্যু হয়েছিল সেজন্য নিজেকে অপরাধী হিসেবে ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন তার ভাগ্যে অবশ্যই লেখা ছিল তিনি জীবনে একাই বেঁচে থাকবেন বা একাই পথ চলবেন। আর সেজন্যই সেদিন একমাত্র তিনিই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন আশীর্বাদ হিসেবে যা তার জন্য একইসাথে অভিশাপও ছিল বটে।

www.pathagar.com

দি কমান্ডিং অফিসার। ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. ক. মুহাম্মদ তাজ ২৫-২৬ মার্চের রাতে ঢাকায় সামরিক অভিযানের পর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ ধরে সেই সেক্টরের সামরিক শাসক হিসেবে ঢাকায় ছিলেন। এরপর তিনি ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবের অধীনে ৫৭ ব্রিগেডের অন্যান্য ইউনিটসহ আরো একটি গোলযোগপূর্ণ স্থান রাজশাহীর দিকে অগ্রসর হন।[১৭]

লে. ক. তাজকে আরিচা, নগরবাড়ী, পাবনা হয়ে রাজশাহী যেতে হয়েছিল। আরিচা পর্যন্ত হ তারা কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়েননি। সেখানে তাদের নদী পার হতে হয়। নগর বাড়িতে তাদের সাথে যুদ্ধ হয় বিদ্রোহীদের এবং অল্পসময়ের মধ্যেই সেনাবাহিনী তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। বিদ্রোহীরা পাকা রাস্তা কেটে রেখেছিল যার ফলে পাক সেনাদের সেই রাস্তা নতুন মাটি দিয়ে ভরাট করে তবেই সামনের দিকে অগ্রসর হতে হয়। লে. ক. তাজ নগরবাড়ীতে অবস্থানকালীন পাবনা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে অন্যান্য ইউনিট আগেই রওনা হয়ে যায়। পরে তাজ রাজশাহী যান।

তাজ জানান, পাবনার রাস্তায় অগণিত অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশুদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল যাদের বিদ্রোহী বাঙালিরা হত্যা করেছিল নৃংশসভাবে। পাবনা থেকে রাজশাহী যাওয়ার পথে পাকসেনাদের উপর বিদ্রোহীরা হামলা করেছিল যাতে বেশ কয়েকজন পাক সেনা হতাহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

বাঙালি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সর্বত্র অবাঙালিরা তাদের যেখানে-সেখানে নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করার অভিযোগ আনে।

লে. ক. তাজ রাজশাহী পৌছানোর পর সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং সেখানে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যশীল বাঙালি ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের সাথে সাক্ষাত করেন। তাজ ভাইস চ্যান্সেলর-এর নিকট জানতে চান সেখানে কোনো দুষ্কৃতিকারী রয়েছে কিনা? ভাইস চ্যান্সেলর তাকে জানান-না কোনো দৃস্কৃতিকারী নেই, তবে অনেক অবাঙালি সেখানকার ব্যারাকে আটকা পড়েছিল যার অবস্থান জানিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর তাদের উদ্ধার করার জন্য লে. ক. তাজকে অনুরোধ করেন। তাজ সে সব অবাঙালিদের উদ্ধার করে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজ নিজ বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দেন। লে. ক. তাজ বলেন -রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি যার প্রতি তার রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমান্ডোদের স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের কিংবদন্তি প্রতিষ্ঠাতা মেজর জেনারেল এ ও মিঠাকে ১৯৭১ সালের মার্চের শেষে ও এপ্রিলের প্রথম দিকে বিশেষভাবে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তিনি একটি ব্রিগেডের রুট বা পথ অনুসরণ করে আকাশ পথে উড়ে যাওয়ার সময়কালীন একটি ঘটনার নজির উপস্থাপন করে লিখেছেন- 'আমি লক্ষ্য কর-ছিলাম যে রাস্তার দু'ধারে অনেক গ্রামের সকল বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ওই সব গ্রামে প্রাণের কোনো অস্তিত্বও ছিল না'। ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব যিনি সে সময় তার ব্রিগেড নিয়ে ঢাকা থেকে রাজশাহীর পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, পথে তারা কোনো প্রতিরোধের মুখোমুখি হননি। ব্রিগেডিয়ার আরবাব জানান তিনি 'প্রোফিলেকটিক ফায়ার পদ্ধতি' অনুসরণ করে ৩ ইঞ্চি মর্টার থেকে ধোয়া সৃষ্টিকারী ও হাই এক্সপোসিভ শেল দ্বারা গোলা বর্ষণ করেন যাতে উগ্রবাঙালি বিদ্রোহীরা গ্রামগুলোতে আশ্রয় না নিতে পারে। তিনি বলেন 'ইষ্টার্ণ কমান্ডার ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল টিক্কা খানের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা এ কৌশল অবলম্বন করেছিলাম।' তবে

www.pathagar.com

জেনারেল মিঠা লিখেছেন, জেনারেল টিক্কা খান এ ধরনের কোনো কৌশল প্রয়োগের পরামর্শ কাউকে দেননি। এবং এ কথা জানার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে আসেন অবস্থা যাচাই করতে। জেনারেল টিক্কা 'তার নাম ব্যবহারের জন্য আরবাবকে হালকাভাবে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন আর যেন এরূপ না করা হয়। আমি মনে করি কাউকে একটি কঠোর ভাষায় বকা দেয়ার সামর্থ্য টিক্কার ছিল না'।[১৮]

লে. ক. তাজের ভাষ্য অনুযায়ী রাজশাহীর পথে যাত্রাকালে ব্রিগেডিয়ার আরবাব তার পিছনে ছিলেন। লে. ক. তাজ জানান তিনি ও তার ৩২ পাঞ্জাবের লোকজন সারদায় যাননি, সেখানে গিয়েছিল ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট। এটা হতে পারে যে সেখানে ব্রিগেডিয়ার আরবাব গিয়ে থাকতে পারেন। যদিও তাজ এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত নন। লে. ক. তাজ বলেন, তিনি রাস্তায় কোনো গ্রামে অগ্নিসংযোগ করেননি, কিন্তু তার পিছনে কি ঘটেছিল তা তার জানা ছিল না। লে. ক. তাজ তার স্মৃতি রোমন্থন করে জানান, তিনি ১৩ এপ্রিল রাজশাহী পৌঁছান। ২১ অথবা ২২ এপ্রিল লে. ক. রিজভী রাজশাহী পৌঁছে তার দায়িত্ব বুঝে নিলে লে. ক. তাজ তার কয়েকদিন পর রাজশাহী ত্যাগ করেন।[১৯] ব্রিগেডিয়ার আরবাব তারও আগে রাজশাহী ত্যাগ করেছিলেন। তাজ বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকবাল দিবস পালিত হয়েছিল ও তিনি (তাজ) ওই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেছিলেন।[২০]

দি লেফটেন্যান্ট। ঢাকা অভিযানের পর এ তরুণ অফিসারটি তার ইউনিট ১৮ পাঞ্জাব-এর সাথে পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া যান। ওই সব অঞ্চলে ছোট ছোট গ্রুপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ২৫ পাঞ্জাব বেশ অসুবিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সেনাদল বিদ্রোহীদের হাতে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সারদা পুলিশ একাডেমী দখলে করে রেখেছিল বিদ্রোহীরা। সেনাবাহিনী সেখানে যাওয়ার পর প্রতিরোধের মুখোমুখি হলেও তা দখলে নিতে সক্ষম হয় দেড় থেকে দু'ঘন্টার মধ্যে। এ ক্ষেত্রে কোনো ভারী সমরাস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি, কেবল রাইফেল ও হালকা মেশিনগান দিয়েই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রথমে মূল ভবনের দখল নেয়া হয় যেখানে কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে ছিল। এ সেনা কর্মকর্তা উল্লেখ করেন সম্ভবত সেখানে বিদ্রোহীদের বিশ থেকে পঁচিশজন হতাহত হয়েছিল; হয়তো একটি অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছিল কিন্তু ওটার সাথের মানুষটি ছিল নিখোঁজ। কেউ নিশ্চিত হতে পারছিল না যে অস্ত্রের মালিক বিদ্রোহীটি কি মারা গেছে না পালিয়ে গেছে?

এরপর এ তরুণ অফিসারটি একাডেমীর নিকটবর্তী নদীর পাড়ে যান। সেখানে গ্রামবাসী ও বিদ্রোহীরা জমা হয়েছিল এবং অনেকেই নদী পার হয়ে অপর পারে পালিয়ে গিয়েছিল। 'আপনি ওখানে কি করছিলেন?' জানতে চাইলে কর্মকর্তাটি বলেন, 'কিছুইনা'। ওখানে কোনো প্রতিরোধ ছিল না, তাই কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে এসেছিলেন।[২১]

৫৭ ব্রিগেডের অফিসারদের মতে সারদা একাডেমী দখল করার সময় সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে যারা সেখানে ছিলেন তারা হচ্ছেল- ১৮ পাঞ্জাবের অধিনায়ক লে. ক. বাশারাত সুলতান, মেজর মদদ হুসেন শাহ (যিনি মূলতঃ এ কোম্পানীর কমান্ডার হলেও উপ অধিনায়কের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছিলেন। কারণ ঢাকায় এ্যাকশনের প্রেক্ষিতে প্রকৃত উপ-অধিনায়ক নার্ভাস ব্রেক ডাউনের শিকার হয়েছিলেন) এবং সি কম্পানীর কমান্ডার মেজর জামিল মাসুদ। এরপর তারা রাজশাহী চলে যান ও সেখানে রেখে যান ক্যাপ্টেন মুজাফফর আওলাদ হুসেনের নেতৃত্বাধীন 'বি' কোম্পানীকে।[২২]

যে লেফটেন্যান্টটি সারদা পুলিশ একাডেমীর পাশে পদ্মার পাড়ে গিয়েছিলেন তিনি দৃঢ়তার

www.pathagar.com

সাথে জানিয়েছেন সেখানে কোনো নারী-পুরুষকে আলাদা করা হয়নি বা কোনো হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও ঘটেনি; অন্তত: তিনি যতোক্ষণ ওখানে ছিলেন ততোক্ষণ তো নয়ই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তিমকালে একজন বৃটিশ বিচারক যিনি পূর্বে কখনোই ভারতবর্ষে ছিলেন না তার এক কলমের আঁচড়ে থানাপাড়াকে ১৯৪৭ সালে অপ্রশম্য দু'টি শত্রু রাষ্ট্রের মাঝে একটি আন্তর্জাতিক সীমানায় পরিণত করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে থানাপাড়ার অরক্ষিত সীমান্ত পরিণত হয়েছিল বিদ্রোহী ও অনুপ্রবেশকারীদের একটি মিলনস্থলে। তা সত্ত্বেও ১৩ এপ্রিলের হত্যাকাণ্ডটি অবশ্যম্ভাবী ছিল না।

অনেক ঘটনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। থানাপাড়ার ভুক্তভোগী বাঙালিদের অনেকে জানিয়েছেন বিদ্রোহী বাঙালিরা প্রথমে গুলি ছুঁড়েছিল যার ফলস্বরূপ পাক সেনারা-এর প্রতিক্রিয়ায় বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। সম্ভবত কেউ যদি বাজারে তাদের প্রতি গুলি না ছুঁড়তো তাহলে তারা হয়তো তাদের গন্তব্যে যেভাবে যাচ্ছিল সেভাবেই চলে যেত এবং 'দুস্কৃতিকারী খোজার জন্য গ্রামে প্রবেশ করতো না। বিদ্রোহীরা গ্রামে আশ্রয় নেয়ার ফল হয়েছিল যে গোটা গ্রামবাসী সেনাবাহিনীর হামলার ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। এমনকি যাদের সহানুভূতি ছিল ' মুক্তিযোদ্ধাদের' প্রতি তাদের মাঝেও এনিয়ে ক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে। তারা মনে করেন যে যেখানে পাক সেনাদের সাথে মুখোমুখি লড়াই করার সামর্থ্য তখন বিদ্রোহীদের ছিল না তাই দুয়েকটি চোরাগোপ্তা বা বিচ্ছিন্নভাবে গুলি ছুঁড়ে প্রকারান্তরে নিরস্ত্র বেসামরিক জনতাকে সেনাবাহিনীর ক্রোধের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। অথচ এ থেকে কোনো লক্ষ্যই অর্জিত হয়নি।

থানাপাড়া যুদ্ধের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মানবিক ও আমনবিক মানসিক যন্ত্রণার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যেন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার মতো। যে সৈনিক বা অফিসারটি যিনি বালক রায়হান আলীকে মহিলা ও শিশুদের সাড়ি থেকে পুরুষদের পৃথক করার সময় টেনে নিয়েছিলেন তিনি নি:সন্দেহে ওই বালকটির জীবন বাঁচিয়েছিলেন। তিনি একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাকে ওই সাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এ মনে করে যে তাকে জেরা করে হত্যা করার ক্ষেত্রে সে ছিল নিতান্তই একজন বার বছরের বালক। আবার ওই একই ব্যাক্তি রায়হানের পাশের লোকটিকে প্রচণ্ড আঘাত করে লাথি মারেন যে লোকটি ভেবেছিল যে তাকে ওই সাড়ির বাইরে আসতে বলা হয়েছিল। তিনি ওই লোকটিকে সেখানে বসে থাকতে বলতে পারতেন, তা না করে সেখানে তাকে প্রচণ্ড জোরে লাথি মেরেছিলেন। বার বছর বয়সের একজন বালকের জীবন ও মর্যাদা বাঁচানোটা সেই সময়কার পরিস্থিতিতে সামান্য ব্যাপার হতে পারে কিন্তু যেটা সম্ভবত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হচ্ছে বালক যাকে পুরুষদের সাঁড়ি থেকে মহিলাদের সাঁড়িতে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও পাক সেনাদের বুটের লাথি ও গুলি যারা খেয়েছিলেন তাদের অনেকেই সাক্ষ্য দেন যে সকল পাক সেনা সদস্যই নিষ্ঠুর ছিল না- তাদের কেউ কেউ মানসিক যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। এবং অনেকেই গ্রামের লোকদের সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিলেন। যে সৈনিকরা মহিলা ও শিশুদের পাহারা দিয়ে রেখেছিল তাদের অনেককেই চরম দু:খ ভারাক্রান্ত মনে হয়েছিল। অনেকের চোখে দেখা গিয়েছিল অশ্রু। একজন সৈনিক যখন জিন্নাতুল আলম জিন্নাহর প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করেছিল তখন অপর একজন সৈনিক বা নিম্ন পদস্থ কর্মকর্তা সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তার নিকট যেয়ে প্রাণ ভিক্ষার জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করেন ও তার সাথে কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়েও যান। থানাপাড়ায় অফিসারটি উপস্থিত সকল পুরুষ গ্রামবাসীকে নিজে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু অন্য একজন অফিসার যিনি অনুরূপ আরেকটি স্থান যেটি

www.pathagar.com

সেখান থেকে অল্প দূরে নদীর তীরে ছিলেন সেখানে কোনো লোককে হত্যা করেননি। ওই বছরের পরের দিকে একজন সেনা কর্মকর্তা রায়হানকে জোর করে যেখানে কাজ করানো হচ্ছিল সেখান থেকে মুক্ত করে দেন ও যে সৈনিকটি সেখানে রায়হানকে কাজ করার জন্য নিয়ে এসেছিল তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। আব্দুস সাত্তার গুলি খেয়েও বেঁচে যান এবং তাকে একজন অফিসার মুক্ত করে দেন। সাত্তার ওই মেজর সফিল্লাহ'র খুব প্রশংসা করেন। মজার বিষয় যে সকল সেনা কর্মকর্তা মানবিক আচরণ করেন তাদের জাতিগত কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াই বাঙালিরা তাদের 'বালুচ', 'পাঠান' বা 'সিন্ধী' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু উগ্র-বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীরা পাঞ্জাবীদের কখনোই এপর্যায়ে বিবেচনা করতো না। [২৩]

এদিকে থানাপাড়ার স্মৃতি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বাঙালিদের মাঝে যে গভীর বিভেদ ছিল সে বিষয়টি তুলে ধরেছে। প্রত্যেক বাঙালিই বিচ্ছিন্নতার জন্য বা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেনি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর থেকে থানাপাড়ার গ্রামবাসীদের মাঝে অনেকে ছিলেন যারা অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন। স্থানীয় 'রাজাকাররা' বাঙালি বিদ্রোহী শিবলীকে গ্রেফতার করে পাক সেনাদের কাছে হস্তান্তর করেছিল। রায়হান যে বাড়ির পাশের ঝোপে লুকিয়ে ছিল তার খোঁজ সেনাদের জানিয়েছিল ওই 'রাজাকারেরাই'। আরো অনেকে যেমন ওয়াজান পরিবারের মতো দিনমজুরেরা ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক।

তাছাড়া কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর লোকজনই পূর্ব পাকিস্তানে নিরস্ত্র লোকজনকে ভয়ভীতি দেখায়নি ও হত্যা করেনি। আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মীরাও গ্রামের অনেক স্থানে তাদের বিপক্ষের মতাদর্শের লোকদের উপর অকথ্য জুলুম চালিয়েছে ও বহু জনকে হত্যা করেছে। বাঙালি বিদ্রোহীরা কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর লোকদেরই হত্যা করেনি বরং সারদা পুলিশ একাডেমীর শিক্ষানবীশ অবাঙালিদেরও তারা হত্যা করতে চেয়েছিল যাদের পরে হস্তান্তর করা হয় ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীদের কাছে। অগণিত অবাঙালি বিশেষ করে বিহারীদের তারা অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে হত্যা করে যেমন করেছিল সেই বিহারীটিকে যে কিনা সহিংসতা থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে যাওয়ার পথে বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়েছিল। হত্যা করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কৌশল ছিল নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ ও ক্ষেত্র বিশেষে অনাড়িও বটে। তারা এক বিহারীকে হত্যার লক্ষ্যে প্রথমে গুলি করে, তারপর তাকে জীবন্ত মাটি চাপা দেয় ও শেষমেষ পাটের বস্তার মধ্যে মুখ বন্ধ করে জীবিত অবস্থায় ফেলে দেয় নদীতে। এক কথায় বলা যেতে পারে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যেভাবে অবাঙালি বেসামরিক ও সামরিক প্রতিপক্ষকে নির্যাতন করেছে এবং হত্যা করেছে তা ছিল বর্বরতার চরম বহি:প্রকাশ। এ ধরনের বর্বরতা ও নিষ্ঠু-রতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষের দাবিদারদের নৈতিক কর্তৃত্বকে নিসংন্দেহ খর্ব করেছে।

সারদার থানাপাড়ার হত্যাকাণ্ড ও ক'সপ্তাহ পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সামরিক অভিযানের মধ্যে এক অদ্ভুত ভুতুড়ে মিল ছিল। হত্যাকাণ্ডের ধরণ, মরদেহ যাদের দ্বারা এক স্থানে গাদা করা হয়েছিল, তাদের পরে ওই স্থানে গুলি করার পদ্ধতি সবই ছিল প্রায় একই কায়দার। একই রেজিমেন্টে অর্থাৎ ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীকে পাঠানো হয়েছিল ২৫-২৬ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপারেশনে। পুরান ঢাকার শাঁখারীপট্টিতে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল ওই একই রেজিমেন্ট-১৮ পাঞ্জাব। এটি খুবই অসাধারণ ব্যাপার যে

www.pathagar.com

একটি রেজিমেন্টের দু'য়েকটা কোম্পানীকে এভাবে এতো ব্যাপক সংখ্যক বেসামরিক নিরস্ত্র লোকজনের দুর্দশা সৃষ্টি ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। কারা এ সব ঘটনার জন্য দায়ী তাদের কোনো বিচারের সম্মুখীন হতে হয়নি, অথচ এর ফলে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর যেমন বদনাম হয় ও পাক সেনা বাহিনীর প্রতি বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠে তেমনি জাতি হিসেবেও তারা সর্বত্র হয় নিন্দিত। থানাপাড়ার হত্যাকাণ্ডে ঠিক কোনো অফিসারটি জড়ো হওয়া মানুষদের হত্যা করেছিল এবং ঊর্ধ্বতন কোন কোন অফিসার এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে উৎসাহিত করেছিল বা হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল তাদের শনাক্ত করা মোটেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য দুরূহ কাজ নয়। অন্য কারো জন্য না হলেও পাক সেনাবাহিনীর নিজেদেরই স্বার্থেই এদের খুঁজে বের করা দরকার। আর যাই হোক না কেন, বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে পরিচালিত যুদ্ধ বা অপারেশনে সংঘটিত মাই লাই ও হাদিথা'র মতো ঘটনাবলীর উপর প্রকাশিত তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে যাদের যৎকিঞ্চিত আগ্রহ আছে তারাই তো সে সব অফিসার ও সৈনিক যারা কঠিন পরিস্থিতিতেও যুদ্ধের নীতিমালা মেনে চলেন ও হুট করে ভেঙ্গে পড়েন না।[২৪]

১৯৭১ সালের পুরো মার্চ মাসব্যাপী মার্কিন প্রশাসন পূর্ব পাকিস্তানের সংকট মোকাবিলায় নিয়োজিত অল্পসংখ্যক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যের অনিশ্চিত অবস্থা নিয়ে দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ৭ মার্চ এক জনসভায় শেখ মুজিব কর্তৃক সম্ভাব্য স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হতে পারে এ ধারণা পোষণ করে ৬ মার্চ হোয়াইট হাউসের এক সভায় সভাপতির চেয়ারে বসে হেনরী কিসিঞ্জার জানতে চেয়েছিলেন, 'সেখানে (অর্থাৎ পাকিস্তান সরকারের) তাদের সৈন্য সংখ্যা কত'? সিআইএ'র পরিচালক রিচার্ডস হেলমস্ উত্তরে বলেছিলেন, '২০,০০০ সৈন্য' যাদের পাকিস্তান সরকারের অনুগত হিসেবে গণনা করা যায়। কিসিঞ্জার জিজ্ঞেস করেন, 'পূর্ব পাকিস্তান কি প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে?' 'তাদের লোকসংখ্যা কত?' রাজনৈতিক বিষয়াদির দায়িত্বপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারী আলেক্সি জনসন উত্তরে বলেছিলেন, 'সাড়ে সাত কোটি এবং তারা প্রতিরোধ করবে'। তাদের অভিমত ছিল যে এখন পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষে 'রক্তপাত হবে আর ফলশ্রুতিতে কোনো আশা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাবে পশ্চিম পাকিস্তান'।[২৫]

সামরিক অভিযানের পর পরই মনে হয়েছিল যে সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। 'হয়তো অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে', প্রেসিডেন্ট নিক্সন ২৯ মার্চ টেলিফোনে কিসিঞ্জারকে এ কথাই বলেন। 'কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের দিকে তাকাও, ৩০,০০০ সুশৃঙ্খল লোক সাড়ে সাত কোটি মানুষকে যে কোনো সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দেখো স্পেনীয়রা কি করেছিল যখন তারা এসে ইনকাদের ও বাকীদের নিয়ন্ত্রণ করেছিল। দেখো বৃটিশরা কি করেছিল, যখন তারা ভারত দখল করেছিল'। কিসিঞ্জার একমত হয়েছিলেন, 'তা ঠিক।' প্রেসিডেন্ট নিক্সন আরো বললেন, 'মাত্র এ ক'টা নাম বলা হলো'। কিসিঞ্জার আলাপকালে সতর্কতার সাথে বলার চেষ্টা করেছিলেন, 'বেশ, ওইসব ক্ষেত্রে জনসাধারন কমবেশি নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছিল'।[২৬]

www.pathagar.com

অধ্যায় ৬

হিন্দু শিকার

সংখ্যালঘু নির্যাতনের রাজনীতি

"..... আমরা এটা উপলব্ধি করেছি যে সকল প্রকার মুসলমান বাঙালি হত্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণে 'গণহত্যা' শব্দটি সঠিক ছিল না। অপর পক্ষে পরিকল্পিত ও নগ্নভাবে হিসেব করে ব্যাপকাকারে হিন্দুদের প্রতি যে বিশেষ আচরণ করা হয়েছে সেটিই আমাদের কাছে গণহত্যা বলে মনে হয়েছে।"

-আর্চার ব্লাড, মার্কিন কনসাল জেনারেল, ঢাকা-১৯৭১[১]

"আমরা হিন্দু সে জন্য তারা আমাদের প্রতি গুলি করেনি বরং তারা গুলি করেছে এ জন্য যে আমরা তাদের শত্রু; এবং আমরা খালি হাতে ফিরে আসবো না।"

-নিতাই গায়েন, চুকনগরে পুরুষ হিন্দু শরণার্থীদের উপর পাক সেনাদের আক্রমণে বেঁচে যাওয়া একজন হিন্দু, ২০ মে ১৯৭১[২]

খুলনা ও যশোর জেলার সীমান্তে ভদ্রা নদীর তীরে একটি ছোট্ট জায়গার নাম চুকনগর। ১৯৭১ সালের মে মাসে আশেপাশের জায়গা থেকে হিন্দু শরণার্থীদের ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য এটি একটি চলাচল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। খুলনা জেলার গ্রামের হিন্দুরা নৌকায় করে চুকনগরে আসতো এবং সেখান থেকে সড়ক পথে ভারতীয় সীমান্তের দিকে রওয়ানা দিতো।

২০ মে, ১৯৭১ হাজার হাজার শরণার্থী গবাদি পশুর মতো ঠেলাঠেলি করে জড়ো হচ্ছিলো উল্লেখিত নদীর তীরে ও চুকনগর বাজারে। তাঁরা আসছিলো নৌকায় করে। সেখানে এসে তারা তাদের নৌকা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিচ্ছিল স্থানীয় মুসলমানদের কাছে নয়তো সেখানেই রেখে যাচ্ছিল। ভারত অভিমুখে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হওয়ার আগে তারা রান্না করে চারটা খেয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করে ও বহনযোগ্য সামান্য যা কিছু আছে তাই সাথে নিয়ে অনিশ্চিত পথে পাড়ি জমায়। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে জায়গাটিকে দেখিয়ে বলেন, ওই সময় এটি যেন অনেকটা গ্রাম্য 'মেলা'র রূপ নিয়েছিল।

www.pathagar.com

বেঁচে থাকা ও প্রত্যক্ষদর্শী কিছু মানুষের দেয়া তথ্য মতে, তিনটি পিকআপ ট্রাকে করে আসা স্বল্পসংখ্যক সেনা সদস্য চুক নগরে এসে জড়ো হওয়া ওইসব শরণার্থীদের মধ্যে উপস্থিত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের প্রতি গুলিবর্ষণ শুরু করে। আক্রমণ শেষে অসংখ্য মরদেহ ও মরণাপন্ন মানুষ নদীর তীরে পড়ে ছিল। নিরীহ এবং মরণাপন্ন মানুষদের কেউ কেউ ভারতের দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখে আবার কেউ কেউ যেসব গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছিল সেদিকেই ফিরে যায়। চুকনগরবাসী বিশেষ করে মুসলমানরা লাশগুলোকে ভদ্রা নদীতে ফেলে দেয়।

খুলনার অনেক গ্রামে বেঁচে যাওয়া হিন্দুদের সাথে আমি চুকনগরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কথা বলেছি। তারা জানান, কেউ কেউ সেনা সদস্যদের আসার আগ মুহূর্তে ওই ট্রানজিট পয়েন্ট পার হতে পেরেছিল। কেউ কেউ পথেই আক্রান্ত হয়েছিল, কেউ কেউ আক্রমণ শেষ হওয়ার পর ভারতে পাড়ি দিয়েছিল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসেছিল দেশে। চুকনগরের মহিলারা হারিয়েছিল স্বামী, সন্তান এমন কি অনেক পুরুষ আত্মীয়দের। আবার অনেক পুরুষ বেঁচেও গিয়েছিল।

সময়ের সাথে সাথে চুকনগর বাজার বিস্তৃত হয় নদীর দিকে যেখানে তৈরি হয় নতুন কিছু অবকাঠামো। তবে এতে কিছু পরিবর্তন আসলেও নদী পাড়ের দৃশ্য ছিল অপরিবর্তনীয়। ওই দিন নদী পাড়ের একমাত্র নৌকাটি রশি দিয়ে আটকানো ছিল যেখানে কয়েক ডজন লোক ধাক্কা-ধাক্কি করে নৌকায় ওঠার চেষ্টা করছিলেন। এদিকে ভদ্রা নদী অনেক আগেই হত্যাকাণ্ডের শিকার মৃতদের লাশগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের আমি সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম যার ভিতর একজন মুসলিম মাঝিও ছিলেন। তাঁকে হত্যাকারী দলটি জোর করে সাথে নিয়েছিল এবং হত্যাকাণ্ডের পর যারা লাশগুলো নদীতে নিক্ষেপ করে সে ছিল তাদেরই একজন।

স্থানীয় একজন আওয়ামী লীগ নেতা মর্মাহত ছিলেন যে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ইতিহাসে চুকনগরের কোনো উল্লেখ নেই এবং আশা পোষণ করেছিলেন ওই দিনের ঘটনাকে তিনি ১৯৭১ সালের 'বৃহত্তম গণহত্যা'[৪] হিসেবে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তবে এটা বেশ কৌতূহলের ব্যাপার যে অন্যান্য গ্রামবাসীরা আমাকে বলেন তাঁর (ওই আওয়ামী লীগ নেতা) চাচা ছিলেন পাক সরকার সমর্থক একজন নেতৃস্থানীয় রাজাকার এবং সম্ভবতঃ সেনাবাহিনীর চুকনগরে আসার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। সেনা সদস্যরা সাতক্ষীরা নাকি যশোর থেকে চুকনগর এসেছিল তা নিয়ে একেক জনের অভিমত ছিল একেক রকম। তবে চুকনগরের রাস্তাটি এমন যে ওই দু'দিকের যে কোনো দিক থেকেই আসা সম্ভব ছিল। সেনাবাহিনী কেন এসেছিল এ ব্যাপারে কারো কোনো নিশ্চিত ধারণা ছিল না তবে হতে পারে স্থানীয়দের কেউ সেখানে শরণার্থীদের উপস্থিতি সম্পর্কে তাদের খবর দিয়ে থাকতে পারে।

ঝাউডাঙ্গায় এ্যামবুশ

ঝাউডাঙ্গার অবস্থান চুকনগর থেকে আরো পশ্চিমে ভারতের দিকে। কিছু শরণার্থী যারা ইতোপূর্বে চুকনগর পার হয়ে এসেছিল তারা ওই দিন সকালে ঝাউডাঙ্গার কাছের রাস্তায় পাক সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সম্ভবত ওই সেনা দলটিই পরে চুকনগরের দিকে চলে যায়।

www.pathagar.com

তারাদাসী বৈরাগী। বোলাবোনী গ্রামের তারাদাসী বৈরাগী ১৯৭১ সালের মে মাসের ২০ তারিখে ভারতের পথে যাত্রা করেন। তার সাথে ছিলেন তার স্বামী, তিন ছেলে, দেবর, দেবরের স্ত্রী এবং তাদের দুই শিশু সন্তান। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন তারা তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন? তিনি বললেন 'অত্যাচারের জন্য'। 'কাদের দ্বারা অত্যাচার'- আমি জানতে চাইলাম। তারাদাসী আশপাশ দেখে নিলেন। যে গ্রামে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তা ছিল চারদিকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। তারাদাসী আমার কথার উত্তরে খুব তাড়াতাড়ি বললেন, 'বাইরের মিয়ারা' অর্থাৎ অন্যগ্রামের মুসলমানদের দ্বারা তারা অত্যাচারিত হয়েছিলেন। এরপর তিনি আবার তার কাহিনীতে ফিরে গেলেন।

তারাদাসী একজন হিন্দু। সে এখনও বাংলাদেশে বাস করে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ ও এর রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। ১৯৭১ সালে একই এলাকার বাঙালি তবে মুসলিম ওই সব 'বাইরের মিয়াদের' দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে তিনি ও তার পরিবার নৌকায় করে চুকনগর চলে আসেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পলায়নরত শরণার্থীদের মিছিলে যোগ দিয়ে ভারত অভিমুখী পথে রওয়ানা দেন পায়ে হেঁটে।

তারাদাসী বলেন, ঝাউডাঙ্গা নামক জায়গায় কিছু সেনা সদস্য তাদের গাড়ি থেকে নেমে শরণার্থীদের একটি দলের উপর গুলিবর্ষণ করে। পুরুষরা ছিল তাদের গুলির লক্ষ্য। তারাদাসীর স্বামী কালিপদ বৈরাগী, তাঁর বড় কিন্তু বয়সে কিশোর ছেলে রমেশ ও তাঁর দেবর বিনয় বৈরাগী গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

শেষমেষ তারাদাসী যখন ফিরে এলেন তখন দেখলেন খালি হয়ে যাওয়া একটি বাড়ি, ব্যবহার্য্য কোনো কিছুই আর নেই। তার বাকী দুই সন্তানের একজন বাংলাদেশে বাস করে এবং অন্যজন কাজ করে ভারতে।

ময়না মিস্ত্রি : হাতবাতি গ্রামের ময়না মিস্ত্রিও তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরের সাথে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। নৌকায় করে চুকনগরে পৌঁছে হাঁটতে থাকেন ভারত অভিমুখী রাস্তায়। রাস্তার একটি বাঁক-এর কথা স্মরণ করে ময়না বলেন, সেখানে তারা সৈন্যদের মুখোমুখি হয়ে যান। যারা মাঠে বা ক্ষেতে লাফ দিয়েছিল সেনারা তাদের ধরে ফেলে। যারা দৌড়ে পালাচ্ছিল সেনারা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তাঁর স্বামী শরত মিস্ত্রি নিহত হন। বিশৃঙ্খল অবস্থায় তিনি তার শ্বশুর গিরিধারী মিস্ত্রিকে হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য ভারতে আবার তাঁর দেখা পান।

শেষ পর্যন্ত ময়না ফিরে আসেন ভাঙ্গাচোরা, লুট হয়ে যাওয়া তাঁর বাড়িতে। তাঁর কিশোর বয়েসী ভাই চৈতন্য পাক সেনাদের ছোঁড়া গুলি থেকে বেঁচে যান। ময়না এখন তাঁর সে ভাইকে নিয়ে বসবাস করেন। তিনি আমাকে বেশ গর্বের সাথেই বললেন, তার জীবিকার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেন।

চুকনগরের গণহত্যা

লতিকা গায়েন। লতিকা গায়েন দৌনিয়াফান্দ গ্রামের অধিবাসী। তার বাড়ির দাওয়া'র (খোলা বারান্দা) সিঁড়িতে আমরা বসে ছিলাম। তিনি স্মরণ করছিলেন ১৯৭১ সালের ২০ মে'র ঘটনাবলী। ভারতে যাওয়ার পথে চুকনগরে সেদিন সকালে তিনি তার স্বামী ঈশ্বর গায়েন, তাদের চার ছেলে, বড় পুত্রবধূ, দু'জন নাতি এবং এক কন্যা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তারা বসেছিলেন নদীর ধারে একটি বট গাছের কাছে। তার বড় ছেলে বিনয়ের তখন ২৩ বছর বয়স।

www.pathagar.com

তাঁর পাশেই তার স্বামীকে সেন্যরা গুলি করে হত্যা করে। তিনি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়লেন তার চোখের সামনে তার বড় ছেলে নিহত হওয়ার কথা স্মরণ করে। সাঁইত্রিশ বছর এ মায়ের ছেলে হারানোর ব্যথা কমাতে পারেনি। এর মাঝে তাঁর বিধবা ছেলে বউ নিরবে আমাদের পাশে এসে বসলেন পূজা শেষ করে।

নিতাই গায়েন। নিতাই গায়েন একজন হিন্দু পুরুষ যিনি ১৯৭১ সালের ২০মে চুকনগরে হত্যাকারীদের মুঠো থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। লতিকা গায়েন-এর স্বামী ঈশ্বর গায়েন-এর আত্মীয় নিতাই ১৯৭১ সালে যখন তার বয়স ছিল বিশ থেকে বাইশ তিনি নদীতে পর্যাপ্ত নৌকা না থাকায় তার অন্যান্য বেশিরভাগ আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে একদিন পর ভারতের পথে যাত্রা শুরু করেন। নিতাই বলেন, দু'সপ্তাহ আগে থেকেই সে জায়গা থেকে হিন্দুরা পালাতে শুরু করে। 'এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের' অত্যাচার ও লুটের কারণেই হিন্দুদের দল বেঁধে পালানো শুরু হয়। পুনরায় জিজ্ঞেস করায় তার কাছ থেকে যা জানা যায় তা হলো ওই সব 'বিশেষ শ্রেণীর' লোকগুলো ছিল স্থানীয় বাঙালি মুসলমান যারা লাঠি ও রামদা নিয়ে দলবেধে তাদের আক্রমণ করতো।

চুকনগর ঘটনার আগে বিচ্ছিন্নভাবে সেনা সদস্যদের সাথে এ জায়গায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এপ্রিলের শেষ দিকে এখান থেকে কাছেই চক্রখালি মাধ্যমিক স্কুলে সেনারা গোলা নিক্ষেপ করে (আমাকে বলা হয়েছিল বিদ্রোহীরা এ স্কুলটি ব্যবহার করতো প্রতিরোধের জন্য)। কাছের একটি গ্রাম বাদামতোলায় মে মাসে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। সেখানে নিতাই-এর চাচা আহত হয়েছিলেন। পরে ওই গ্রামের একটি বাড়ি আমি পরিদর্শন করতে যাই যা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনার পর সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। নিতাই ২০ মে সকাল ৯-৩০ বা ১০-০০টার সময় চুকনগর পৌছেন। তিনি ভারতের সীমান্ত মুখী পথ পায়ে হেঁটে রওয়ানা দেয়ার মুহূর্তে যে পাকা রাস্তা দিয়ে তার যাওয়ার কথা ছিল সেদিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। নিতাই গায়েন-এর কথা অনুযায়ী সেখানে ছিল তিন ট্রাক সৈন্য, যারা সংখ্যায় হবে ৫০ থেকে ৬০ জনের মতো। তাদের সাথে কিছু বিহ-রীকেও দেখা যায়, তবে ওদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। তিনি ধারণা করেন যে, সেনারা যশোর-এর দিক থেকে এসেছিল। তাদের অন্য একটি দল নৌকায় করে চলে যায় নদীর উত্তর পাড়ে।

নিতাই দৌড়ে তার পরিবারের কাছে ফিরে আসেন। তিনি বৃদ্ধ লোকদের ছেড়ে গিয়েছিলেন কারণ তার মনে হয়েছিলো সৈন্যরা শুধু যুবকদের খুন করবে। তিনি তার চাচাতো ভাই রনজিত, বিনয় ও ধীরেনকে পালিয়ে যেতে বলেন। নিজে দৌড়ে একটি মসজিদে প্রবেশ করেন যেখানে স্থানীয় মুসলমানরা নিজেদের মুসলমান প্রমাণ করার জন্য উচ্চস্বরে কোরান শরিফ পাঠ করছিলেন। তিনি নিজেকে একটি মাদুর দিয়ে জড়িয়ে নেন ও গ্রামের এক মহিলা তার উপর বসে পরে।

নিতাই তার লুকানোর জায়গা থেকে পরিবারের সদস্যদের দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন তিন জন সৈন্য তাদের কাছে গেলো এবং তারা তার বাবা, কাকা, পিসি (ফুফা) এবং বড় ভাই ঈশ্বরের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করলো। এ সময়ে তার ভাগনে বিনয় ও চাচাতো ভাই রঞ্জিত তাদের লুকানোর স্থান থেকে দৌড়ে এসে সৈন্যদের ধরে এবং হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। এক এক সৈনিককে শক্ত করে ধরে তারা বললেন- মারবেন না। মারবেন না। এর মাঝে একজন সৈন্য তার রাইফেল পুনরায় তার নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়ে বিনয়কে গুলি করে দেয়। অন্য আর একজন রঞ্জিতকে গুলি করলো এবং পরে

www.pathagar.com

জ্যাঠাইমাকেও গুলি করলো- হয়তো রাগের বশে, নিতাইয়ের তাই মনে হয়; কারণ জ্যাঠাইমা সৈনিকটিকে জাপঠে ধরেছিলেন ও তাকে থামানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি আর কখনোও ধীরেনকে দেখেননি। সম্ভবত: সে বটগাছের কাছে আরো কয়েকজনের সাথে খুন হয়ে যায়।

নিতাই-এর ধারণা- তিন বা চার ঘন্টা পর্যন্ত গোলাগুলি চলে। তিনি মনে করেন, সেখানে ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ লোক ছিল। সৈন্যরা নিশানা করেছিল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের। আমাকে বলা নিতাই-এর কথা অনুযায়ী ওই ঘটনার পর বহুবার চুকনগর যাওয়া-আসা করলেও তিনি কোনো সৈন্য দ্বারা কোনো মহিলাকে লাঞ্ছিত করা, উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করেননি বা শোনেননি।

এ সব ঘটনার শেষে তিনি প্রথমে পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে নৌকায় করে আরো পূর্ব দিকে সরিয়ে নিয়ে যান। তবে সেই পথ ভারতের দিকে নয় বরং ছিলো ভারত সীমান্ত থেকে ভিন্ন দিকের পথ।তারপর তিনি চুকনগরে ফিরে আসেন লাশগুলোর কাছে। তিনি তার ভাগ্নে বিনয়ের পকেটে পান ২০০০ রুপী ও ৩-৪ ভরি সোনা। একজন অচেনা মৃত ব্যক্তির এ্যাটাচি কেসে পান ৮০০০-১০,০০০ রুপী। তিনি লাশগুলো টেনে নদীতে নেয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু সক্ষম হননি। স্থানীয় লোকেরা তখন মৃত ব্যক্তিদের জিনিসপত্র লুট করছিল, অথচ অনেক আহত মানুষ তখনও কাতরাচ্ছিল। এদিকে কিছু মানুষ ডুবেও মারা যায়।

ফিরতি পথে নিতাই দেখলেন একজন লোক একটি অগভীর পুকুরে বার বার ডুব দিচ্ছে। নিতাই মনে করেছিলেন যেহেতু লোকটির পরিবারের সবাই মারা গেছে সে জন্যই হয়তো সে পানিতে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। তিনি তাকে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের খুনের বদলা নিতে বলেন। এতে লোকটি ডুব দেয়া বন্ধ করে ও চলে যায়।

লাশের ভিতরে নিতাই দেখলেন একজন জীবিত শিশু তার মায়ের স্তন চুষছে। শিশুটির মা-বাবা তখন মৃত। তিনি শিশুটিকে নিয়ে ফিরে এলেন নৌকায়। বাচ্চাটি কাঁদছিলো অনবরত। অন্য একটি নৌকার এক মহিলা বাচ্চাটির কপালে কোনো দাগ আছে কিনা জানতে চাইলেন। দাগ আছে; দেখা গেল মহিলাটি ওই শিশুটির মৃত মায়ের বোন। তারা এসেছিলেন বরিশালের মঠবাড়িয়া থেকে। নিতাই শিশুটিকে তার কাছে দিয়ে দেন। আমার কাছে তার কাহিনী বলার সময় এতোক্ষণ ধীরস্থীর, শান্ত থাকলেও এ শিশুটির কথা বলার সময় নিতাই জোরে কেঁদে উঠেন।

শৈলেন্দ্র নাথ জোয়ারদার। শৈলেন্দ্র নাথ জোয়ারদার (শৈলেন) কাথামারী গ্রামের একজন হিন্দু। চুকনগর হত্যাকাণ্ডে জীবিতদের তিনি একজন। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন ১৮ বা ১৯ বছর বয়েসী এক যুবক। ইতোমধ্যে বাবা মারা গেলে তিনি তার মা, এক ভাই ও এক বোনের সাথে থাকতেন। তার বাবা একজন কৃষক হওয়ার কারণে তাদের মালিকানায় অল্প কিছু জমি ছিল। শষ্যের ভাগাভাগির শর্তে আরো কিছু জমি তিনি চাষাবাদ করতেন।

শৈলেনের কথা অনুযায়ী ১৯৭১ সালে কাথামারি গ্রাম থেকে নদীর অপর পাশে হালিয়া গ্রামের মুসলমানরা হিন্দুদের এলাকায় লুটতরাজ শুরু করে। পরে হালিয়ার হিন্দুরা কাথামারিতে চলে আসে। তারা খবর দেয় মুসলমানরা তাদের সম্পত্তি লুট করছে ও মেয়েদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিছু সময়ের জন্য হিন্দুরা পাহারার ব্যবস্থা করে। কিন্তু অচিরেই তারা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

www.pathagar.com

শৈলেন ভারতে কাউকেই চিনতেন না। তিনি তার পরিবারসহ নৌকায় করে ডুমুরিয়া হয়ে চুকনগর আসেন। ২০ মে সকালে তারা চুকনগরে পৌঁছেন। নৌকাটি তাদের নিজেদের ছিল। সেটি সেখানেই রেখে আসতে হয়েছিল। স্থানীয় মুসলমানরা নৌকাটি ও নৌকার ভিতরে যা ছিলো সবই নিয়ে যায়। শৈলেনের কথা অনুযায়ী তাদের কেউ সামান্য কিছু টাকা দেয়, আবার কেউ কিছুই দেয়নি।

নদীর ধারে অনেক মানুষ বসেছিল, কেউ খাচ্ছিল, বসার মতো আর কোনো জায়গা ছিল না বললেই চলে। শৈলেনরা বসার মতো জায়গা খুঁজে পায় ও খাবার খেয়ে নেয়। তারা হাঁটা শুরু করবে এমন অবস্থায় কেউ একজন তাদেরকে সতর্ক করে ও পালিয়ে যেতে বলে, কারণ সৈন্যরা এগিয়ে আসছিলো। তারাও গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। প্রথমে দূরে, পরে কাছাকাছি; মানুষ পালানো শুরু করে। কেউ কেউ নদীতেও ঝাঁপিয়ে পরে। আরো অনেকের সাথে শৈলেন তখন বাজারে, দেখলেন 'খাকী' পোশাকের দু'জন সেনা গুলি করতে করতে বাজারের দিকে আসছে। তিনি নদীর দিকে দৌড় দেন। বয়স্করা তাদেরকে দৌড়াতে নিষেধ করে, কিন্তু শৈলেন দৌড়াতে থাকেন এবং নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে নৌকার আড়ালে নিয়ে যান। হয়তো তীর থেকে তাকে দেখা যাবে মনে করে পানির নীচ দিয়ে সাঁতার দেয়া শুরু করেন। বাতাস নেয়ার জন্য মাথা তুলতেই একটি বুলেট বাতাসে শিষ কেটে চলে যায় তার কানের পাশ দিয়ে। তিনি পুনরায় শুরু করেন ডুব সাঁতার। আবার যখন মাথা তোলেন দ্বিতীয় গুলিটিও তাকে নাগালে পায়নি। কিন্তু তৃতীয় গুলিটি তার ডান কনুই-এ আঘাত করে। ফলে হাড় ভেঙ্গে যায়। শৈলেন আমাকে তার ক্ষতচিহ্নটি দেখিয়েছিলেন। তারা যেদিক থেকে এসেছিলেন নদীটির প্রবাহ ছিল ওই দিকেই। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই শৈলেন গুলির সীমানার বাইরে চলে আসতে সক্ষম হন।

শেষ পর্যন্ত তিনি নদীর কূলে এসে পৌঁছেন ও শক্তিহীন অবস্থায় অনেক লাশের মাঝে পড়ে থাকেন। সকালে একজন স্থানীয় মুসলমান মহিলা তিনি বেঁচে আছেন দেখে আরো কয়েকজনকে এনে তাকে তার বাসায় নিয়ে যায় ও গাছ-গাছালির শিকড় দিয়ে তার ক্ষতের চিকিৎসা করেন। এর মাঝে তার মা, ভাই-বোন গুলির আঘাত থেকে বেঁচে যান এবং রওয়ানা দেন যশোরের দিকে। পরের দিন তারা ফিরে আসলেও তাকে আর খুঁজে পাননি। এমনকি কোনো সাথী যাত্রীও পাননি। চুকনগরে এলে তাদের জানানো হয় যে কাথামারির একজন আহত ছেলেকে কোনো এক বাড়িতে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এবং তাকে তারা খুঁজে পান। তারা বেঁচে ছিলেন ঠিকই কিন্তু শৈলেন পরে জানতে পারেন তার এক বড় বোনের স্বামী ও শ্বশুর নিহত হয়েছেন। কাথামারিতে যাওয়ার আগে তিনি চুকনগরের বাড়িতে এক সপ্তাহের মতো ছিলেন।

তার ১০ বা ১২ বছর বয়েসী এক ভাই ছিল, কিন্তু সে মারা যায়নি। যে সব বৃদ্ধ মানুষেরা তাকে দৌড়াতে নিষেধ করেছিলেন শুধু মহিলারা ব্যতীত তারা সবাই নিহত হন। তাদের গ্রামটি ছিল একদম ফাঁকা। কাজেই তিনি কাছের একটি হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম খোলসেবুনিয়ায় চলে যান যেখানে অল্পকিছু মানুষ অবস্থান করছিলো। শৈলেন বাকী বছরটা সেখানেই পার করেন। ওখানে জীবন ধারণ ছিল খুবই কঠিন, অপরের দয়া দাক্ষিণ্যে তারা বেঁচে ছিলেন। তবে শৈলেন বলেন চালের দাম ছিল বেশ কম।

এ এলাকায় পরে একটি রাজাকার বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। তারা হিন্দুদের ভয় দেখাতো ও ভারতীয়দের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগ করতো। তারা যখন আশেপাশে আসতো শৈলেন তখন জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকতেন। কাছের একটি গ্রামে কয়েকজন হিন্দুকে

www.pathagar.com

রাজাকাররা ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করে। কিন্তু শৈলেন বলেন, এটা ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে. রাজনীতির জন্য নয়।

শৈলেন এরপর আর কখনো সৈন্যদের দেখেননি। তিনি নিজ গ্রামে ফিরে এসে দেখেন সব কিছুই লুট হয়ে গেছে। পরে নানা মানুষের আলোচনায় সকলের ধারণা হয়েছিল যে স্থানীয় চুকনগরের অধিবাসীরা (মুসলমান) পলায়নরত হিন্দু শরণার্থীদের টাকা, সোনা ইত্যাদি লুট করার সুবিধার জন্যই সেদিন ২০ মে সৈন্যদের ডেকে এনেছিল।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও তার ভাই শের আলী (চুকনগরের মুসলমান বাসিন্দা), আরো অনেকের ভিতর এরা দু'জন যারা ১৯৭১ সালের ২০ মে নিহতদের লাশগুলো সরিয়ে ফেলার লক্ষ্যে সেগুলো নদীতে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

ওয়াজেদ আলী একজন সাদাসিধে মাঝি। তার ভাষ্য অনুযায়ী সে এবং অন্যান্য স্থানীয় মুসলমানগণ যখন সকালে বাজারে বসা ছিলেন তখন একটি লাল রং-এর জীপ সেখানে আসে। গাড়ির লোকেরা তাদের জিজ্ঞেস করে 'মালাউন'(হিন্দু)রা কোথায়? তিনি ও অন্যরা উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবীর বলতে লাগলেন-তারা মুসলিম সেটা বোঝানোর জন্য।

পরে সৈন্যদের নিয়ে আরো দু'টি গাড়ি আসে। এখানে তিনি হতবুদ্ধি করে দেয়ার মতো জোর দিয়ে বলেন, "খান সেনারা একটিও গুলি করেনি। বিহারী সেনারা গুলি করেছে।" এতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ রাজনীতিবিদ ও তার অনুগতরা তাকে বকাবকি করলেন। কিন্তু ওয়াজেদ আলী এ ব্যাপারে তার অবস্থানে অনড় থেকে গেলেন। তার মতে যারা আগে লাল জীপে এসেছিলো ও হিন্দুদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলো তারা ছিল 'খান সেনা' (পাকিস্তানী সৈন্য), কিন্তু যারা খুন করতে এসেছিলো তারা কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল এবং তারা 'বিহারী সেনা' ছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।[৬]

তারা যেই হোক না কেন, ওয়াজেদ আলীর বর্ণনা অনুযায়ী তারা ওই জায়গাটি বিধ্বস্ত করে দেয়। এক সময় গোলাগুলি থেমে যায় ও খুনীরা বিদায় হয়। বর্তমান আওয়ামী রাজনীতিবিদের চাচা ওয়াহাব-ওয়াজেদ ও অন্যদেরকে সব লাশ নদীতে ফেলে দিতে বলেন। ওয়াজেদ আলী আরো জানান তাকে (ওয়াজেদ) এবং অন্যদেরকে ওয়াহাব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লাশগুলো ফেলে দেয়ার জন্য ৪০০০ রুপী দিবেন। তারা লাশের কাছে থাকা টাকা বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিসও নিতে পারবেন। ওয়াজেদ ও তার ভাই লাশগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নদীতে নিয়ে ফেলেন। ওয়াজেদের মতে তাদের এ জুটি কয়েক ঘন্টা ধরে শ' শ' লাশ টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পরে এক সময় তারা লাশ গণনা বাদ দেন। শেষে তাদেরকে মাত্র ২০০০ রুপী পারিশ্রমিক দেয়া হয়। যাহোক লাশগুলো থেকে প্রাপ্ত মালামালের ভিতরে ছিল আট লাখ রুপী ও চার কিলোগ্রাম স্বর্ণ-ওয়াজেদ-এর কথা অনুযায়ী এগুলোর উল্লেখে আবারও উপস্থিত লোকজনের পক্ষ থেকে বকাবকির সূত্রপাত হয়। স্বর্ণের পরিমাণ যাই হোক স্থানীয় একজন-এর বিনিময়ে তাকে ১২০০ রুপী দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাত্র ৫০০ রুপী দেন। হায়দার নামের স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ কর্মীর কাছে তিনি ওই ৮০০,০০০ রুপী গচ্ছিত রাখেন। সে লোক পরে তাকে জানায় ব্যাংক ডাকাতি হওয়ায় ওই সব টাকা বাজারে অচল হয়ে গেছে। তার কাছে ওয়াজেদের গচ্ছিত টাকার আর কোনো মূল্য নেই।

আমি পরের বছর অন্য একটি গ্রামে চুকনগরের স্থানীয় রাজনীতিবিদদের থেকে দূরে আবার তার সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। তবে এবারও তার আগের কথায় কোনো পরিবর্তন ছিল না। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, তারা 'খান সেনা' (পাকিস্তান সেনাবাহিনী) ছিলো না, তারা ছিল 'বিহারী সৈন্য' যারা সেদিন চুকনগরে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলো। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন

www.pathagar.com

যে তিনি ও তার ভাই যে সব লাশ নদীতে টেনে নিয়ে যান সে সব মরদেহের কাছ থেকে আট লাখ রুপী ও চার কিলো সোনা উদ্ধার করা হয়েছিলো। তিনি অন্তর থেকে সন্দেহ করেন লাশগুলো থেকে উদ্ধারকৃত টাকা এবং সোনা যাদের কাছে তিনি গচ্ছিত রাখেন তারা তাকে প্রতারণা করেছে ও পরে তাদের পীড়াদায়ক মৃত্যু ঘটেছে, যা কিনা তার মতে গরীবকে ঠকানোর ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেন, তিনি ও তার ভাই যে লাশগুলো নদীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলোর সবাই ছিল পুরুষ, একটিও মহিলা বা শিশুর লাশ সেখানে ছিলো না। তবে তিনি বুলেট দিয়ে কাঁধে আঘাতপ্রাপ্ত একজন মহিলাকে দেখেছিলেন। তার নাম ছিল শেফালী। তিনি তাকে (শেফালী) ধর্মবোন বানিয়েছিলেন ও বিশেষ অনুষ্ঠানে সে (শেফালী) প্রায়ই তাকে (ওয়াজেদ) দাওয়াত দিতো।

চুকনগর নিয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ

তৎকালীন চুকনগর ঘটনার অনেক প্রত্যক্ষ সাক্ষী ও যারা নিহত হয়েছিলেন তাদের বেঁচে থাকা আত্মীয়দের সাক্ষ্য অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের ২০ মে হিন্দু যুবকদের খুন করার জন্য চুকনগরে একটি বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিলো। তবে এ হত্যাকাণ্ডের অন্যান্য অনেক বিষয়ই অনিশ্চিত অন্ধকারে রয়ে গেছে।

এ ক্ষেত্রে নিতাই গায়েনের ঘটনা দিয়েই শুরু করা যাক। নিতাই গায়েন চুকনগরের শরণার্থীদের খুন করার মতো অন্য কোনো ঘটনার কথা আর কখনোও শোনেননি। অচিন্ত্য সাহা, আর একজন হিন্দু যিনি ওই ঘটনার আগের দিন তার পরিবার নিয়ে চুকনগর পার হয়েছিলেন, তিনিও ভিন্ন কোনো হত্যাকাণ্ডের কথা শোনেননি। ধীরস্থীর ও চিন্তাশীল এ দু'জন মানুষ নিবিড়ভাবে মনে করেন চুকনগরের হত্যাকাণ্ড এবং ১৯৭১ সালের সংঘাত কোনো উম্মাদ মানুষ দ্বারা সম্পাদিত কোনো ছোট খাটো ঘটনা ছিলো না। অচিন্ত্য একজন সংস্কারপন্থী মার্কসবাদী ও আমার পথ প্রদর্শক ছিলেন যার খুলনার অনেক গ্রাম সম্পর্কে ছিল বিস্তৃত ধারণা। তিনি একজন রসিক মানুষও বটে। বাংলাদেশের নির্বাচনে অংশ নেয়ার মতো আদর্শিক স্বভাবও দেখা যায় তাঁর মাঝে।

আমি যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের সবাই বিশ্বাস করেন যে চুকনগর থেকে কোনো একজন সৈন্যদের খবর দিয়েছিলো এবং ওই দিন তাদেরকে সেখানে আসতে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু হত্যা রহস্য থেকে যায় অজানা। সে সময় হাজার হাজার শরণার্থী কিছুদিন ধরেই চুকনগর দিয়ে পার হচ্ছিলো ও কারোরই মনে ওই ঘটনার আগে কোনো দু:শ্চিন্তা দেখা দেয়নি। যদি সরকার এ প্রদেশটিকে হিন্দুমুক্ত করতে চাইতো তবে শরণার্থীদেরকে ভারতে যেতে বাধা দিলো কেন? এটা পরিষ্কার যে, স্থানীয় বাঙালি মুসলমানরা তাদেরই গ্রামের হিন্দুদের তাড়িয়ে দিচ্ছিলো শুধুমাত্র দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া হিন্দুদের কাছ থেকে বৈষয়িকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য। চুকনগরের স্থানীয় মুসলমানরাও হিন্দুদের পালিয়ে যাওয়া থেকে লাভবান হতে থাকে। নদী পারাপারের ব্যবসা বা শরণার্থীদের পরিত্যক্ত জিনিসের কেনা-বেচা চলছিলো রমরমাভাবে। আক্রমণের কারণে শরণার্থী গমন বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকাদের অনেকেই তাদের গ্রামে ফিরে আসেন।[৭]

শৈলেন জোয়ারদার বলেন, হিন্দুরা ওই ঘটনার পরে ধারণা করেছিলো যে স্থানীয় বাঙালি মুসলমানরা সৈন্যদের নিয়ে আসে ও আক্রমণ করায় যাতে করে তারা তাদের কাছে থাকা টাকা-পয়সা এবং অলংকারাদি লুট করতে পারে। অন্যকথায় আক্রমণের সম্ভাব্য কারণ

www.pathagar.com

ছিল লুটতরাজ। যদি নিতাই গায়েন একজন নিহত ব্যক্তির থলেতে ১০,০০০ রুপী পেয়ে থাকেন তাহলে এটা অসম্ভব নয় যে ওয়াজেদ ও তার ভাই যারা শ' শ' লাশ নদীতে ফেলে দেয়ার দাবি করেছেন তারা কয়েক লাখ রুপী এবং কয়েক কিলো. স্বর্ণ পেয়েছিলেন। যা হোক যারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তারা কিন্তু নিজেরা কোনো কিছু লুট করেনি। আক্রমণকারীরা পোশাকধারী ছিল এবং এসেছিল বাহির থেকে। তারা হত্যার পর চলে যায়। স্থানীয়রা চালায় লুটতরাজ। পরবর্তীতে আরো যে সব লুটতরাজের ঘটনা ঘটে সে সব প্রমাণ করে না যে খুনীরা লুট করায় উৎসাহী ছিল।

মার্কিন কনসল জেনারেল ব্লাড গণহত্যা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তার মতকে সমর্থন করে যে কোন হিন্দুকে হত্যা করার ঘটনাকে গণহত্যা হিসেবেও সরলীকরণ করা যায় না। কারণ এখানে সকল হিন্দু নয় বরং প্রাপ্তবয়স্ক হিন্দু পুরুষরাই কেবল হত্যাকারীদের লক্ষ্য ছিলো। প্রকৃতপক্ষে ব্লাড-এর অনুসন্ধান এটাই প্রতিষ্ঠিত করে যে আমরা যে অসংখ্য খবর পাচ্ছিলাম তার সবগুলোর একটি সাধারণ বিন্যাস ছিল, আর তা হচ্ছে সৈন্যরা গ্রামে ঢুকে হিন্দুদের বাসস্থান সম্পর্কে খোঁজ নিতো এবং পুরুষদের হত্যা করতো। ধারণা করা যায় হয়তো কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া হিন্দু মহিলা বা শিশুদের তারা খুন করতো না।[৮] ব্লাড আরো নিশ্চিত করেছেন যে বাঙালি মুসলমানদের ভিতরে ছিলো ব্যাপক হিন্দু বিরোধী মনোভাব। নিতাই গায়েন-চুকনগর ঘটনায় বেঁচে থাকা হিন্দু পুরুষ নিতাই গায়েন। তার কথা আমার কাছে সত্যের কাছাকাছি মনে হয়েছে। তার মতো "আমরা হিন্দু সে জন্য তারা গুলি করেনি। গুলি করেছে কারণ আমরা তাদের শত্রু এবং আমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়েই আবার ফিরে আসবো এটা জেনে।"

ব্লাড-এর পর্যবেক্ষণ ...'ঘটনাক্রম থেকে অনুমান করা যায় যে পাকিস্তানী সেনারা ভারতীয় ও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের পার্থক্য করায় সক্ষম ছিলো না। ফলে উভয়কেই বিবেচনা করতো শত্রু হিসেবে'।[৯] অন্য কথায় সামরিক জান্তা হিন্দু ধর্মালম্বীদেরকে দেশ বিভক্তির রাজনীতির প্ররোচক বা প্রতিনিধি বলে সন্দেহ করতো। ফলে সব যুবক শ্রেণীর হিন্দু পুরুষদেরকে তারা গণ্য করতো প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য শত্রু সেনা হিসেবে ।

কোনো ভাবেই নিশ্চিত করা সম্ভব নয় সেদিন চুকনগরে কত লোক নিহত হয়েছিলো, কারণ চুকনগরবাসী নয় বরং তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতের পথে ধাবমান শরণার্থীরা। যা হোক কয়েকজন স্থানীয় রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্তিকরা এ ঘটনাকে ১৯৭১ সালের সর্ববৃহৎ গণহত্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তাদের দাবি ২৫-৩০ জনের একটি সেনা দল তাদের ব্যক্তিগত অস্ত্র দিয়ে সেদিন সকালে খুব কম সময়ের মধ্যে ১০,০০০-এর মতো মানুষ হত্যা করে। এটা স্পষ্টতই একটি বড় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, কিন্তু এ বিবরণে তাদের ভাষ্য ঘটনার ধারাবাহিক উপস্থাপনায় যেন সহায়কহীন বাধার সৃষ্টি করেছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো নিহতের সংখ্যা নিয়ে নানান রকম হিসেবে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তবে সব বর্ণনাতেই হত্যাকারীদের সংখ্যা দেখানো হয়েছে বেশ কম তবে মোটামুটি এক-ইরূপ। অনেকের মতেই ২০-২৫ জন, এমনকি কারো কারো মতে আরো কম। দেখা যায় হত্যাকারীরা তিনটি গাড়িতে করে চুকনগরে আসে। একই ধরনের সাক্ষ্য সবাই দেয় যে তারা হালকা অস্ত্রে সজ্জিত ছিলো এবং তারা তাদের ব্যক্তিগত অস্ত্রই কেবল বহন করছিলো। অস্ত্রের যে ধরণ এবং অতিরিক্ত রসদ যা একজন সৈন্যের বহন করার কথা তাতে ৩০ জন সৈন্যের একটি দলের কাছে ১২০০ বুলেটের বেশি থাকার কথা নয়। সব গুলি লক্ষ্য ভেদ করতে পারে না এবং একটি গুলির আঘাত অনেক সময়ই একজনকে মারার জন্য যথেষ্ট

www.pathagar.com

নয়। যেমন শৈলেন জোয়ারদারকে মারার জন্য কমপক্ষে তিনটি গুলি ছোঁড়া হয়েছিলো। এর দু'টি লক্ষ্যচ্যুত হয় ও একটি তার কাঁধে আঘাত করে। তাহলে এ সব বর্ণনায় ধারণা করা যায় যে, সৈন্যদের রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তারা কয়েকশ' মানুষকে আঘাত করতে বা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলো।

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল সম্ভাব্য শরণার্থীর তুলনায় সৈন্য সংখ্যার অলীক কল্পনাপ্রসূত ধারণাগুলো বাদ দিয়ে নদীর তীর এবং বাজারের প্রকৃত অবস্থা যদি আমরা বিচার করি তাহলে ১৯৭১ সালের ২০ মে সকালে কয়েক হাজার লোক থাকার কথা। অচিন্ত্য সাহা গোলাগুলি শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে ওই দিন সকালে চুকনগর পার হয়েছিলেন। রাজনৈতিক সমাবেশের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি মনে করেন প্রায় ৫০০০ লোক ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। দৃষ্টিসীমার বাইরে দূরে হয়তো আরো কিছু লোক থাকতে পারতো। শরণার্থীদের বেশির ভাগই ছিল শিশু ও মহিলা। প্রতি ৩ জনের যদি ১ জন পুরুষ হতো তাহলে শরণার্থীদের ভিতরে ছিলো কয়েক হাজার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ২৫ বা ৩০ জন সৈন্যের বিপরীতে। সেনারা ২ জন বা ৩ জনের দল করে তাদের মাঝে আসে এবং শিশু ও মহিলাদের বাদ দিয়ে পুরুষদের উঠিয়ে নিয়ে যায়। যদি পুরুষ শরণার্থীদের একটি ছোট্ট অংশ তাদেরকে আক্রমণ করতো তাহলে সৈন্যদের নিরস্ত্র করা ও তাদেরকে হত্যা করা, বেআইনি হলেও অস্বাভাবিক হতো না। কিন্তু কেউই বাধা দেয়নি। নিতাই, এ মতের সঙ্গে দ্বিমত করেননি। নিতাই তার চাচাতো ভাই রঞ্জিত ও ভাগ্নে বিনয় ছাড়া আর কাউকেই আক্রমণকারীদের বাধা দিতে বা অস্ত্র কেড়ে নিতে দেখেননি। সম্ভবতঃ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ, ভয় বা পরস্পরের কাছে অপরিচিত হওয়ার কারণে শরণার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো কিছু করতে পারেনি।

পরিশেষে উপস্থিত সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতীয়মান হয় না কারা আসলে সে সব হত্যাকারী ছিলো। আমি বেশ ক'জন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা যারা ১৯৭১ সালের মে মাসে যশোর, খুলনায় কর্মরত ছিলেন-তাদেরকে চুকনগরের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ হায়াত, যিনি ওই সময়ে যশোরে ১০৭ ব্রিগেড-এর কমান্ডে ছিলেন; তা ছাড়া ছিলেন ২২ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-এর কর্ণেল (তদানীন্তন মেজর) সামিন জান বাবর ও ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট-এর লেফটেন্যান্ট জেনারেল (তদানীন্তন লেফটেন্যান্ট) গোলাম মুস্তফা। তাদের কেউই চুকনগর ঘটনা সম্পর্কে কিছু শোনেননি বলে জানান। চুকনগরে বড় ধরনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণে তারা সম্মতি জানিয়েছেন, কিন্তু তার পরেও তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করেন যে তাদের অধীনস্থ কেউ যদি এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তবে তারা কোনো না কোনো সময়ে জানতে পারতেন। কিন্তু যদি তাদের অধীনস্থদের কেউ চুকনগরের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে না থাকে তাহলে সাতক্ষীরা যশোর এলাকার কেউ অবশ্যই এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে তাদের ধারণা। যে বা যারা ওই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব হচ্ছে সামরিক বাহিনীর। ন্যায় বিচারের স্বার্থেই এটা করা উচিত এবং যদি তা করা হয় তাহলে তা শুধুমাত্র হত্যার শিকার নিরীহ মানুষগুলোর প্রতিই বিচার নিশ্চিত করবে না বরং তা সেনাবাহিনীর স্বার্থ ও ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করবে। অথচ ২৫-৩০ জনের একটা দল চুকনগরের নিরস্ত্র ও অসহায় হিন্দু শরণার্থীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে একটি পুরো সেনাবাহিনীকে এবং সম্পূর্ণ জাতিকেই স্থায়ী লজ্জায় ডুবিয়েছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৭

হিট এন্ড রান

অন্তর্ঘাত ও প্রতিশোধ

'বড় অভিযানগুলো সব সময় ভারতীয়রাই পরিচালনা করছে... তারপর তারা এগুলোকে বলছে "মুক্তি ফৌজ"-এর বিজয়। এমন না যে আমরা অকৃতজ্ঞ। কিন্তু এটা আমাদের যুদ্ধ ও আমাদের ভূমি। আমাদের কাজ আমরা নিজেরাই করতে চাই।'

-গার্ডিয়ান পত্রিকার ব্রিটিশ-বাঙালি সাংবাদিক-এর নিকট বিদ্রোহের সমর্থক একজন বাঙালি স্বেচ্ছাসেবক, আগস্ট, ১৯৭১[১]

'প্রচারযন্ত্র যথেষ্ট পরিশ্রম করে ও কার্যকরী ভূমিকা রাখে। পরনে লুঙ্গি, হাতে রাইফেল-মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা তাৎক্ষণিকভাবে নায়ক বনে যায়... সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত সাংবাদিক সমাজ কাল্পনিক সাফল্যের দাবি গিলতে শুরু করে এবং সেগুলো ব্যাপক বিশ্বাসযোগ্যতাও অর্জন করে।'

-মেজর জেনারেল লছমন সিং, ভারতীয় সেনাবাহিনী[২]

'লক্ষ্যবস্তুসমূহে মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পরই ভারতীয় সৈন্যদের ভারতের ভূমিতে ফিরিয়ে নেয়া হতো- যদিও কখনো কখনো এসব নিয়ন্ত্রণ হতো স্বল্পসময়ের জন্য, কারণ প্রায়ই এ সব লক্ষ্যবস্তুর দখল হতো স্বল্পস্থায়ী, পাকিস্তানী বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করলেই মুক্তি বাহিনী তাদের খুব কম সময়ই সেগুলোর দখল ধরে রাখতে সক্ষম হতো। ভারতীয়দের জন্য এটা ছিল চরম বিরক্তির।'

-সিসন ও রোজ, *ওয়ার এন্ড সেসেশন: পাকিস্তান,ইন্ডিয়া এন্ড দি ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ*[৩]

১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল *ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে*-এ পিটার কান অত্যন্ত নিখুঁত ও দূরদর্শীতাসম্পন্ন বিশ্লেষণধর্মী এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশ এ অবস্থায় বিপ্লবী যুদ্ধের ইতিহাসের সবেচেয়ে দুর্বলতম ও সম্ভবত সবচেয়ে কম সময় স্থায়ী যুদ্ধ শুরু করেছে'। তিনি বলেন, 'এক মাসের কম সময়ে ও ৫০,০০০-এর কম সেনা সদস্য, সীমিত আগ্নেয়াস্ত্র ও সীমিত বিমান বাহিনীর সমর্থনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৭৫ মিলিয়ন (৭ কোটি ৫০ লাখ) শত্রুভাবাপন্ন বাঙালিকে আপাততঃ হলেও দমন করতে সক্ষম হয়েছে'। কান আরো লিখেছেন: 'তার অর্থ এ না বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যদি পূর্ব পাকিস্তান কখনও স্বাধীন হতে চায়, তাহলে গত চার সপ্তাহের স্বতঃস্ফূর্ত জ্বালাও পোড়াও ধরনের বিপ্লব দ্বারা তা অর্জন সম্ভব নয়। সপ্তাহ ধরে নয়, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বছরের

www.pathagar.com

পর বছর ধরে লড়াই করা; চাই কার্যকরী অভিযান ও কম বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা; আত্মত্যাগ, চাই গেরিলা কৌশল, প্রচলিত যুদ্ধ নয় এবং সম্ভবত দরকার বামপন্থী জঙ্গি কর্মীবাহিনী- আদর্শবাদী মধ্যপন্থী নয়। আর তা অনেকখানিই নির্ভর করবে ভারতের সার্বিক সহযোগিতার উপর'।[৪]

১৯৭১ সালের মে মাসে সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানে একটি ক্ষুদ্র বিদেশী সাংবাদিক দলকে বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনের অনুমতি দিয়েছিলেন। সে সময় *'নিউ ইয়র্ক টাইমস'* রিপোর্ট করে 'পূর্ব পাকিস্তানে সকল সশস্ত্র বিরোধীপক্ষ নি:শেষ হয়ে গেছে'।[৫] অপরদিকে *'দি এসোসিয়েটেড প্রেসের'* মর্ট রোসেনবাম সামরিক কর্তৃপক্ষের সেন্সরশিপ এড়াতে ব্যাংকক থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে প্রদেশটিকে 'নতজানু ও অক্ষম' হিসেবে বর্ণনা করেন।[৬] তারপরও যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছিলো অনেক দেরী। *ফাইনান্সিয়াল টাইমসের* হারভী স্টকউইন লিখেছিলেন, '...তখনও পর্যন্ত পাকিস্তান নিজেদের ধ্বংসের দিকে ধাবিত হওয়ার সকল কৌশল প্রয়োগ করেনি। সামনে আরো হিংসাত্মক কার্যকলাপ অপেক্ষা করছে'।[৭]

পরবর্তী কয়েক মাসে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সংকট নিরসনে কোনো রাজনৈতিক সমাধান বের করতে ব্যর্থ হয় ও পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনারা যেন বাঙালি বিদ্রোহীদের সাথে অনন্তকালব্যাপী এক ধারাবাহিক নাজেহাল হওয়ার সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। আর এর মাঝে ভারতের সম্পৃক্ততাও বৃদ্ধি পায় ও সবশেষে দু'দেশের মধ্যে শুরু হয় প্রত্যক্ষ যুদ্ধ। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে এমন কয়েকজন 'আন্ডারগ্রাউন্ড' যোদ্ধা ও এর বিপরীতে দীর্ঘ শক্তিক্ষয়ের যুদ্ধে ব্যাপৃত পাকিস্তানী সেনা ইউনিটের নেয়া কৌশলের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিদ্রোহী যোদ্ধা হিসেবে একজন শিল্পীর প্রতিকৃতি

আবুল বারক আলভী একজন শিল্পী। দেখতে ছোটখাট, মৃদুভাষী ও দয়ালু স্বভাবের, যাকে কোনোভাবেই সশস্ত্র বিদ্রোহীযোদ্ধা বলে কোনোভাবেই মনে হয় না। তারপরও তিনি ১৯৭১ সালে অসংখ্য তরুণ বাঙালিদের একজন যিনি একটি মুক্ত বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি সীমানা পার হয়ে ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন; গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন সংগ্রহ করেছেন তেমনি অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতাও চালিয়েছেন। আমি তার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার বাসায় সাক্ষাত করেছিলাম যেখানে তিনি ছিলেন চারুকলা ইন্সটিটিউটের একজন অধ্যাপক।[৮]

আবুল বারক আলভী সামরিক জান্তার হাতে ধরা পড়েন, কিন্তু যেভাবেই হোক নিজেকে তাদের থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন। যেন সে গল্পটা বলার জন্যই তিনি বেঁচে আছেন। আবুল বারক আলভী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের রোমাঞ্চকর দিকটা সম্ভবত ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আদর্শবান যুবক যিনি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য স্বেচ্ছায় গোপন গেরিলাযোদ্ধা হয়েছিলেন, এ জন্য তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, যুদ্ধে সফলতা ও ব্যর্থতা দুটোই সেখানে ছিল, কিভাবে ধরা পড়লেন এবং ধৃত অবস্থায় তার ভাগ্যে কি ঘটেছিল, সবই তিনি বর্ণনা করেছেন আমার কাছে।

আবুল বারক আলভী আমাকে বলেন, ১৯৭১ সালের পূর্বে তিনি বিশেষভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না, কিন্তু সম্ভবত সারা বিশ্বের অন্যান্য যুবকদের ন্যায় তিনিও বামধারার রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি পোষ্টার ও প্যাম্পলেট আঁকতেন। চলচ্চিত্র ও

www.pathagar.com

প্রকাশনা বিভাগে চাকরিও করেছেন। ১৯৭১ সালের মে মাসে কুমিল্লা সীমানা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেলাঘর ক্যাম্পে গিয়ে পৌছান।
আলভী ভারত থেকে বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে ঢাকায় তার চতুর্থ দফা অভিযানের সময় ধরা পড়েন। প্রথম দফায় আলভী বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন স্থানের গুরুত্বপূর্ণ নকশা ও শরণার্থীদের জন্য সাহায্য নিয়ে ভারতে ফিরে গিয়েছিলেন। আগস্ট মাসে তিনি ও তার দল ঢাকায় আসেন; তার ভাষায় বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সাথে নিয়ে এবং তার সঙ্গে আর যে তিনজন ছিলেন তারা হলেন- বকর, ফতেহ আলী ও কামাল। বকর ছিলেন দলনেতা। তারা ৫টি এসএলআর, ৫টি স্টেনগান, ১০টি গ্রেনেড, ৫/৬ বাক্স গুলি ও বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বহন করে নিয়ে এসেছিলেন।
পরবর্তী কর্মসূচির জন্য আলোচনা করতে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে ২/৩ দিনের মধ্যে দেখা করার কথা স্থির হয়। বকর নির্ধারিত স্থানে সময়মতো আসতে ব্যর্থ হলে আলভী মেলাঘরে ফিরে যান। ঢাকার সুপরিচিত সঙ্গিত পরিচালক আলতাফ মাহমুদ তার এক বন্ধুকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ২৯ আগস্ট আলভীকে ডাকলেন। সেই অনুযায়ী আলভী মাহমুদের বাড়িতে যান। কিন্তু যেতে বিলম্ব হয়েছিলো। মাহমুদের বাড়িটি ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উল্টো দিকে। ওই রাতে আলভীর থাকার কথা ছিল ফতেহ আলী'র বাসায় কিন্তু মাহমুদ ও তার পরিবারের সদস্যরা আলভীকে রাত বেশি হওয়ার কারণে আর যেতে দেননি। আর তাই আলভী সেদিন রাতে সেখানেই অবস্থান করেন।
আলতাফ মাহমুদ ব্যাপক জনপ্রিয় বাংলা গান, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'-এর সুরকার ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ গানটি পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির সাথে বিশেষভাবে আবেগের সাথে জড়িয়ে ছিল। তার স্ত্রী, সারা আরা মাহমুদ লিখেছেন আলতাফ মাহমুদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাথে কাজ করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসতো এবং প্রচুর অস্ত্র তাদের বাড়িতে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিলো।[৯] মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাহমুদ গোপন বেতারের জন্য কাজ করেন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সব ধরণের সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে যান এবং প্রয়োজনের সময় বিদ্রোহীরা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তার বাড়িতে লুকিয়ে রাখতো। এভাবেই চলছিলো তার দিনকাল। তবে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটাই ঘটলো শেষমেষ যে রাতে তার দরজায় শোনা গেলো কড়া নাড়ার শব্দ।
২৯/৩০ আগস্ট যেদিন আলভী মাহমুদের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন সেদিনই খুব সকালে দরজায় কড়া নাড়া দিয়েছিলো পাক সেনারা। সৈনিকরা তার বাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে দরজায় দুমদাম আওয়াজ করছিলো। আলতাফ মাহমুদ নিজে দরজা খুলে দিলে সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে পড়ে। তারা তার নাম জিজ্ঞেস করে- 'আলতাফ মাহমুদ, সঙ্গীত পরিচালক'; একইসাথে বাড়ির প্রত্যেক সদস্যকে ঘিরে রেখে গোটা বাড়িটা সার্চ করে সেনারা। এদিকে তাদের গাড়ি থেকে অন্য একজনকে বের করে নিয়ে আসে সৈন্যরা (আলভী বলেন অন্যরা তাকে মি. সামাদ হিসেবে শনাক্ত করেছিলো); তাকে ও মাহমুদকে বাড়ির পিছনে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে মাটির নিচে থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি বিশাল এক ট্রাংক উদ্ধার করা হয়। স্পষ্টত: কেউ এটার সন্ধান দিয়েছিলো। বাড়ির সকল পুরুষ মানুষ, আলভী, মাহমুদ ও তার চারজন শ্যালক, পাশের বাড়ি থেকে দু'জন ও উপর তলার ফ্ল্যাটের আরো তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় বিমানবন্দর সড়কের এমপি হোস্টেলে যা মার্শাল-ল'-কোর্ট হিসেবে ব্যবহৃত হতো সেসময়।[১০] আলভী

www.pathagar.com

জানান বাড়িতে তল্লাশী চলাকালীন ও এমপি হোস্টেলে পৌছানোর পর প্রত্যেককে বেধড়ক পেটায় পাক সেনারা।

একটি ছোট কক্ষে যেখানে সকলকে রাখা হয়েছিলো, সেখানে অবস্থানকালে আলভী অন্যান্য বন্দিদের বেশ ক'জনকে চিনতে পারেন-তার মধ্যে ছিলেন বাল্যবন্ধু জুয়েল (সুপরিচিত ক্রীড়াবিদ), রুমী (জাহানারা ইমামের সন্তান), চুল্লা, বেলায়েত, আজাদ ও আরো ক'জন। সেখানে গেরিলাদের ক'জন পুরুষ আত্মীয়ও ছিলেন যারা সকলেই কাঁদছিলেন।[১১] পাশের ঘরে জেরা করার জন্য একজনের পর একজনকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হতো। কখনো কখনো অর্ধেক খোলা থাকতো জেরা করার ঘরটির দরজা । বন্দিদের নির্যাতন ও পেটানোর সময় তাদের কান্নাকাটির আওয়াজ শোনাটা ছিল বড়ই বেদনাদায়ক।

আলভীর ভাষ্য অনুযায়ী নির্যাতনের ধরণটা এতোটাই ভয়াবহ ছিল যে কেউ কিছু জানলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়ে যেতো। আলভী ও অন্যান্যদের দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে, সামরিক জান্তা ঢাকায় গেরিলাদের পুরো দলটির কার্যকলাপ ও নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জেনে গিয়েছিল ও দলটির প্রায় সকলকেই গ্রেফতার করতে তারা সক্ষম হয়। আলভী শুনেছিলেন মাহমুদ তার বাড়িতে অস্ত্র রাখার কথা স্বীকার করে সেনা কর্তৃপক্ষকে বলেন যে, তার এক বন্ধুর অনুরোধেই তিনি ওই কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে আসেন। এক পর্যায়ে গার্ডটি আলভীর নাম ধরে ডাকলে আলভী বেশ সতর্ক হয়ে যান কারণ আলতাফ মাহমুদের বাড়ি থেকে তাকে তুলে আনার পর কারো তার নাম জানার কথা ছিল না। কেউ না কেউ তার নাম জেরাকারীদের বলে দেয় বলেই তার বিশ্বাস। তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি ভারত থেকে কখন ঢাকায় প্রবেশ করেছেন, তার সাথে আর কে কে আছে, কি ধরনের অস্ত্র তারা নিয়ে এসেছেন ও অস্ত্রগুলো কোথায় রেখেছেন? আলভী উত্তরে বলেন সে কখনোই ভারতে যাননি। তাকে পেটান হয়, কিন্তু তিনি সবকিছু পূর্বের ন্যায় অস্বীকার করতে থাকেন। এপর প্রশ্নকর্তা গার্ডকে নির্দেশ দিলেন বকরকে নিয়ে আসার জন্য। ইতোমধ্যে আলভীকে তার সাথে যে চারজন পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছিল তাদের নাম ও কি ধরনের অস্ত্র আনা হয়েছিল তার তালিকা দেখালেন প্রশ্নকর্তা। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে অন্যদের কোনো একজন বা ক'জন ধরা পড়েছে ও জেরাকালে সব বলে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও আলভী কোনোভাবেই তার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেননি। এরপর বকরকে ওই ঘড়ে নিয়ে আসা হয়, ওইদিন নির্ধারিত স্থানে বকরের অনুপস্থিতির কারণ এবার আলভীর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাকে জেরাকারী শুধুমাত্র আলভীকে শনাক্ত করতে বলেন, বকর ঈষৎ মাথা ঝুকিয়ে আলভীর পরিচয় নিশ্চিত করেন।

আমাদের আলোচনার এ পর্যায়ে আবুল বারক আলভী'র কণ্ঠস্বর বিশেষভাবে ক্ষীণ হয়ে আসে, তিনি বলেন, সবকিছু বলে দেয়ার জন্য বকরের প্রতি আমার কোনো ধরনের অসন্তুষ্টি নেই, বুঝেছি এ অসহায় নির্যাতন বকর সহ্য করতে পারেনি। একজন লোকের এটি ছিল এক অসাধারণ মহানুভবতা যিনি তার পরিচয় শনাক্তকারী যার দ্বারা আলভীর মৃত্যু পরোয়ানা নিশ্চিত হয়েছিল তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছেন। তবে আলভী বকরকে আর কখনোও দেখেননি।

এদিকে শনাক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে আলভীর মনে হয় সবকিছু শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও তিনি ক্রমাগত তার সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে চলছিলেন। তিনি বলেছিলেন জীবনে কোনোদিন তিনি বকরকে দেখেননি, বকর অবশ্যই ভুল করেছে অথবা নিজেকে বাঁচাতে

www.pathagar.com

তার কাছে যা জানতে চাওয়া হয়েছে নির্যাতনে টিকতে না পেরে সে তাই বলে দিয়েছে জেরাকারীদের সন্তুষ্ট করার জন্য। এরপর আলভীর উপর আরও নির্যাতন চালনো হয়, হুমকি দেয়া হয় তাকে মেরে ফেলার এবং যখন কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছিলো না তখন অফিসারটি তার হাতের কাগজের টুকরোটা মুড়িয়ে ফেলেন তার সামনে ও হতাশ হয়ে ঘরের কোনায় তা ছুঁড়ে দেন। আলভীকে এরপর পাশের ঘরে নিয়ে আবার নির্যাতন শুরু করে সেনারা এবং তা এতোটাই কষ্টদায়ক ছিল যে তার পক্ষে তা বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। আলভী বলেন, কেবল বলা যায় যে ওই নির্যাতনে তার গোটা শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল এবং চোয়াল ও হাত পায়ের সব আঙ্গুল ভেঙ্গে দিয়েছিলো জেরাকারীরা। বন্দি থাকাকালীন পুরো সময়টা ধরে কারো কাছে খাবার কোনো জিনিস বা পান করার মতো পানি জাতীয় কিছুই ছিল না।একজন বেশ বয়স্কসৈনিক, মনে হয় সুবেদার মেজর যা আলভী ধারণা করেছিলেন, তিনি গোপনে কয়েক টুকরো রুটি ও সামান্য চিনি এনে দিয়েছিলেন বন্দিদের জন্য। আলভী মনে করেন ওই সৈনিকটি ছিলেন একজন বালুচ।[১২]

অনেক রাতে সকল বন্দিকে বাসে করে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।[১৩] সেখানে তিনি তার নাম আলভী বাদ দিয়ে সৈয়দ আবুল বারক হিসেবে নথিভুক্ত করেন। সেখানের অন্যান্য বন্দিরা নতুন আগত ওই সব বন্দিদের শুশ্রূষা করেন, ঔষধের ব্যবস্থা করেন, এনে দেন খাবার। আলভী ইতোমধ্যে আলতাফ মাহমুদের সাথে তার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন ও আলতাফ মাহমুদের আত্মীয়দের নাম জেনে নেন। কারণ মাহমুদের বাসায় ওই রাতে থাকার যুক্তি হিসেবে নিজেকে সেখানে বেড়াতে আসা তার (মাহমুদ) একজন আত্মীয় বলে পরিচয় দেয়াটাই হতে পারতো বুদ্ধিমানের কাজ।

পরদিন তাদের আবারও এমপি হোস্টেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেবার তাদের রাখা হয় অন্য একটি ভবনে। একটি কক্ষে বন্দিদের রিপোর্ট করার জন্য ডাকা হয় এক এক করে। আলতাফ মাহমুদ ও তার আত্মীয়দের ডাকা হয় একসঙ্গে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আলভী জেরাকারীদের জিজ্ঞেস করেন- কেন তাকে ডাকা হচ্ছে না। তার নাম জানতে চাইলে আলভী বলেন, সৈয়দ আবুল বারক, স্পষ্টত: এ নামের বিপরীতে কোনো রিপোর্ট ছিল না; তার কাছে জানতে চাওয়া হয়- কেন তাকে এখানে আনা হয়েছে? নিরপরাধীর ভঙ্গি নিয়ে আলভী বলেন, তিনি আলতাফ মাহমুদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং তার পরিবারের অন্যান্যদের সাথে তাকেও সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এরপর মাহমুদ ও তার পরিবারের সাথে তাকে জেরা করা হয়। এবার জেরাকারীরা ছিলেন ভিন্ন ও সম্ভবত আগের দিনের জেরাকারীদের চেয়ে সিনিয়র। তাকে বেশ কম বয়সি ও ছোট হওয়ায় এবং অধিক নির্যাতনে কাবু দেখাচ্ছিল বলে ক'জন অফিসারকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল মনে হয়েছিল। তার বয়সের ক'জন গেরিলার নাম বলার জন্য আলভীকে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু আলভী তাদের বলেন, তিনি প্রতিদিন নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন বলে কে বা কারা গেরিলা তা তার জানা নেই। তার অফিসের টেলিফোন নম্বর চাইলে আলভী তা দিয়েছিলেন, একই সাথে মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন যে সে নম্বরে ফোন করলে যেই তা রিসিভ করুক না কেন সে যেনো অফিসে তার উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করে। এ পর্যায়ে আলভী ভাবছিলেন- যাক ঝামেলা থেকে হয়তো রেহাই পাওয়া গেছে। কিন্তু মুহূর্তেই তার গায়ের রক্ত বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। তিনি আতংকের দৃষ্টিতে দেখলেন আগের দিন বকর আলভীকে সনাক্ত করার সময় যে সৈনিকটি উপস্থিত ছিল সে

www.pathagar.com

হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সৈনিকটি এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি।

আলভী পবিত্র কোরান শপথ করে বলেছিলেন, তিনি কোনো দিন ভারতে যাননি ও কোনো বিদ্রোহীকেও চিনতেন না, কিন্তু মিথ্যা বলার জন্য মনে মনে আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। আলতাফ মাহমুদ বাদে সকলকে ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় মুক্তি দেয় সেনা কর্তৃপক্ষ। আলতাফ মাহমুদকে আর কখনো দেখা যায়নি। যে সৈনিকটি আলভীর আগের দিনের ঘটনা প্রকাশ করে দেয়নি সে আলভীকে গেটের বাইরে যেতে দেখে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, যাও এবং একজন ভালো ডাক্তার দেখাও গিয়ে।

একজন বিয়োগাত্মক নায়কের বেদনার গান- ব্যালাড অফ এ ট্রাজিক হিরো

রুমী সম্পর্কে আমি প্রথম জানতে পারি যুক্তরাষ্ট্রে আমার এক বন্ধু জাফর আহমেদের কাছ থেকে, যিনি ছিলেন তার পারিবারিক বন্ধু। তিনি আমাকে রুমী'র মা জাহানারা ইমামের লেখা 'একাত্তরের দিনগুলো' পড়তে সুপারিশ করেন। আমি এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলি। বইটি ডায়েরী ধাচের লেখা যেটি ১৯৭১ সালের বর্ণনার একটি সাড়া জাগানো রচনা; ঘটনার শুরু ১ মার্চ ও শেষ ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর। জাহানারা ইমাম তার ডায়েরী যখন লেখা শুরু করেন তখন তার সংসারে ছিলেন তার স্বামী প্রকৌশলী শরীফ ইমাম, শ্বশুর এবং দুই সন্তান-রুমী ও জামী। ইতোমধ্যে অসংখ্য নিখোঁজ হওয়াদের ভিড়ে তার সন্তান রুমীও নিখোঁজ হয়ে যায় ২৯ আগস্ট ও তার স্বামী শরীফ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার মাত্র তিন দিন পূর্বে।

রুমীর গল্প ১৯৭১ সালের বাঙালিদের বেদনাময় একটি উপাখ্যান। এ ঘটনাটির সাথে বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অসংখ্য নর-নারীর আত্মহুতি দেয়ার মতো ঘটনার প্রচণ্ড রকম মিল রয়েছে। কোলকাতায় বেড়ে ওঠার সাথে আমি এ ধরণের বিদ্রোহীদের উপর বেশ কিছু বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় সাহিত্য পড়েছিলাম। জাহানারা ইমাম তার পুত্র রুমী ও তার বিদ্রোহী বন্ধুদের 'বিচ্ছু' আখ্যা দিয়েছিলেন। জাহানারা ইমাম তার বর্ণনায় বলেছেন, এ বিচ্ছুরা তার বাসায় বিস্ফোরক মজুত করতো মার্চ মাসের গোড়ার দিক থেকে, হঠাৎই নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো এবং প্রায়ই যত্রতত্র বোমা বিস্ফোরণ বা গুলিবর্ষণের দ্বারা তাদের উপস্থিতি জানান দিতো। অনেক বাংলাদেশী লেখক এ সব বিদ্রোহীদের 'বাংলার দামাল ছেলে' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বেপেরোয়া ভাবের জন্য। এ শব্দগুলো (বিচ্ছু বা দামাল ছেলে) বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের সম্পর্কে রচিত গল্পে ব্যবহৃত শব্দের ন্যায়; যেমন গুপ্তহত্যা, অন্তর্ঘাতমূলক কাজে তাদের বীরত্ব ও নিয়মিত করুণ মৃত্যুর রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা। জাহানারা ইমামের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ বর্ণনার একটিতে দেখা যায় সীমানা অতিক্রম করে ভারতে চলে যাওয়ার আগের রাতে জাহানারা ইমাম শোবার সময় তার সন্তানের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়ার মুহূর্তে রুমী যেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী ক্ষুদিরাম বসুর সেই গানটির শব্দ শুনতে পেয়েছিল- *একবার বিদায় দাও মা ঘুড়ে আসি...*; ক্ষুদিরাম বসু প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহী যাকে ১৯০৮ সালে বৃটিশরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে কয়েক সপ্তাহ ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর অবশেষে রুমী ১৪ জুন ভারতের পথে রওনা হয়। রুমীর মায়ের বর্ণনায় জানা যায়, সে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার কাছে

www.pathagar.com

বিদ্রোহী বাঙালি সেনা কর্মকর্তা খালেদ মোশাররফ-এর সাথে যোগ দেয় ও একজন গেরিলাযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। জুলাই মাসে খালেদ মোশাররফ-এর কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সকল ব্রীজ ও কালভার্টের তালিকা চেয়ে একটি অনুরোধ আসে। রুমীর পিতা শরীফ ইমাম জড়িত হয়ে পড়েন প্রদেশের সড়ক ও জনপথ বিভাগ থেকে ব্রীজ ও কালভার্টের তালিকা সংগ্রহের কাজে। ওই সময় মেলাঘরে অন্য যে সব যুবক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলো তারা প্রায়ই রুমীর খবরা-খবর নিয়ে তাদের বাসায় আসতো।

রুমী বাড়ি ফিরে আসে ৮ আগস্ট। সে আগরতলার মেলাঘরের জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছিল তার পিতামাতার কাছে। ক্যাপ্টেন হায়দার তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং সে ও তার দলকে বিশেষ কাজে পাঠানো হয়েছিল ঢাকায়। ক্যাপ্টেন হায়দার ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল মিঠার এসএসজিতে (কমান্ডো) প্রশিক্ষণ নেয়া একজন চৌকষ কর্মকর্তা। সে সময় ঢাকায় এ ধরণের প্রায় নয়টি গেরিলা দল নিয়োজিত ছিল বিভিন্ন ধরণের অপারেশন পরিচালনার জন্য। আর ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা এ অপারেশনগুলো দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মা লিখেছেন, রুমী সবসময় চাইতো একজন গেরিলা হতে। সে একবার ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থায়ও যোগ দিতে চেয়েছিল।

পরের দিনগুলোতে রুমী প্রায়ই বাইরে থাকতো, কিন্তু নাশকতামূলক কার্যকলাপে অংশ নিতো না যা সেসময় শহরে প্রায়ই ঘটতো। তার মা প্রায় তার ছেলের গেরিলা বন্ধু কাজী, আলম, বদি, স্বপন, চুল্লু-এদের সাক্ষাত পেতেন যারা মাঝে মধ্যে বাসায় আসতো তার হাতে তৈরি খাবার খাওয়ার জন্য। একবার এ দলটাকে সিদ্ধিরগঞ্জে পাওয়ার স্টেশনটি বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু ওখানে ছিল কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কাজী ছিল ওই দলটির নেতা, আর তাদেরকে প্রচুর গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয় যার মাঝে রকেট লাঞ্চারও ছিল। একদিন তারা দুটি নৌকা নিয়ে ওই স্থানটি পর্যবেক্ষণ বা রেকি করতে গেলে তাদের একটি নৌকায় যাতে ছিলো কাজী, বদি ও জুয়েল তা হঠাৎ করে পাক সেনাদের বহনকারী অপর একটি নৌকার মুখোমুখি পড়ে যায়। দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে জুয়েলের আঙ্গুলে গুলি লাগে ও তাদের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ রকম আরো অনেক ছোট-খাট অপারেশন তারা চালিয়ে যাচ্ছিল যেখানে তারা দু'য়েকটি বোমা ছুঁড়ে মারতো বা গুলি ছুঁড়তো যেগুলোর সবই ছিল প্রায় অপরিকল্পিত, কোনোটি ছিল আবার হঠাৎ এসে যাওয়া 'সুযোগের' মতো।

২৫ আগস্ট রুমী অবশেষে এরকম একটি অভিযানে অংশ নেয়ার সুযোগ পায় হঠাৎ করে। তার মনে হয়েছিল ওটাই হয়তো হতে যাচ্ছে তার প্রথম ও শেষ অভিযান। সে তার বন্ধুদের সাথে প্রচণ্ড রকমের উত্তেজিত হয়ে বাড়িতে আসে এবং তার মাকে বলে তাদের গাড়িতে করে এক জায়গায় নিয়ে যেতে। সেখানে গিয়ে তারা একটি গলিতে লুকিয়ে ফেলে রাখা তাদের অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে। জাহানারা ইমামের বর্ণনা অনুসারে রুমী ও তার বন্ধুরা সে সময় দু'টি গাড়ি ছিনতাই করে এবং রুমীর দল ধানমণ্ডির ২০ নম্বর রোডে একজন চীনা কূটনীতিকের বাসায় পাহারারত পুলিশকে গুলি করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু ওইদিন সন্ধ্যায় সে বাড়ির সামনে কোন পুলিশ পাহারা ছিল না। তাই তারা ১৮ নম্বর রোডে এক বাড়িতে পাহারারত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। কাজী, বদি ও সেলিম গুলি ছুঁড়তে থাকে আর রুমী ও স্বপন বিপরীত দিক থেকে কোনো হামলা আসলে তার পাল্টা জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি। ফিরে আসার পথে

www.pathagar.com

তারা একটি চেক পয়েন্টের সামনে পড়ে যায় এবং স্বপন ও বদি সেখানে দু'জন মিলিটারী পুলিশকে গুলি করে পালিয়ে আসে। পালিয়ে আসার পথে একটি জীপ তাদের পিছনে ছুটে আসে ধাওয়া করে। এ অবস্থায় রুমী গাড়ির পিছনের কাঁচ ভেঙ্গে জীপটি লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে এবং স্বপন ও বদিও গুলি করতে থাকে; এতে জীপটা রাস্তার পাশে ল্যাম্পপোষ্টে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়।

জাহানারা ইমামের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ বর্ণনানুযায়ী, পরবর্তী ক'দিন ধরে তাদের এ চকমপ্রদ অভিযানের উপর অবিরাম ও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলতে থাকে। রুমী বাড়িতে 'জিম রিবস এলবামস ও টম জোনস' এর *গ্রীন গ্রীন গ্রাস অব হোম* বাজিয়ে শুনছিল ও তার সাথী গেরিলারা তাদের বাড়িতে এসেছিল খাওয়া দাওয়া-গল্প গুজব করতে। ২৯ আগস্ট মা জাহানারা ইমাম তার সন্তান রুমীর চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন আর বেতারে ক্ষুদিরাম বসুর সেই গানটি বাজছিল, *একবার বিদায় দাও মা...*;যেন এটা ছিল পরবর্তী কোনো ঘটনার ইশারা।এসময় দরজায় কেউ যেন ধাক্কা দেয়। পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলে পাক সেনারা। ইমাম লিখেছেন ,কলেজ ছাত্রের মতো দেখতে একজন আর্মি ক্যাপ্টেন ও তার বয়স্ক বিহারী সুবেদার বাড়িটা তল্লাশি করে সকল পুরুষ মানুষকে জেরা করার জন্য সেখান থেকে নিয়ে যায়।

পরদিন জাহানারা ইমাম তার স্বামী ও সন্তানদের খবরের জন্য ক্যাপ্টেন ও সুবেদারকে অনেকবার ফোন করেছিলেন, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সন্ধ্যায় হঠাৎ ইমাম ফোনে একজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে পান যিনি ইমামকে নম্রভাবে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে দুশ্চিন্তার কিছু নেই কারণ জেরা করতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। তিনি তার স্বামী বা সন্তানদের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সেই কর্মকর্তা তার ছোট ছেলে জামীকে টেলিফোনে কথা বলতে দেন। ইমাম জানতে পারেন তারা সারাদিন কিছুই খায়নি এবং তিনি সুবেদারকে অনুরোধ করেন তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিছু খাবার কিনে দেয়ার জন্য। পরদিন তিনি এমপি হোস্টেল জেরা কেন্দ্রে যান কিছু পরিষ্কার কাপড় চোপড় ও এক প্যাকেট স্যান্ডউইচ নিয়ে। তিনি ওই সুবেদারকে চিনতে পেরেছিলেন ও তার স্বামী সন্ত ানদের সাথে দেখা করার জন্য তাকে অনুরোধ করেন। সুবেদারটিকে খুব আশ্চার্যান্বিত হয়েছেন ও অস্বস্তিবোধ করছিলেন বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু তারপরও তিনি ইমামকে পাশের কক্ষে যেখানে একজন অফিসার বসে ছিলেন সেখানে নিয়ে যান ও তার সাথে কথা বলিয়ে দেন। ওই সেনা কর্মকর্তা ইমামকে জানান যে তার পরিবারের কেউই সেখানে নেই, তারা সেনানিবাসে আছে এবং তার এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। জাহানারা ইমাম সুবেদারকে কাপড় ও স্যান্ডউইচের প্যাকেট দেন তার পরিবারের সদস্যদের দেয়ার জন্য। সুবেদারকে মনে হয়েছিল অসহায়, কিন্তু ইতস্তত করে হলেও তিনি ওই জিনিসগুলো গ্রহণ করেন।

খুব শীঘ্রই রুমী ছাড়া সকলেই বাড়ি ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে অন্য এক যুবককেও ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের কখনোই সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়নি। পরিবারের ফিরে আসা সদস্যরা জানান যে, প্রধান সড়কে কেউ একজন অন্য একটি গাড়ি থেকে রুমীকে শনাক্ত করে, তারপর সেনা কর্মকর্তাটি তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে নিয়ে যায়। এমপি হোস্টেলের জেরা কেন্দ্রে পৌছলে পুনরায় তাকে শনাক্ত করা হয়। বাকীদেরও আরো একদফা আচ্ছা করে পেটানো হয় ও জেরা করা হয়। এই কাজটি করেন একজন কর্ণেল

www.pathagar.com

বিমানবন্দর সড়কের জেরা কেন্দ্রে। যাদেরকেই বিমানবন্দর সড়কের ওই জেরা কেন্দ্রে নেয়া হয়েছে তাদের সবাই ওই কর্ণেলের কথা বলেছেন। যা হোক তারপর তাদের তালা মেরে রাখা হয় একটি ছোট ঘরে যেখানে তারা অনেকের দেখা পান- বদি, চুল্লু, আলতাফ মাহমুদ ও তার আত্মীয় স্বজন, আলভী, জুয়েল। গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে সেনাবাহিনী নয়টি বা দশটি বাড়িতে হানা দিয়েছিল এবং কাজী বাদে প্রত্যেকে গ্রেফতার করতে তারা সক্ষম হয়। কাজী যে কোনোভাবেই হোক পালিয়ে বাঁচেন। রুমীকে ওই ছোট ঘরটিতে নিয়ে আসলে সে নিশ্চিত হয়ে যায় তার প্রশ্নকর্তা ইতিমধ্যে সবকিছু জেনে গেছেন যে কতোজন ওই দিনের অভিযানে জড়িত ছিল, কোনো কোনো গাড়িতে কে কে ছিল ও কতোজনকে তারা হত্যা করেছিল? কাজেই সে তার ভূমিকা স্বীকার করবে বলে প্রস্তাব দেয় জোরাকারীদের ও পরিবারের অন্যদের বলে যে তারা যেনো বলেন রুমীর কার্যকলাপের কিছুই তাদের জানা নেই। আলতাফ মাহমুদও একই কথা তার পরিবারের সদস্যদের বলেছিলেন। রুমী জানায়, তার মা জাহানারা ইমামের টেলিফোন কল পাওয়ার পর সেই সুবেদারটি তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রুটি ও কাবাব এনে দিয়েছিলেন।[১৫] রুমীকে ওই রাতে অন্যদের সাথে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়নি। তাকে আর কখনো কেউ দেখেনি।

আবেগময়তার মৃত্যু

রুমীর প্রথম ও শেষ অভিযান ছিল ২৫ আগস্ট। তাকে ও অন্যান্য বেশ ক'জনসহ তাদের আত্মীয়-স্বজনদের ২৯ আগস্ট উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাঙালি লেখক / গবেষকদের বর্ণনা অনুসারে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে সেনাবাহিনী ওই রাতে বেশ ক'টি বাড়িতে হানা দেয় যার মধ্যে আলতাফ মাহমুদ এবং শরীফ ও জাহানারা ইমামের বাড়িও অন্তর্ভূক্ত ছিল। সেনাবাহিনী লোকগুলোকে খুঁজছিল সঠিক গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এক্ষেত্রে চমৎকার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তাদের সঠিক অবস্থান, কবে তারা ভারত থেকে এ দেশে প্রবেশ করেছে, তাদের হাতে কি ধরনের অস্ত্র ছিল এবং ওই অস্ত্র কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তার সবই তারা জেনে যায়। স্পষ্টত: সেনাবাহিনীকে এসব তথ্যদাতারা ছিল গেরিলা দলের ভিতরেই বা তাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিধির মধ্যে। এ বিশ্বাসঘাতকতা বোধ জাহানারা ইমামের বই ও সারা আলতাফ মাহমুদের স্মৃতিচারণেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

যা হোক, ঢাকার এ গেরিলাদের গল্প যা জাহানারা ইমামের বইটিতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে বেশ ক'টি প্রশ্নের উদ্রেক হয়। প্রথমত: রুমী ও তার সহ গেরিলারা অসাধারণ কেতাদুরস্ত কৌশলে ঢাকার বুকে ক'জন পুলিশকে গুলি করে হত্যা করেছিল। কিন্তু এরপর তাদের ঘরে বসে সদলবলে ভালোমন্দ খাওয়া দাওয়ার সাথে গান শোনা ও গল্প করা ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের ঘরে সকলে প্রত্যেক দিন একত্রিত হওয়া এবং কে কি করছিল তা নিয়ে আলোচনা করা শুধু তাদেরই জীবন ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়নি বরং ওই বাড়ির প্রত্যেকের জীবনকেও ঝুঁকির মাঝে ঠেলে দিয়েছিল।

আরো একটি কঠিন প্রশ্ন হচ্ছে যে এ ধরনের অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে রুমী ও তার মতো অন্যদের জীবনের মূল্য কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল। সন্তান হারানো জাহানারা ইমামের ব্যথা ও অন্যদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ভাই হারানোর মানসিক যন্ত্রণাটা অনুভব না করা অসম্ভব ব্যাপার। কাউকে হত্যা করাটা রুমীর জন্য প্রতৃকপক্ষে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা তার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তার ওই অভিযানই বা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে কীভাবে অবদান রেখেছিল?

www.pathagar.com

প্রথম বাঙালি শহীদ ক্ষুদিরাম বসু একজন বৃটিশ বিচারককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে দু'জন নিরপরাধ বৃটিশ মহিলা নিহত হন ও যার জন্য তাকে ঝুলতে হয় ফাঁসিতে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ক্ষুদিরাম বসুর ভাবমূর্তিকে ব্যবহার করা অন্য কারণেও কৌতুহলের বিষয়। ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে বৃটিশ শাসনামলে সকল বাঙালি বিদ্রোহী শহীদদের একটি তালিকা আছে; ওই তালিকায় ক্ষুদিরাম বসুর নাম আছে সবার উপরে। তালিকার নামগুলো সবই হচ্ছে হিন্দুদের। এখানে মুসলমানদের নাম না থাকার কারণ এ নয় যে তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের কোনো উৎসাহবোধ ছিল না বরং সেসময় আন্ডারগ্রাউন্ড জঙ্গি তৎপরতার চরিত্রটিই ছিল ওই ধাচের। ঐতিহাসিক লিওনার্দ গর্ডনের মতে, '...তখন ওই সময় বাংলায় বিপ্লবী কর্মীদের গ্রহণ করা হতো একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী থেকে। এরা সকলেই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের যেখানে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নেয়া হতো না বা তাদের বাদ রাখা হতো। ....ত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য ওই সব বিপ্লবীদের হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস, প্রতীক, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি ও বিশেষ করে মা ধরিত্রীর উপর আস্থার মতো বিষয়গুলো বাধ্যতামূলক ছিল। সঙ্গতকারণেই এসবে মুসলমানরা সাহায্য করতে উৎসাহিত হতো না ও তারা জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকতো।' কিন্তু অন্য প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের ঢাকার বিপ্লবীরা বাংলার ঐতিহ্যবাহী ষড়যন্ত্রবিষয়ক জঙ্গিবাদের অংশ হলেও: 'বিপ্লবীরা প্রায়ই নিছক প্রণোদনা ও আবেগতাড়িত হয়ে কোনোরূপ সাবধানতা অবলম্বন ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়াই বিপ্লবাত্মক কাজে জড়িয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের ছিল কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য। সুনির্দিষ্ট হিংসাত্মক তৎপরতার সাথে ভারতের স্বাধীনতার যোগসূত্র ছিল নিতান্তই অস্পষ্ট একটি বিষয়।'[১৬]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিয়োগাত্মক বীর হিসেবে রুমীর স্থান তার নির্দিষ্ট কোনো অভিযানের মধ্য দিয়ে নির্ণিত হয়নি বরং তার স্থান নিশ্চিত হয়েছে মানবিক যন্ত্রণা ক্লীষ্ট তার মায়ের ক্রমাগত স্বীকৃতির মাধ্যমে। সম্ভবত তার এই স্বীকৃতি অন্য যারা আজও বেঁচে আছেন ও বাস্তবজীবনে অনেক কিছু অর্জন করেছেন তাদের অর্জনকেও আড়াল করে দিয়েছে। সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার প্লান্টে নভেম্বর মাসে সফলভাবে বোমা হামলা চালিয়েছিল অন্যরা। তারপরও রুমী নিজের নামের চেয়েও বড় কিছু হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন, ১৯৭১ সালে যে সব তরুণ স্বেচ্ছায় গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, গেরিলা সদস্য হয়ে যুদ্ধ করার স্বপ্ন দেখেছে যেন তাদের সবার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। তারা হয়তো কাঁচা কাজ করেছেন কিন্তু তারা বিশ্বাস করতেন 'মহৎ কোন উদ্দেশ্যে', নিজেদের জীবনের চেয়েও তাদের কাছে বড় ছিল আদর্শের পথে সংগ্রামের চেতনা।

অদৃষ্টের পরিহাস, যারা তাদের বিরোধিতা করেছে তাদেরও বিশ্বাস ছিল 'মহৎ এক উদ্দেশ্যে' - তা ছিল তাদের দেশের একতা ও সংহতি রক্ষা। কারো কাছে যে মুক্তিযোদ্ধা অন্যজনের কাছে সেই সন্ত্রাসী। রুমী যদি মনে করে থাকে যে একদল চৌকিদারকে হত্যা করা যথার্থ ছিল এই বিবেচনায় যে, তারা ছিল যুদ্ধকালীন শত্রু, তাহলে অন্য পক্ষকে কি নিন্দা করা যায় যদি তারা মনে করে যে তার (রুমী) মতো কাউকে হত্যা করাও সঠিক যে কিনা অস্ত্র হাতে নিয়ে তাদের দেশকে ভেঙে দিতে চেয়েছে?

নিজ ঘরে হিংস্রতা বা অভ্যন্তরীন সংঘাত দক্ষিণ এশিয়ায় মহামারীর ন্যায় এক অভিশাপ যা ১৯৭১ সালে উভয় পক্ষেকেই সংক্রামিত করেছে। নির্যাতন বিশ্বব্যাপী নিন্দনীয় একটি ব্যাপার ও তথ্য আদায় করার এক অনির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হিসেবেও বিবেচিত। যাহোক,

www.pathagar.com

যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন সামরিক আদালতের জেরাকারীদের গৃহিত পদ্ধতি অনেক নিখুঁত বলে মনে হয়েছে যেখানে তারা সাফল্যের সাথে চিহ্নিত করেছে আলতাফ মাহমুদ ও জাহানারা ইমামের বাড়ি থেকে যাদের ধরে আনা হয়েছিল তাদের মধ্যে কারা ছিল গেরিলাদলের সদস্য আর কারা ছিল নির্দোষ। স্বাধীনতার সমর্থক বাঙালিদের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে যা জানা যায় তাতে দেখা যায় পাক সেনারা ওই সব লোকদের আটক রাখেনি যারা প্রকৃতপক্ষেই পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ছিল না। অপরপক্ষে তারা বরং ভুল করেছে উল্টোদিকে- আবুল বারাক আলভী গেরিলাদলের সদস্য হলেও তাকে ছেড়ে দিয়েছিল পাক সেনারা।

অন্তর্ঘাত ও প্রতিশোধ

অন্তর্ঘাত ও হয়রানিমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক কর্তৃপক্ষের পাল্টা জবাব-এ পরস্পর বিরোধী অবস্থান ছিল অনেকটাই হতভম্ব হওয়ার মতো। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের কাছে হাতে গোনা লোকবল নিয়ে এক বিচ্ছিন্ন ও বিশাল এলাকা পাহারা দেয়ার একপর্যায়ে হঠাৎ অপ্রচলিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। এ ক্ষেত্রে এ সবই ছিল তাদের বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রচলিত যুদ্ধের বিষয়ে তাদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে তার সাথেও পরিস্থিতির ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। তারা ওই প্রদেশের ভাষায় কথা বলতেও পারতো না। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের মধ্যে কে তাদের শত্রু আর কে তাদের মিত্র তা তারা চিহ্নিত করতে পারতো না। কারণ ছিল স্বাভাবিক, বাঙালিরা দেখতে সকলেই প্রায় ছিল একই রকম। এখানকার সংস্কৃতি ও রীতিনীতিও ছিল তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তারা সব সময়ই নিজেদের হুমকির মুখে আছে বলে মনে করতো। তারা সিদ্ধান্ত নিতো নানামুখী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। দেখা যেতো প্রায়ই তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কোনো একজন ব্যাক্তির ব্যক্তিত্ব ও মতাদর্শগত অবস্থান বিবেচনা করে যা জন্ম দিতো এক সমষ্টিগত অসংলগ্নতার। সাধারণ নাগরিকদের কাছে জান্তার সাথে যে কোনো সংশ্রবের বিষয়টি তাই এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো বা পদ্ধতির অনুপস্থিতি এ ক্ষেত্রে সঙ্গতকারণেই জন্ম দিয়েছে ভীতির যেখানে যে কারো যে কোনো সময় যা কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না।

সৈয়দপুরের একপাশে

বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য' রচনায় প্রায় সকল স্মৃতিচারণ বাঙালিরাই করেছে। এ ক্ষেত্রে সৈয়দপুরে ধরকা প্রসাদ সিংঘানিয়া নামে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর প্রকাশিত বর্ণনা ছিল ব্যতিক্রম। ওই বর্ণনায় তিনি সে সময়কার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লুটতরাজ, জোর করে শ্রম আদায় করা ও গণহত্যার অভিযোগ এনেছেন।[১৭] এ ক্ষেত্রে আমি সেসময় সৈয়দপুরে মোতায়েনকৃত পাকিস্তানী রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের সাক্ষাতকার নিতে সক্ষম হই এবং সিংঘানিয়ার দেয়া বর্ণনার সাথে তার প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে দেখেছি।

অভিযোগ মতে লুটতরাজের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ। সিংঘানিয়া নানা ধরনের ও নানা পেশার মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন একজন আর্মি ক্যাপ্টেন, একজন 'হাবিলদার মেজর', রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী,

www.pathagar.com

মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সৈয়দপুরের সিভিল প্রশাসক, একজন ডাক্তার এবং বার্মা শেল কোম্পানীর একজন নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বারোজন বেসামরিক ব্যক্তি। তার বর্ণনানুযায়ী এরা সকাল পাঁচটায় তার বাড়ি ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে ও সকলকে মারধর করে ৬০-৭০,০০০ টাকা লুট করে এবং যাবার সময় তারা তার বাবা হরি-লাল সিংঘানিয়াকেও ধরে নিয়ে যায়। এতোগুলো লোক যারা বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন তাদের এ লুটতরাজের মতো কাজে জড়িত হওয়ার ব্যাপারটি উত্থাপিত অভিযোগকে অনেকটা অবিশ্বাস্য হিসেবে চিত্রিত করেছে। তাই প্রকাশের আগে এনিয়ে আরো তদন্ত ও প্রমাণের প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয় অভিযোগ হলো সেনাবাহিনী অনেক বাঙালি ও মাড়োয়ারীকে তাতগাঁও সেতু ও এয়ারফিল্ডে জোর করে কাজ করায় এবং পরে জুন মাসে তাদের কাজে লাগায় সেনানিবাসে। সিংঘানিয়া অভিযোগ করেন যে তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর দু'জন ও বেসামরিক প্রশাসনের দু'জন কর্মকর্তা তাকে জোর করে একটা সাদা কাগজে সই করতে ও ধর্মান্তরণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাপ প্রয়োগ করেছেন।

তৃতীয়টি ও সবচেয়ে স্পর্শকাতর অভিযোগ হচ্ছে ১৯৭১ সালের ১৩ জুন, ৩৩৮ জন মাড়োয়ারী পুরুষ, নারী ও শিশুদের গোলাঘাট রেল কারখানায় একটা ট্রেনে হত্যা করা হয়েছে। সিংঘানিয়া দাবি করেন সেই ট্রেনে তিনি ছিলেন তবে বেঁচে যান। তিনি লিখেছেন মাড়োয়ারী পরিবারগুলোকে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে তাদের ট্রেনে করে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং সে জন্য চিলাহাটির (ভারতের সীমানা) দিকে একটি ট্রেনে সকলকে উঠানো হয়েছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে ট্রেনটিকে গোলাঘাটে থামান হয় এবং ছোরা ও দা দিয়ে অনেক লোক তাদের উপর হামলা করে। তিনি হামলাকারী অনেকের নামও উলেখ করেন যাদের মধ্যে ক'জন ছিল 'বিহারী' পানওয়ালা, পিওন ও দর্জি; যারা ওখানকার স্থানীয় লোক ছিল বলে সিংঘানিয়া তাদের আগে থেকেই চিনতেন। তিনি লিখেছেন তিনি ও আরো কয়েকজন বেঁচে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ভারতে পৌছতে পেরেছিলেন। তার বর্ণনামতে যে সকল আক্রমণকারীদের নাম তিনি বলেছেন তাদের সবাই যখন ছিল স্থানীয় অধিবাসী তখন তিনি এও অভিযোগ করেছেন যে তিনি পালানোর সময় 'পুলিশ ও সেনারা' তার দিকে গুলি ছুঁড়েছিল।

আমি এ অভিযোগগুলো সে সময়টায় সৈয়দপুরে অবস্থানরত ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্ণেল মুহাম্মদ শফির নিকট উপস্থাপন করেছিলাম।[১৮] মৃদুভাষী, কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থির কর্ণেল শফি কোনোরকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই আমার সাথে সাক্ষাত করতে রাজি হয়েছিলেন এবং সিংঘানিয়ার অভিযোগের প্রতিটির সরাসরি জবাব দিয়েছেন। লুটতরাজের অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন এধরনের কোনো ঘটনার কথা তিনি শোনেননি। যা হোক, ২৭ মার্চ তিনি সৈয়দপুরে ছিলেন না কারণ তার আগেই ২৫ মার্চ তাকে রংপুরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় এবং ওই একই রাতে তাকে বগুড়া যেতে হয়েছিল। সিংঘানিয়ার উল্লেখ করা নামের সাথে মিল রয়েছে এমন একজন কর্মকর্তা তার অধীনে ছিলেন বটে, কিন্তু কর্ণেল শফি জানান ওই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে এবং তাতে অতোগুলো সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা জড়িত থাকলে কেউ না কেউ কোনোদিন অবশ্যই তার কাছে রিপোর্ট করে থাকতেন।

জোর করে কাজে নিয়োজিত করার বিষয়ে কর্ণেল শফি 'তাতগাঁও সেতুর' প্রসঙ্গ শনাক্ত করতে পারেননি। কিন্তু এয়ারস্ট্রিপে ব্যাপক কাজ করার বিষয়টি তিনি বলেছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

তার সময়ে সৈয়দপুরে এয়ারস্ট্রিপের ভবন নির্মাণকে একটা বড় অর্জন হিসেবে বিবেচনা করেন। সে সময় সেনাবাহিনীর চলাফেরা সীমিত ছিল সৈয়দপুর ক্যান্টম্যান্টের মধ্যে। বাইরে যাওয়াটা মোটেও নিরাপদ ছিল না। সেখানে অবস্থানরত সেনা ইউনিট নিজেদের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন বলে হতাশা ব্যক্ত করছিল। তাই এপ্রিলের প্রথমদিকে কর্ণেল শফি সিদ্ধান্ত নেন সৈয়দপুরে একটি এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণের। কিন্তু প্রচলিত পথে একটি বিমানবন্দর তৈরি করার জন্য যে অর্থ ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তা না থাকায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তিনি ভিন্ন পথে এগুনোর চিন্তা করেন।

এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত স্থানটি ছিল একটি জঙ্গল। কর্ণেল শফি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে স্থানীয়রা গাছগুলো কেটে নিজেরা কাঠ নিয়ে যেতে পারবে। তিনি আমাকে বলেন এ ঘোষণা শোনার পর লোকজন ছুটে আসে পঙ্গপালের মতো এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে যায়। এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ কাঠ পাওয়া ছিল ওইসব স্থানীয়দের কাছে নগদ অর্থ পাওয়ার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণের ব্যাপারটি ছিল এক ভিন্ন গল্প।

সৈয়দপুরে এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কর্ণেল শফি সেখানকার জনগণকে স্বত:স্ফূর্তভাবে কাজ করার আবেদন করে বলেছিলেন যে বিমানবন্দর তৈরি করা গেলে তা হবে ওই এলাকার জন্য একটি স্থায়ী অবকাঠামো এবং সৈয়দপুর স্থানলাভ করবে মানচিত্রে। তিনি শ্রমিকদের খাবার পানি সরবরাহ করেন, প্রয়োজনে আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিনোদনের জন্য মাইক দিয়ে বিরামহীনভাবে উচ্চস্বরে বাজানো হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের গান। প্রতিদিন তিন শিফটে কাজ করে কয়েক হাজার মানুষ-সকাল ছয়টা থেকে দুপুর বারোটা, বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা ও সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত বারোটা পর্যন্ত। যেহেতু শহরে পর্যাপ্ত সংখ্যক মানুষ ছিল না তাই তিনি গ্রাম এলাকার অধিবাসীদের কাছেও সহায়তা কামনা করেন এবং তাদের নিয়ে আসা ও কাজ শেষে ফিরে যাওয়ার জন্য তাদের গ্রামের নিকটস্থ স্টেশন পর্যন্ত ট্রেনের ব্যবস্থা করেন। তিনি স্থানীয় নেতৃবর্গকে অনুরোধ করেন তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে 'স্বেচ্ছাসেবকদের' নিয়ে আসার জন্য। কর্ণেল শফি জানান তার আহ্বানে হাজার হাজার মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করতে আসে যারা খাওয়ার জন্য ভাত পর্যন্ত নিজেরা নিয়ে আসতো। তিনি ওইসব স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথা বলতেন যখন তারা কাজ করতো। তিনি গর্বের সাথে বলেন যে সাড়ে তিন থেকে চার মাস সময়ের মধ্যে ৩০০ ফুট চওড়া ও ৩০০০ ফুট দীর্ঘ এয়ারস্ট্রিপ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

আমার মনে হয়েছে কর্ণেল সফি এটা অনুধাবন করতে পারেননি যে কাঠ নিয়ে যাওয়ার শর্তে গ্রামবাসীদের স্বতপ্রণোদিত হয়ে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে এগিয়ে আসার সাথে এয়ারস্ট্রিপ তৈরির জন্য হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের নিছক 'জনসেবার' উদ্দেশ্যে কোনোরূপ ভাতা ছাড়া যোগদান এক হতে পারে না। যদিও তাকে বলা হয়েছিল যে ওইসব গ্রামবাসী উৎসাহের সাথেই কাজ করতে এসেছে কিন্তু কর্ণেল সফি যাদের সেখানে প্রতিদিন আসতে দেখেছেন তাদের প্রকৃত অর্থে জোর করেই কাজ করানো হয়েছিল। এক্ষেত্রে স্থানীয় যাদের উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন তারা হয়তো তার কাছে কোনো সুযোগ সুবিধা লাভের প্রত্যাশায় নিজ নিজ এলাকায় মানুষদের সৈয়দপুর আসতে বাধ্য করেছিলো।

আমি এ বিষয়টি কর্ণেল সফি'র নজরে আনলে তিনি স্বীকার করেন যে সম্ভবত কিছু লোক তার ওই আহ্বানকে অপব্যবহার করে থাকতে পারে ও জোর করেও লোক আনতে পারে।

www.pathagar.com

অথচ তিনি যখন বিমানবন্দর পরিদর্শন করতেন তখন কিন্তু কেউ তাকে কোনো অভিযোগ করেনি- পশ্চিম পাকিস্তানী কোন সেনা কর্মকর্তাকে হয়তো তারা ভয়ে অভিযোগ করা থেকে বিরত ছিল। বিশেষভাবে যদি স্থানীয় কর্মকর্তারা যাদের উপর তিনি নির্ভর করেছিলেন তারা যদি সাধারণ গ্রামবাসীকে কোনো ভয় দেখিয়ে থাকে তাহলে তারা তার কাছে অভিযোগ না করারই কথা।এমন কি এটাও হতে পারে যে স্থানীয় নেতারা কর্ণেল সফির আহ্বানকে তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক (কোটা) শ্রমিক হাজির করার নির্দেশ হিসেবে নিয়েছেন। মনে করেছেন ওই সংখ্যক মানুষ না নিয়ে এলে বড় ধরণের ঝামেলায় পড়তে হবে। বাস্তবে বিমানবন্দর নির্মাণে কর্ণেল সফির ওই ধরনের আহ্বান ছিল সামরিক আইন ও বিদ্রোহী তৎপরতার প্রেক্ষপটে সম্পূর্ণভাবে একটি ভুল পদক্ষেপ যা রাজনৈতিক দৃষ্টি থাকলে যে কেউ সহজেই বুঝতে পারতো। সৈয়দপুর বিমানবন্দর নির্মাণ নিঃসন্দেহে একটি দীর্ঘ মেয়াদি সম্পদ। কিন্তু যারা তা নির্মাণ করেছেন কেবল তারাই বলতে পারবেন তাদের মধ্যে ক'জন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছিলেন?

সিংঘানিয়ার উত্থাপিত সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগটি হচ্ছে অসংখ্য পরিবারের হত্যাকাণ্ডের মতো বিষয়টি যাদেরকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে পথে হত্যা করা হয়েছিল। কর্ণেল শফি নিশ্চিত করেছেন, ওই ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, তবে সেনাবাহিনী কোনোভাবেই-এর সাথে জড়িত ছিল না বা সেনবাহিনীর করার কিছুই ছিল না। 'হৃদয়বিদারক' ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর তিনি ওই সংবাদ পান। তার কথা অনুযায়ী, এ ব্যাপারে তাকে জানানো হয়েছিল যে স্থানীয় কিছু লোক কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে ভারত পৌঁছে দেয়ার নাম করে সীমান্তে নেয়ার পর পুরুষদের হত্যা করে ও মহিলাদের চলে যেতে বলে সীমানা অতিক্রম করে ভারতে।

সিংঘানিয়ার দেয়া বর্ণনার কিছু অংশ থেকে উপরের বর্ণনার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সিংঘানিয়া জানান ট্রেনটিকে কোনো একটি রেলওয়ে কারখানায় থামানো হয়েছিল এবং মহিলাদেরও সেখানে হত্যা করা হয়েছিল। তবে সিংঘানিয়া ওই ট্রেন হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় পাকিস্তানী সেনবাহিনীর কোনো সদস্যের নাম উল্লেখ করেননি বরং তিনি স্থানীয় মুসলমানদের নাম বলেছেন যারা ছিল বাঙালি অথবা বিহারী এবং তারা হত্যার কাজে ব্যবহার করেছিল দা ও ছোঁরার মতো অস্ত্রপাতি। তার এ বর্ণনা সেই সংঘাতকালীন জাতিগত হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে মিলে যায়। আর এ ক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ডাকাতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ সেখানকার মাড়োয়ারীদের সকলেই ছিলেন বিত্তবান ব্যবসায়ী যারা ভারতে চলে যাওয়ার পথে সঙ্গতকারণেই নগদ অর্থ ও সোনাদানা বহন করবেন এমনি ধারণা ছিল হত্যাকারীদের।

ঠাকুরগাঁও এর বাঘগুলো

যখন আমি প্রথম ১৯৭১ সালের স্মৃতির উপর 'বাঘের খাঁচায় ছয়বার' শিরোনামের একটি নিবন্ধ পড়ি, তখন চিন্তা করেছিলাম লেখক ছয়বার পাকিস্তানীদের বন্দিশালায় কাটানোর প্রসঙ্গই হয়তো এতে আলোকপাত করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বর্ণনায় সাধারণত পশ্চিম পাকিস্তানীদের পশুর সাথে তুলনা করা হয় ও অধিকাংশ বর্ণনায় ব্যবহার করা হয় অলংকারশোভিত ভাষা যা বলা যায় কাহিনীর উপস্থাপন করে অনেকটা নাটকীয় ধারায়।তবে মুহাম্মদ সফিকুল আলম চৌধুরী প্রকৃত বাঘের কথাই উল্লেখ করেছিলেন।[১৯]

www.pathagar.com

সফিকুল আলমের দাবি অনুযায়ী তিনি সালডাঙ্গা ও পামুলী ইউনিয়নের সংগ্রাম পরিষদের একজন সংগঠক ছিলেন এবং বোদা পুলিশ স্টেশন থেকে রাইফেল নিয়ে যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন, তাকে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান অনুরক্ত রাজাকাররা গ্রেফতার করে। প্রথমে তাকে বোদা পুলিশ স্টেশন ও পরে নিয়ে যাওয়া হয় ঠাকুরগাঁও সেনানিবাসে। আরো একটি বিষয় তিনি বলেন যে, পুলিশ স্টেশনে প্রথমে তাকে একটি চেয়ারে বসতে দেয়া হয়েছিল কিন্তু এক 'বিহারী' পুলিশ কর্মকর্তা তাকে চেয়ার থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন তার চেয়ারে বসার কোনো অধিকার নেই।

সফিকুল আলমের মতে ঠাকুরগাঁও সেনানিবাসে পরবর্তী কয়েকদিন ধরে তাকে জেরা করার সময় বেদম পেটানো হতো ও তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এরপর তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন একটি বাঘের খাঁচায়- চারটি বাঘের সাথে। আলম লিখেছেন বাঘরা তার কিছুই করেনি বরং একটি বাচ্চা বাঘ সব সময় তার পায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে। যাহোক, আলম বলেন, একবার ওই বাঘের খাঁচায় পনেরজন লোককে ঢুকিয়ে দেয়া হয় ও বাঘগুলো প্রায় বারজন বন্দিকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। তার দাবি অনুযায়ী তারপর ওই ক্ষতবিক্ষত লোকগুলোকে খাঁচা থেকে বের করে পাকসেনারা গুলি করে হত্যা করেছিল। এরপর সেই খাঁচায় নিয়মিতভাবে বন্দিদের আনা হয়েছে ও একইভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে; সর্বমোট এভাবে সেই সেনানিবাসে ১৫০ জনকে হত্যা করা হয়েছিল বলে আলম দাবি করেছেন তার বর্ণনায়।

সফিকুল আলমের অভিযোগ অনুযায়ী এ সময় তাকে একবার ঠাকুরগাঁও জেলে পাঠান হয় ও সেখান থেকে আদালতে পাঠান হলে বিচারক তার জামিন মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাকে আবারও ফেরত পাঠানো হয় সেনানিবাসে (ওই বাঘের খাঁচায়)। পরে তাকে ঠাকুরগাঁও পুলিশ স্টেশনে প্রেরণ করা হয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ওই এলাকায় অগ্রসর হলে আলম পুলিশ স্টেশন থেকে পালিয়ে যান।

সফিকুল আলমের দেয়া এ বর্ণনা অনেক দিক থেকেই অসংগত বা অবাস্তব বলে মনে হয়। তার লেখায় ৪ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেফতারের তারিখ ছাড়া আর কোনো দিনক্ষণের ধারাবাহিকতা নেই, যাই বা আছে তা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট বা ধোয়াশে। একথা কেউ বিশ্বাস করবে না যে খাঁচায় বাঘগুলো সবাইকে ক্ষত-বিক্ষত করলো অথচ আলমকে স্পর্শও করল না, শুধুমাত্র তার পায়ের উপর মাথা রেখে ঘুমানো ছাড়া! এবং তাকে ছয়বার ওই বাঘের খাঁচায় রাখার কথাটাও কেমন যেন খাপছাড়া ব্যাপার। এটাও স্পষ্ট নয় কেন সবাইকে গুলি করলেও তাকে কি কারণে গুলি করেনি পাক সেনারা?

সফিকুল আলম 'মেজর রানা' নামে একজন অফিসারের নাম উল্লেখ করেছেন, যে তাকে একাধিক প্রশ্ন করেছিল বলে তার দাবি। আলম একজন 'কর্ণেল'-এর বিষয়েও লিখেছেন যিনি তার খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, তার শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলেন এবং আলম একজন ভালো মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হতে পারেন উল্লেখ করে রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭১ সাল বিষয়ক সরকারি দলিলেও ঠাকুরগাঁয়ে বাঘের খাঁচার বন্দিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ খবরটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের একটি বাংলা সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা খবর। এক্ষেত্রে বন্দির নাম বলা হয়েছে- 'সিরাজউদ্দৌলা' যিনি ঠাকুরগাঁয়ের একজন স্থানীয় বাসিন্দা ও তাকে গ্রেফতারের সময় উল্লেখ করা হয়েছে

www.pathagar.com

জুলাই মাসে। মজার ব্যাপা এ বর্ণনাতেও চেয়ারে বসতে না দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর বাঘের পাশাপাশি বানরের প্রসঙ্গ এসেছে যে কিনা বন্দিদের থাপ্পর মেরে বেড়াতো। এ বর্ণনাতেও অভিযোগ করা হয়েছে যে ওই বন্দিকে কয়েকবার বাঘের খাচায় রাখা হয় তবে বাঘ তাকে একবার মাত্র আঁচড়ে দিয়েছিল। আর যে অফিসারটি বন্দিকে জেরা করেন বর্ণনাতে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে রানা (মেজর রানা) হিসেবে। বন্দি কর্ণেলের সাথে একটি সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন 'অনেক সদুপদেশ দিয়ে কর্ণেল আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন'।[২০]

আমার গবেষণায় আমি জানতে পারি ঠাকুরগাঁও-এর সেনা ইউনিটে 'মেজর রানা' নামে কেউই ছিলেন না, কিন্তু সেখানে দায়িত্বরত ৩৪ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এ মেজর হাফিজ রাজা নামে একজন কর্মকর্তা ছিলেন কিন্তু তিনি ততোদিনে মারা গেছেন। ঠাকুরগাঁও-এ ৩৪ পাঞ্জাব এর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে. ক. আমির মুহাম্মদ খান। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি কি ঠাকুরগাঁও সেনানিবাসে বাঙালি বন্দিদের বাঘের খাবার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন কিনা?[২১]

ব্রিগেডিয়ার (লে. ক.) আমির মুহাম্মদ খানকে মনে হয়েছে কৌতুকবোধসম্পন্ন একজন প্রাণবন্ত মানুষ। তিনি আমার ছুঁড়ে দেয়া প্রশ্ন ভালোভাবেই গ্রহণ করে উত্তর দিয়েছেন ও সে সময় ঠাকুরগাঁও-এ তিনি কি করেছিলেন তার খুটিনাটি বর্ণনাও প্রদান করেছেন। তিনি জানান, ১৯৭১ সালে জুলাই মাসে তিনি ঠাকুরগাঁও পৌঁছান এবং ওই ইউনিটের পোষা প্রাণী হিসেবে দুটি বাঘ ও দুটি বাঘের বাচ্চা পান উত্তরাধিকার সূত্রে। অনেকে তাকে বলেছিল যে ওই বাঘগুলোকে আগে সার্কাসে ব্যবহার করা হতো। আমার প্রশ্নে তিনি মোটেই আশ্চর্যান্বিত হননি কারণ যুদ্ধের পর ভারতীয় খবরের কাগজে বাঘের খাঁচায় বাঙালি বন্দিদের ছুঁড়ে দেয়ার জন্য তাকে অভিযুক্ত করার কথা তিনি পড়েছিলেন। এ অভিযোগটি তিনি অস্বীকার করেছেন। আমিরের মতে, যা প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল তা হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে একবার একজন বাঙালি বন্দির কাছ থেকে কথা বের করার জন্য চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন পড়েছিল। কিন্তু সে কোনো কথাই বলতে রাজি হচ্ছিল না; এবং এক পর্যায়ে ওই বাঙালি নিজে বাঘের খাঁচার কাছে গিয়ে নিজেকে সেখানে ছুঁড়ে দেয়ার হুমকি দিতে থাকে। এরপরও লোকটি কোন কথা না বললে তাকে চলে যেতে বলা হয়। আমিরের মতে, এটাই বাঘের খাঁচার একমাত্র ঘটনা। তিনি স্পষ্টত: বলেন কোনোভাবেই কাউকে ওখানে বাঘের খাঁচায় নিক্ষেপ করা হয়নি। তিনি আরো জানান যে, তিনি সেনানিবাসে থাকাকালীন কাউকে গুলি করে হত্যা করা হয়নি।

যা হোক, তিনি যখন বাঘ সম্পর্কে হুমকি দেন তখন সেখানে পাক সেনাদের সহযোগী শক্তি আলবদর সদস্যসহ অনেক বাঙালিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরো ক'বার বাঘের খাঁচায় নিক্ষেপ করা নিয়ে ঠাট্টাও করেছিলেন যা হয়তো গুজবাকারে চারদিকে বেশ প্রচার পায়। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তার অজান্তে অন্য অফিসাররা কি বাঘের খাঁচায় কোনো বন্দিকে ঢুকিয়েছিলেন কিনা, কিন্তু তিনি মনে করেন সেটা সম্ভব ছিল না কারণ তার অফিস ছিল খাঁচার খুব কাছেই এবং ওই রকম ঘটনা ঘটলে একজন কমান্ডিং অফিসার হিসেবে তিনি অবশ্যই তা জানতে পারতেন।

অবশ্য আমির সেখানে আরো অনেক কিছু করেছিলেন যা তার ব্যাপারে কতোগুলো বিশেষ ধারণার জন্ম দিয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেন ওই এলাকার লোকজন ইসলাম চর্চায় ছিল খানিকটা শিথিল। আর সে জন্য তিনি তাদের সকলকে সেখানকার একটি স্কুলে

www.pathagar.com

একত্রিত করে নামাজ আদায় করাতেন। তিনি সে এলাকায় চল্লিশটি মন্দির দেখেছিলেন যা হিন্দুরা ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু কোনো মসজিদ সেখানে ছিল না। তাই তিনি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সেখানকার উর্ধ্বতন ক'জন বাঙালি প্রশাসকের বাড়িতে তাকে নিমন্ত্রণ করা হলে তিনি ওই সব বাড়ির মহিলাদের দোপাট্টার ব্যবহার না দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। এরপর তিনি তাদের বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন ইসলামী পোশাক পরিধানের জন্য।এক বাঙালির বাড়িতে রাতের খাবারের পর তাকে জানানো হয় যে নিমন্ত্রণকারীর কন্যা এখন নাচ ও গান পরিবেশন করবে। তার জন্য এটা ছিল অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ও তিনি নাচ গান উপভোগ করা থেকে বিরত ছিলেন।

লে. ক. আমিরকে অন্যান্য কর্মকর্তারা বোঝাতে চেষ্টা করেন যে বাঙালিদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের থেকে আলাদা। তিনি আমাকে বলেন, নিয়ম-কানুন বজায় রাখার স্বার্থে তিনি যতোটুকু নন তার চেয়েও বেশি কঠোর হিসেবে নিজেকে জনসম্মুখে উপস্থাপন করতেন। আমি তাকে 'ঠাকুরগাঁও -এর আরঙ্গজেব' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলি, তিনি যদি কোন বাঙালিকে নাচ গান করা থেকে নিষেধ করে থাকেন তাহলে ওই সব বাঙালি তার সম্পর্কে কি বাজে ধারণা পোষণ করেছেন তার দায় বাঙালিদের নয় বরং তার নিজের ঘাড়েই বর্তায়। আমির যিনি এসএসজি'তে ছিলেন তিনি আমার এ মন্তব্য গ্রহণ করেন বেশ সহজে ও কৌতুকমিশ্রিত আচরণের সাথে।

ব্রিগেডিয়ার (লে. ক.) আমির আমাকে তার অন্য একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেন যা ছিল আরো বেশি বেদনাময়। তিনি যখন ঠাকুরগাঁও-এ প্রথম পা দেন তখন সেখানে একটি বাড়ি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন যা আগে ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল আমর্ড ফোর্সের (ইপকাফ-ইপিসিএএফ) স্থানীয় প্রধানের বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ইপকাফ-এর কমান্ডিং অফিসার ও তার সেকেণ্ড ইন কমান্ড উভয়েই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। তিনি যখন ওই বাড়িতে প্রবেশ করেন তখন বিপরীত দিকের দেয়ালে দেখতে পান রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। এর কারণ জানতে চাইলে তাকে জানানো হয় মার্চ মাসে ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল আমর্ড ফোর্স-এর বাঙালি সদস্যরা ও স্থানীয় বাঙালিরা বাড়িটি আক্রমণ করে মেজর মোহাম্মদ হোসেন, তার স্ত্রী ও পুত্রকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। তার কনিষ্ঠ কন্যাকে ছুরি মেরে ক্ষতবিক্ষত করে রাস্তায় নিক্ষেপ করা হয় ও তারপর থেকে সে নিখোঁজ রয়েছে। তাদের অপর কন্যাটি বাড়ির কাজের মেয়ের সাথে বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যায়। সেকেণ্ড ইন কমান্ড, তার স্ত্রী ও একজন বাঙালি কর্মকর্তা তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদেরও হত্যা করে বাঙালিরা। লে. ক. আমিরকে স্থানীয় আইন পরিষদের সদস্য জানিয়েছিলেন যে বিহারী পরিবারের ৩-৪০০০ সদস্য পিতৃহীন হয়েছে বাঙালিদের জাতিগত বিদ্বেষপ্রসূত হত্যাযজ্ঞের পরিণতিতে। তিনি সেখানে ওই সব আপনজন হারানো অসহায় লোকদের জন্য একটি ক্যাম্প স্থাপন করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। আমির আমাকে বলেন তিনি নিহত ওই ইপকাফ কর্মকর্তার হারিয়ে যাওয়া কন্যাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, একপর্যায়ে জানতে পারেন একজন পথচারী শিশুটিকে আশংকাজনক অবস্থায় রাস্তা থেকে উদ্ধার করেছে। মেয়েটির অবস্থা আশংকাজনক থাকলেও ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর ওই ছোট মেয়েটি যখন লে. কর্ণেল (ব্রিগেডিয়ার) আমিরকে দেখে তখন তাকে 'আব্বু' বলে ডেকে ওঠে- আমিরকে জানানো হয় ওই শিশু কন্যাটির মৃত পিতার সাথে নাকি তার চেহারার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

www.pathagar.com

এক অজানা অপরাধের জন্য সমষ্টিগত শাস্তি

বড়ইতলা ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের নিকটবর্তী একটি ছোট এলাকা। ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর পাক আর্মির গুলিতে নিহতদের স্মরণে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। এর পাশে মাঠে দাঁড়িয়ে আমি কথা বলছিলাম একজন গ্রামবাসী মুহাম্মদ আলি আকবর-এর সাথে যিনি সৌভাগ্যক্রমে ওই দিন গুলি থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। ওখানকার মাঠের মাঝ বরাবর চলে গেছে রেলের লাইন। দামপাড়াসহ খোলা মাঠের চারদিকে রয়েছে বেশ কয়েকটি গ্রাম। মুহাম্মদ আলী আকবর সেই দামপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।[২২]

মুহাম্মদ আলী আকবর লম্বা, পাতলা ও ঈগলের বাঁকা ঠোঁটের ন্যায় বৈশিষ্টের অধিকারী একজন মানুষ। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ বছর। পরনে গেরুয়া পোশাক, মাথায় পাগড়ী, স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত নাটকীয় ভঙ্গিমার একজন মানুষ বলেই তাকে মনে হয়েছে। পরে আরো জেনেছি তিনি কবিতা লেখেন ও ম্যাজিকও দেখাতে পারেন। স্পষ্টবাদী অন্য একজন স্থানীয় ব্যক্তি যিনি সেসময় গ্রাম থেকে দূরে মুক্তিযুদ্ধে রত ছিলেন সেই জয়নাল আবেদিনের মতে, ওইদিন বড়ইতলায় আশেপাশের গ্রাম-দামপাড়া, গোবিন্দপুর, কালিবাড়ী, তিলকনাথপুর, চিকানেরচর থেকে গ্রামবাসীরা এসে জড়ো হয়েছিল। গ্রামবাসীদের দেয়া তথ্য অনুসারে ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর পাক সেনারা বড়ইতলায় ট্রেনে করে পৌঁছে ও আমরা মাঠে যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে এসে তারা থেমে যায়। আশপাশের এলাকার পুরুষ মানুষদের রেল লাইনের পাশে যাওয়ার জন্য স্থানীয় রাজাকারদের সাথে নিয়ে পাকা সেনারা হুকুম দেয়। মুহাম্মদ আলী আকবর জানিয়েছেন রাজাকাররা তাদের বলেছিল যে সেনা কমাণ্ডার গ্রামবাসীর সাথে 'কথা বলবে, তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য'। অপরদিকে গ্রামবাসীরা অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো তাদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার জন্য এভাবে রেল লাইনের ধারে লাইন করে দাঁড়াতে বলা হয়েছে, গ্রামবাসীর অনেকেরই তখন পরিচয়পত্র ছিল।

আমি জানতে চেয়েছি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কি এর আগেও তাদের গ্রামে ওই ধরণের 'উদ্বুদ্ধ করার' কথা বলতে এসেছিল কিনা; আলী আকবর জানিয়েছেন, 'না'। আকবর বলছিলেন সেখানে লোকগুলো একত্রিত হলে পাশের গ্রাম থেকে মৌলানা হাফেজ নামে একজন এসে দায়িত্বরত সেনা কর্মকর্তার সাথে উর্দুতে কথা বলেন। এরপর গ্রামবাসীরা মৌলানার সাথে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে চলে যায়।

গ্রামবাসীর মতে, হঠাৎ কিছু একটা ব্যাপার পাক সেনাদের ক্ষেপিয়ে তোলে বলে মনে হয়েছিল। তবে কি কারণে তারা ক্ষেপে যায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়নি। তবে মনে হয়েছিল যে হাশেম নামে স্থানীয় একজন রাজাকার সেখানে এসে সেনা সদস্যদের কিছু একটা বলেছিল। কেউ কেউ বলেছেন রাজাকারটি সেনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা তার ভাইকে হত্যার কথা বলেছিল বা এ রকম কিছু একটা এবং সে তাদের সহায়তা চায়। আবার অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে হয়তো সেখানে আগত সেনা ইউনিটটি মনে করেছিল কোনো গেরিলা বা মুক্তিযোদ্ধা তাদের একজন সেনাকে হত্যা করেছে। তবে সম্ভবতঃ বাঙালি রাজাকারের ভাষা পাক সেনারা ভালোভাবে বুঝতে না পারায় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে রাজাকার হাশেম এক বা একাধিক পাক সেনা সাথে নিয়ে ফিরে যায় গ্রামে। বাকী সেনারা প্রস্তুতি নেয় সেখানে জড়ো হওয়া সকল লোকদের গুলি করার জন্য।

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ডের ধরণটা ছিল সুস্পষ্ট। আকবর জানিয়েছেন সৈন্যরা সেখানে জড়ো হওয়া লোকদের দু'টি লাইনে দাঁড় করায়, একজনের পিছনে আর একজন, প্রত্যেক ব্যক্তি দাঁড়ায় তার ডান হাত সামনে দণ্ডায়মান ব্যক্তির কাঁধে রেখে। প্রত্যেক লাইনের সামনে একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করা হয় যাতে সম্পূর্ণ লাইনটিকে একটি অবস্থান থেকে গুলি করা যায়। ইকবাল নামে যে মুক্তিযোদ্ধা ঢাকা থেকে আমার সাথে বড়ইতলা গিয়েছিলেন তিনি ওখানে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রটির বর্ণনা শুনে সেটাকে স্ট্যান্ডের উপর বসানো একটি লাইট মেশিনগান বলে শনাক্ত করেন।

আকবর জানান তিনি এক পর্যায়ে গুলির শব্দ শোনার সাথে সাথে তার দিকের জমিতে পড়ে যান- কীভাবে পড়েছিলেন তা দেখাতে তিনি বেশ নাটকীয়ভাবে আমার পাশ থেকে জমিতে শুয়ে পড়েন একদম নিস্তেজ হয়ে। তার লাইনের অন্যান্য সবাই গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে যায় ও ক'জন তার উপর এসে পড়ে। গুলিবর্ষণের পর সৈন্যরা ট্রেনে উঠে সেখান থেকে চলে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর আকবর উঠতে চেষ্টা করেন। তিনি অক্ষত অবস্থায়ই ছিলেন। তার চারদিকে পড়ে ছিল মানুষ, যাদের অধিকাংশই ছিল মৃত। তার দেয়া তথ্যানুযায়ী সেখানে দশ থেকে বারজন বেঁচে গিয়েছিলেন। তার চাচা, দু'জন চাচাতো ভাই ও এক ভাতিজা নিহত হন। সেখানে আমার পাশে দাঁড়ানো অনেক লোকের মাঝে আর একজন মুক্তিযোদ্ধা জানান বড়ইতলা হত্যাকাণ্ডে তিনি তার পরিবারের তিনজন সদস্যকে হারিয়েছেন। তবে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সর্বমোট কতজন নিহত হয়েছিল তা স্পষ্ট নয়।[৩৬] বড়ইতলায় পাক সেনারা কেন এসেছিল এবং কেনইবা লোকজন একত্র করে ওভাবে হত্যা করেছিল তা কেউই বলতে পারেননি। কেউ কেউ বলেছেন হত্যাকাণ্ডের আগের দিন সেখানে একটি ব্রীজ ধ্বংসের জন্য গেরিলাদের খোঁজে পাক সেনারা এসে থাকতে পারে। বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে পাক বাহিনী কি প্রকৃতপক্ষেই একটি ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা নিয়ে বড়ইতলা এসেছিল কিনা বা সেখনে আসার পর এমন কি পরিস্থিতি বা তথ্য তাদের ওইভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে, এ ব্যাপারে কেউই সঠিক কিছু বলতে পারেননি। ওই এলাকায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাড়ি। তার পুত্র যিনি একজন জাতীয় সংসদ সদস্য তিনিই বড়ইতলার স্মৃতি সৌধটি নির্মাণ করেছেন।

মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন যিনি যুদ্ধের সময় ওখানে ছিলেন না তিনি স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভে ১৩ অক্টোবরের নিহতদের স্মরণে অনুষ্ঠান করার পর (২০০৪) অজানা ব্যক্তির কাছ থেকে তাকে হত্যা ও স্মৃতিস্তম্ভটি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি পেয়েছেন। এধরনের হুমকি তার জন্য ছিল সেটাই প্রথম। তবে আবেদীনকে কোনোরূপ চিন্তান্বিতই মনে হয়নি যখন তিনি আমার সাথে কথা বলছিলেন, বরং তিনি জোরের সাথে বলেন তিনি ওসবের পরোয়া করেন না ও ভবিষ্যতেও স্মৃতিস্তম্ভে নিহতদের স্মরণে অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবেন।

১৯৭১ সালের সেই সময়টায় কিশোরগঞ্জে পাক বাহিনীর কোনো কোনো সেনা কর্মকর্তা কতর্ব্যরত ছিলেন তাদের আমি সন্ধ্যান পেতে ব্যর্থ হয়েছি। যাহোক, আমি অন্য পাক সেনা কর্মকর্তাদের সাথে বড়ইতলা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কথা বলেছি কিন্তু তারা ওই হত্যাকাণ্ডটিকে উদ্ভট একটি ঘটনা হিসেবে উলেখ করেছেন। ওই ঘটনার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও অনেকে বলেছেন যে ওভাবে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে কারো প্রতি গুলিছোঁড়া হত্যাকাণ্ড ঘটানোর জন্য কোনো উপযুক্ত পদ্ধতি নয়। তাই হত্যাকাণ্ড ঘটানোটাই যে উদ্দেশ্য ছিল তা সুনিশ্চিত করে বলা যাবে না। তাই এতে পাওয়া যায় প্রতিশোধের

www.pathagar.com

বিকৃত ধারণা, আর একে একটা অজানা অপরাধের জন্য যৌথ শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।[২৪]

স্বাধীনতা যুদ্ধের যোদ্ধাদের বিচার ও দু:খ-দুর্দশা

এসএম রকিব আলী ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিলে তার কর্মক্ষেত্র থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়েছিলেন। তিনি আর ফিরে আসেননি। তিনি বলেন, দেয়ালের লেখা দেখে তিনি আর ঝুকি নিতে রাজী হননি। আমি যখন তার সাথে সাক্ষাত করি তিনি তখন প্লাটিনাম জুট মিলের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[২৫] এসএম রকিব আলী চলে যান ভারতে। তিনি পশ্চিম বাংলার উত্তরে জলপাইগুড়ি ও বাগডোগরা যান ও তারপর আকাশ পথে সাহারানপুর প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে অবশেষে যোগ দেন দেরাদুনে ভারতীয় মিলিটারী একাডেমীর পাশে নতুন স্থাপিত প্রশিক্ষণ শিবিরে।

প্রশিক্ষণ শেষ করার পর রকিব আলী পূর্ব পাকিস্তানে তিনটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে যশোর-এর কাছে তার চতুর্থ অভিযানকালে তিনি ধরা পরেন। ওই অভিযানে তিনিসহ উনিশজন মুক্তিযোদ্ধা যশোর সেনানিবাস থেকে কিছু দূরে পাক সেনা ও রেঞ্জারদের ঘাটি আক্রমণ করার জন্য গিয়েছিলেন। তাদের দলের একজন নিহত হয় কিন্তু বাকীরা ধরা পড়ে যায়। তাকেসহ তার দলের অন্যদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় যশোর সেনানিবাসে।

রকিব আলী জানান ইষ্টার্ণ কমান্ডের কমান্ডার লে. জেনারেল নিয়াজী গ্রেফতারকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা না করে বিচার করার জন্য তার অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। রকিব চিন্তা করেছিলেন ওইভাবে গ্রেফতারকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে নেতিবাচকভাবে প্রচারিত হতো, তাই হত্যা না করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসার জন্য নিয়াজী ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৬]

জেনারেল নিয়াজীর এরূপ নির্দেশের কারণ যাই হোক না কেন, ধৃত মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা না করে বিচারের মুখোমুখি করায় তার জীবন বেঁচে গেছে বলে রকিব আলী মনে করেন ও এজন্য জেনারেল নিয়াজীর প্রতি তিনি ঋণী। সে সময় তার দলের আঠার জন বন্দিকে যশোর সেনানিবাসে বন্দি করে রাখা হয়েছিল যেখানে তাদের বিচারের কাজ চলে সামরিক আদালতে। জেরা করার সময় তার উপর নির্যাতন চালান হয়েছে বলে তার অভিযোগ। ক'জন সুইস সাংবাদিক ওই সময় সেখানে এসেছিলেন কিন্তু সেনা সদস্যদের উপস্থিতিতে তাদের কোনো সাক্ষাতকার নেয়ার সুযোগ ছিল না। যুদ্ধ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে তাকে সহ সকল বন্দিদের যশোর কেন্দ্রিয় কারগারে পাঠিয়ে দেয় সেনা কর্তৃপক্ষ। এদিকে বিচার কার্য সম্পন্ন হতে অনেক সময় লাগে ও নভেম্বর মাসের শেষদিকে বিচারের রায়ে তাদের মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দেয়া হয়। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগেই শুরু হয়ে যায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ। যশোরে যুদ্ধ শেষ হলে ডিসেম্বর মাসের ৬/৭ তারিখে ভারতীয় সেনাবাহিনী রকিব ও তার সহকর্মীদের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয়। অন্তত:পক্ষে রকিব আলী হচ্ছেন ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সে সব মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন যিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রকৃতার্থেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু ক্রিসেন্ট জুট মিলের কর্মচারী (স্পিনার) আব্দুর রব সর্দার ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ঠিকই, তবে ফিরে এসে কখনো সরাসরি যুদ্ধ করার সুযোগ পাননি। তিনি ও তার কয়েকজন সঙ্গী একদিন শুনলেন যে ঢাকায় পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। এরপর তাদের প্রশিক্ষণ শিবির বন্ধ হয়ে

www.pathagar.com

গেলে তারা খুলনা ফিরে দেখলেন সেখানে তখন পর্যন্ত যুদ্ধ চলছে। তিনি আমাকে বলেন কয়েকশ' পাকিস্তানী সেনা তখনও পর্যন্ত শক্ত অবস্থানে থেকে ভারতীয় বাহিনীর মোকাবিলা করে যাচ্ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী পাক বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করতে পারেনি। ওইদিনটি ছিল ঢাকায় পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরদিন।[২৭]

পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীনতা লাভ করলেও অনেক মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতার পর তিক্ততার স্বাদ অনুভব করেন। নরসিংদী প্রেসক্লাবে মুক্তিযোদ্ধা কবির মিয়া নামে একজন মিল শ্রমিকের সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল।[২৮] ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে গোলযোগ শুরু হলে তার মিল বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন তিনি বেকার হয়ে পড়েন। এরপর 'যখন মনে হতে থাকল যে পাঞ্জাবীরা মেরে ফেলবে' তখন কবির মিয়া যোগ দেন মুক্তিবাহিনীতে। তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে আমাকে বলেন, তার মতো যারা যুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার পর তারা কিছুই পায়নি বরং যারা বিরোধীতা করেছে তারাই ভালো অবস্থানে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাঙালিদের বর্ণনায় বা লেখায় যতোই মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের বর্ণনা করা হয়েছে তার অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতীয়দের বর্ণনা সে সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিংহ তার লেখায় উল্লেখ করেছেন, 'এটা এখন বলা যায় যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া বাঙালি সৈনিকদের উপর আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ, মুজিবের ক্যারিশমা ও সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের সাথে কর্ণেল ওসমানীর পেশাগত যোগাযোগ থাকলেও বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধ সংগঠনকারীরা কোনো সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থ হন... বলতে গেলে বিদ্রোহীদের কোনো জনপ্রিয় ভিত্তিই ছিল না'। প্রথম দিকে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) গেরিলাদের অভিযানে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করত, কিন্তু 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওভাবে সহযোগিতা প্রদান তেমন কার্যকরী হয়ে ওঠেনি।' 'বিদ্রোহের ব্যর্থতা ও ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে গেরিলাদের পরিচালিত অভিযানে নিম্নমানের ফলাফলের জন্য ভারত সরকার এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পরিস্থিতির সার্বিক মূল্যায়নের উদ্যোগ নেন।' মেজর জেনারেল মুখওয়ান্ত সিংহের মতে, 'এপ্রেক্ষিতে ৩০ এপ্রিল গেরিলা যুদ্ধের যাবতীয় দায়দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়'।[২৯]

মেজর জেনারেল লচমন সিং-এর হিসেব নিকেশও ছিল একইরকম। তিনি বলেন, 'মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা নিবেদিত প্রাণ গেরিলা ছিল না... আওয়ামী নেতারাও এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ সামরিক সংঘাতে যোগ দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। গেরিলাদের পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে অভিযান পরিচালনার জন্য কোনো নিরাপদ স্থান বা বেস ছিল না। তবে তারা ভারতের সীমানাব্যাপী অবস্থানে থেকে নিরাপদে অভিযান চালাতে পারতো'। সিং-এর দৃষ্টিতে, 'জুলাই মাসে পরিস্কার হয়ে যায় যে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছিল'। ব্যাপক হতাহত হওয়ার অজুহাতে তারা পাক বাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে থাকে। যাহোক, 'প্রচারযন্ত্রকে বেশ কার্যকরভাবেই কাজে লাগানো হয়। লুঙ্গি পরে ও রাইফেল হাতে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা তাৎক্ষণিক বীর বনে যায়... খবরের প্রত্যাশায় ব্যাকুল প্রচার মাধ্যম কল্পিত আর অলীক সাফল্যের দাবিকে গিলতে শুরু করে যা ব্যাপকভাবে বিশ্বাসযোগ্যতাও অর্জন করে'।[৩০]

অক্টোবর-এর মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর-এর মাঝামাঝি সময়েও নানামুখী সমস্যা বিরাজ করে যখন:

www.pathagar.com

ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে গেরিলাদের পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পরিচালিত অভিযানে সহায়তার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় প্রয়োজনে ট্যাংক ও বিমানবাহিনীও মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় এগিয়ে আসে। মুক্তিবাহিনী তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করলে ভারতীয় বাহিনী তাদের বিভিন্ন ইউনিটকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় নিজ ভূখণ্ডে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে বেশ বিরক্তি ও ক্ষোভের জন্ম হয়। কারণ পাকবাহিনীর পাল্টা হামলার মুখে মুক্তিবাহিনী কদাচিৎ তাদের দখলকৃত ভূমি বা অবস্থানকে ধরে রাখতে সমর্থ হতো।[৩১]

এ ব্যাপারে লে. জেনারেল জে. এফ. আর জ্যাকবের অভিমত হচ্ছে: 'মুক্তিবাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বড় ধরণের অভিযানের জন্য ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যের অপেক্ষা করতো ও চাইতো যে ভারতীয়রাই যেন তাদের কাজ করে দেয়। এ ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা অভিযানে খুব কমই নিজেদের জড়িত করত।' জেনারেল জ্যাকব মনে করেন যে সীমিত মাত্রার প্রশিক্ষণ দিয়ে এতো বিশাল সংখ্যার মুক্তিবাহিনী গঠন করাটা ছিল ভুল কারন তাদের কার্যকারিতা ছিল খবুই সীমিত পর্যায়ের ও কোনো অভিযানে তাদের সাফল্যও ছিল কম।[৩২] মেজর জেনারেল লচমন সিংহও এ মতের সাথে একমত পোষণ করে বলেন, 'মুক্তিবাহিনীর কার্যকারিতা ও কৃতিত্ব নিয়ে মতভেদ ছিল। আমি মনে করি যে অর্ধ প্রশিক্ষিত, দুর্বলভাবে উদ্বুদ্ধ ও নেতৃত্বহীন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে এতো বড় আকারের বাহিনী তৈরি ছিল মারাত্মক ভুল যারা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়'।[৩৩] অথচ নিয়তির পরিহাস যে মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রু পাকিস্তানীরা কিন্তু ভারতীয়দের চেয়ে তাদের সম্পর্কে অনেক বেশি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেছেন। পাকিস্তানীদের অনেকেই আমাকে বলেছেন: যদিও অনেক মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখ সমর থেকে পালিয়ে যেতো কিন্তু তাদের অনেকেই ছিল রাজনৈতিকভাবে দৃঢ় উদ্বুদ্ধ এবং তাদের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি নিবেদিত। বাঙালি বংশোদ্ভুত বৃটিশ সাংবাদিক সাম্থী ব্রত যিনি গেরিলাদের ত্রিপুরার ক্যাম্প পরিদর্শন করেন তার মতে 'বড় অভিযানগুলো সব সময় সম্পন্ন হতো ভারতীয় বাহিনী দ্বারা ....আমাদের মধ্যে কারো কারো কাছে অস্ত্র ছিল ও হাতে তৈরি গ্রেনেডও ছিল। কিন্তু যখন কোনো ব্রীজ উড়িয়ে দেয়া বা ট্রেনকে লাইনচ্যুত করতে হতো তখন সেগুলো করতো ভারতীয়রাই যেখানে তারা আমাদের নিতো তাদের গাইড হিসেবে। এরপর একে বলা হতো 'মুক্তিবাহিনীর বিজয়'। এ ধরনের ঘটনাবলী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য নিবেদিত বাঙালি স্বেচ্ছাসেবকদের মনোবল ভেঙ্গে দিতো'। এ সাংবাদিক সাম্থী ব্রত মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় উভয়ের চোখ ফাকি দিয়ে মুসলমান গ্রামবাসী সেজে কুমিল্লায় এসেছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসেই পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক সংশিষ্টতার প্রমাণ পেয়েছিলেন। তিনি দেখতে পান যে '২০০ স্বেচ্ছাসেবক গেরিলার মাঝে মাত্র ছয় জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ও তাদের মধ্যে মাত্র তিনজন ওই সময় পর্যন্ত অভিযানে অংশ নিয়েছে।'[৩৪]

www.pathagar.com

অধ্যায় ৮

ভ্রাতৃ হত্যা

যুদ্ধ শেষের মৃত্যু দূত

ভালো চিকিৎসকের ঘটনা

যাদের আমার দাদীমা 'ঠাকুর-এর আপনজন' বলে বিবেচনা করতেন শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী হচ্ছেন তেমনি একজন মানুষ- তার সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথেই মনে হবে তিনি কতোটা মহৎ হৃদয় ও মমতাময়ী। তার সাথে সাক্ষাত হওয়ার আগে ওই পরিস্থিতি অনুধাবণ করা দুরূহ হবে যে, কীভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে তার স্বামী ডা. আলিম চৌধুরী নিখোঁজ হয়েছিলেন।[১]

১৯৭১ সালে ডা. ও মিসেস আলিম চৌধুরী ঢাকায় পুরানা পল্টনে একটি তিনতলা বাড়িতে বাস করতেন। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. আলিম চৌধুরীর তিনতলা বাসার নিচতলায় ছিল তার নিজের ক্লিনিক ও উপরের দু'টি তলায় তারা বসবাস করতেন। ডা. চৌধুরী ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক। ১৯৭১ সালে ২৫-২৬ মার্চ রাতে ঢাকায় সামরিক অভিযান শুরু হলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম যিনি পরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন তিনি ডা. আলিম চৌধুরীর বাসায় আশ্রয় নেন। ঠিক এর আগে তিনি ছিলেন ডা. আলিম চৌধুরীর বোনের বাসায়। তাঁকে ডা.আলীমের বাড়ির দোতালার একটি কক্ষে ২৯ মার্চ পর্যন্ত লুকিয়ে রাখা হয়। এরপর শাড়ী ও বোরকার আবরণে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত প্রধানকে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য একটি গোপন জায়গায় যেখান থেকে তিনি ভারতে পালিয়ে যান।

এভাবে চৌধুরী পরিবার আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতাকে আতিথেয়তা প্রদান করেছিলেন। আশ্চার্যের বিষয় হলো ওই ডাক্তার পরিবারটি একইভাবে কট্টর পাকিস্তানী সমর্থক একজন আল-বদর সদস্যকেও আশ্রয় দিয়েছিলেন যে আল বদর তৈরি করেছিল পাক জান্তা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনা-বাহিনীকে স্থানীয়ভাবে সহায়তা দান করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

১৯৭১ সালের জুলাই মাসের কোনো একদিন ডা. আলিমের প্রতিবেশী জনাব মতিন একজন আগন্তুককে সাথে নিয়ে ডা. আলিম চৌধুরীর বাসায় আসেন। তিনি জানান ওই ভদ্রলোকের ঘর-বাড়ি কিছু লোক আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে আর তাই তার পরিবার বর্তমানে গৃহহীন

www.pathagar.com

হয়ে পড়েছে এবং তিনি ডা. আলিমকে লোকটিকে তার বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। মিসেস চৌধুরী জানান তিনি বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু যেভাবেই হোক তারা ডা. আলিম চৌধুরীকে রাজী করাতে সক্ষম হন। লোকটি তার স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে নীচ তলায় আশ্রয় নেন। ফলে ডা. আলিম চৌধুরী তার ক্লিনিক স্থানান্তর করেন দোতালার ড্রয়িং রুমে। ডা. চৌধুরীর নতুন মেহমানটি ছিলেন মাওলানা আব্দুল মান্নান। স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশীদের ভাষ্য অনুযায়ী মাওলানা আব্দুল মান্নান ছিলেন স্থানীয়ভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহায়ক শক্তি আল বদর সংগঠনের শীর্ষ স্থানীয় একজন সদস্য। আল-বদর গঠনের ব্যাপারে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল নিয়াজী লিখেছেন:

যদিও এ সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ আগেই শুরু হয়েছিল, তবে তাদের (রাজাকার) গঠন করার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়া হয় ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে...গঠন করা হয় 'আল-বদর' ও 'আল-শামস' নামে সংগঠনের দু'টি আলাদা শাখা। স্কুল ও মাদ্রাসার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় আল-বদর শাখায় যেখানে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় 'বিশেষ ধরনের অভিযান' পরিচালনার জন্য। অপরদিকে বাকীদের নেয়া হয় আল-শামস্-এ যাদের দায়িত্ব ছিল ব্রীজ, গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ও অন্যান্য এলাকার নিরাপত্তা বিধান করা।[২]

জেনারেল নিয়াজী লিখেছেন, রাজাকাররা ছিল আনুগত্যশীল সক্রিয় কর্মী কিন্তু তাদের তেমন বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি ও গেরিলাদের তুলনায় রাজাকারদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল সেকেলে ধরনের। রাজাকারদের পুরোদমে যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো শক্তি ছিল না। রাজাকার ও তাদের পরিবারের সদস্যরা হর হামেশাই বিদ্রোহী বাঙালিদের দ্বারা নাজেহাল হতো। পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন পর্যায়ে রাতদিন যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে রাজাকারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার মতো লোকবল ও সময় ছিল না সেনাবাহিনীর। রাজাকার সদস্য সংগ্রহ করা হয় পাকিস্তান অনুগত বাঙালিদের মধ্য থেকে। তবে তাদের 'নিয়ন্ত্রণ করতে ও সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য তাদের সাথে একত্রে রাখা হয় পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ সদস্য ও অবাঙালিদের'।

পরবর্তী মাসগুলোর দৈনন্দিন জীবনের যে বর্ণনা মিসেস চৌধুরী দিয়েছেন তা ছিল যুক্তিতর্কের বাইরের এক পরিস্থিতির বিবরণ। নীচতলায় পাক সেনারা সবসময় যাওয়া-আসা করত মাওলানা মান্নানের কাছে ও প্রায়দিনই তারা সেখানে থাকতো অনেক রাত পর্যন্ত। আল বদর সদস্যরা মাওলানা মান্নান ও ডা. চৌধুরীর গেট পাহারা দিতো।অন্যদিকে উপর তলায় মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিদিন ক্লিনিকে আসতো যেখানে তাদের ফ্রি চিকিৎসা দিতেন ডা. চৌধুরী ও প্রয়োজনে তারা ডা. আলিমকে গাড়িতে করে নিয়ে যেতো 'নিরাপদ স্থানে'। ডা. চৌধুরী সেসময় গেরিলাদের জন্য সংগ্রহ করতেন অর্থ ও ঔষধ। তিনি ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ফজলে রাব্বী এবং আরো ক'জন চিকিৎসক একটি গোপন হাসপাতালে গিয়েছিলেন গেরিলাদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য।

মিসেস চৌধুরী আমাকে বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী তাঁকে ডেকে পাঠান ও জিজ্ঞেস করেন নীচতলায় আল-বদরদের আসা-যাওয়া আর উপর তলায় মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনা নিয়ে সেসময় আমরা কি ভেবেছি? মিসেস চৌধুরী-এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি। আমি মিসেস চৌধুরীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে প্রতিবেশীটি মাওলানা মান্নানকে আশ্রয় দিতে তার নিকট নিয়ে আসেন তিনি কি জেনেশুনেই নিয়ে এসেছিলেন না কি ভাল মন নিয়ে একজন লোকের উপকার করতেই তাদের কাছে

www.pathagar.com

এনেছিলেন? মিসেস চৌধুরী নিশ্চিত করে-এর উত্তর দিতে পারেননি- কারণ ওই প্রতিবেশীর সাথে তাদের বেশ ভালো সম্পর্কই ছিল, এমনকি মার্চ মাসে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে লুকিয়ে পালাতে যে বোরকাটি ব্যবহার করা হয় সেটিও ছিল ওই প্রতিবেশীর স্ত্রীর বোরকা। এটা স্পষ্ট নয় যে কেন চৌধুরী পরিবার তাদের অযাচিত অতিথিদের সেখানে আসতে বারণ করেননি, নিজেরা সেখান থেকে চলে যাননি বা তাদের স্বাধীনতাকামী তৎপরতা চালানোর জন্য ভিন্ন স্থান বেছে নেননি? ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে পুরাদমে যুদ্ধের শেষে দিকে তারা অন্যত্র চলে যাবার কথা চিন্তা করেছিলেন কিন্তু কোথায়ও চলে যাননি। এ সবই অনেকের কাছে খুব কাঁচা কাজ বলে মনে হতে পারে। তবে যতোক্ষণ পর্যন্ত না শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীর সরলতা ও মহত্বের মুখোমুখি কেউ না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কেন এমন হলো তা বোঝা সম্ভব হবে না।

মাওলানা মান্নান সব সময় ডা. চৌধুরীর সাথে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলতেন ও তাকে আশ্বস্ত করতেন এ বলে যে, তিনি তার ওই দু:সময়ে সাহায্যের কথা কখনোই ভুলে যাবেন না, যদি (ডা. আলিম) কখনও বিপদে পড়েন তবে তিনি তার পাশে থাকবেন। মাওলানা মান্নান এও বলেন যে তিনি সেখানে থাকতে তার (ডা.আলিম) মতো একজন ভালো চিকিৎসকের উপর কোনো বিপদ আসবে না।

মিসেস চৌধুরীর ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিকালে ঢাকায় ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করছিল। ঠিক ওই সময় গায়ে কাদা মাটি মাখানো ছোট একটি মাইক্রোবাস এসে থামে মাওলানা মান্নানের দরজার সামনে। এ ধরনের গাড়ি সেখানে প্রায়ই যাওয়া-আসা করতো আর তাই এতে চৌধুরী পরিবারের লোকজন তেমন বিরক্ত বোধ করেননি। ইতোমধ্যে দু'জন বন্দুকধারী আল-বদর সদস্য ডা. আলিম চৌধুরীর ঘরের ভিতর প্রবেশ করতে চায়। ডা. চৌধুরী মাওলানা মান্নানের দরজায় অনেকবার ধাক্কা দিয়েছিলেন, কিন্তু মাওলানা দরজা খুলে দেননি। তিনি শুধু ভিতর থেকে বলেন, 'আপনি যান, আমি সেখানে থাকবো (আপনার জন্য)'। ওই দুই বন্দুকধারী ডা. আলিমকে মাইক্রোবাসে করে নিয়ে চলে যায়। তার পরনে ছিল সাধারণ একটা লুঙ্গি ও গায়ে ছিল বাসায় পড়া জামা। মিসেস চৌধুরী আমাকে বলেছেন তিনি মাওলানা মান্নানকে সে সময় হস্তক্ষেপ করতে অনুনয়-বিনয় করেছিলেন, কিন্তু মাওলানা কিছুই করেননি। মাওলানা মিসেস চৌধুরীকে বলেন যে ওই যুবকরা তার ছাত্র এবং তারা ডা. চৌধুরী, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ফজলে রাব্বী ও অন্যান্যদের নিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসা সেবা নেয়ার জন্য। ডা. চৌধুরী ওই রাতে আর ফিরে আসেননি। মিসেস ফজলে রাব্বীকে টেলিফোন করলে তিনি নিশ্চিত করেন যে ডা. ফজলে রাব্বীকেও একই সময়ে একইভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পরদিন অর্থাৎ ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতের নিকট আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধ শেষ হলে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নাম নিয়ে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে। 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস আর রাস্তা পূর্ণ হয়ে ওঠে। মিসেস চৌধুরী তার দেবর হাফিজের খোঁজে তার বাসার দু'জন কাজের ছেলেকে পাঠানোর চেষ্টা করেন। দেবরের বাসার টেলিফোনটি ছিল অকেজো। তবে রাস্তায় সর্বত্র যখন তখন গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটছিল বলে কাজের ছেলে দু'টি ফিরে আসে।

মিসেস চৌধুরী বলেন একটা কাপড়ের পুটলী হাতে মাওলানা মান্নান আবার অকস্মাৎ দোতলায় এসে হাজির হন ও আশ্রয়ের জন্য পুনরায় অনুনয়-বিনয় করেন। আতংকের স্বরে তিনি বলতে থাকেন- আশ্রয় না পেলে তারা (মুক্তিযোদ্ধারা) তাকে হত্যা করবে। মিসেস

www.pathagar.com

চৌধুরী তাকে ভিতরে ডাইনিং রুমে যেতে বললে মাওলানা মান্নান ডাইনিং টেবিলের নীচে লুকিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরই একজন অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধা সেখানে হাজির হয়ে মিসেস চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ওই দুর্বৃত্তটি কোথায় যে আলিম ভাইকে হত্যা করেছে?' একথা শুনে মিসেস চৌধুরী হতবাক হয়ে যান। কিন্তু মাওলানাকে সেখানে আর পাওয়া যায়নি কীভাবে যেন তিনি সেখান থেকে সটকে পড়েছিলেন।

ডা. চৌধুরীর ভাই হাফিজ ১৭ ডিসেম্বর বাসায় ফিরে আসেন। তারা সকলে ডা. চৌধুরীর সন্ধান করেন কিন্তু কেউ কোনো খবর দিতে পারেনি। অবশেষে ১৮ ডিসেম্বর তার মরদেহ রায়ের বাজারে খোলা ইটের ভাটায় আরো অনেক সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবীর লাশের সাথে পাওয়া যায় যারা সকলেই ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থক। প্রত্যেকের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল আর চোখ বন্ধ ছিল কাপড় দিয়ে। ধারণা করা হয় তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল ১৫-১৬ ডিসেম্বর রাতে। রায়ের বাজারে ইট ভাটায় প্রাপ্ত অন্যান্য নিহতের আপনজনদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ১৫ ডিসেম্বর প্রায় একই কায়দায় আল বদরের সদস্যরা ওই কাদামাখানো গাড়িতে করে সকলকে ধরে নিয়ে যায়। আবার অনেকের লাশও পাওয়া যায়নি।

মিসেস চৌধুরীর দেয়া বর্ণনা অনুযায়ী ডা. আলিম চৌধুরীর বুকে অনেকগুলো বুলেটের আঘাত ছিল এবং বাম ললাট ও বাম তলপেটে ধারাল কোনো কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল যা দেখে মনে হয়েছিল তাকে বেয়োনেট দিয়েও আঘাত করা হয়েছে। তার পরনে ছিল সেই গেঞ্জি, জামা আর লুঙ্গি যা পড়া অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। মিসেস চৌধুরী দেখেছিলেন যে তার (ডা.আলিম) মুখমণ্ডল অস্বাভাবিকভাবে কালো হয়ে গেছে কিন্তু তার শরীর সেখানে পড়েছিল দু'দিন যাবত কিঞ্চিৎ জমে থাকা পানিতে মুখ উপুড় করা অবস্থায়। যে গামছা দিয়ে তার চোখ বাধা হয়েছিল সেটি জড়িয়ে ছিল তার গলায় ।

ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ড

যুদ্ধের শেষ মূহূর্তে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের ডেথ স্কোয়াড ধরনের হত্যাকাণ্ড ছিল ১৯৭১ সালের যুদ্ধের একটি চরম নিষ্ঠুরতা।[৪] এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে কতজনকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে, কে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে ও এ হত্যাকাণ্ড ঘটানোর কারণ কি? এসব প্রশ্ন আজও রহস্যই থেকে গেছে। মনে হয় না যে বাংলাদেশে সরকারিভাবে এ হত্যাকাণ্ডের কোনো সুষ্ঠু তদন্ত হয়েছে। তবে ডা. আলিম চৌধুরীর পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিচারণ থেকে ডা. আলিম চৌধুরীর বিষয়টি ও একই হত্যাকাণ্ডে অন্যান্য নিহতদের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের দেয়া বর্ণনার তুলনা এবং রায়ের বাজার হত্যাকাণ্ডে একমাত্র বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির দেয়া বর্ণনা থেকে বেরিয়ে এসেছে কিছু সঙ্গতিপূর্ণ তথ্য।

নিহত সকল ব্যক্তিকেই তাদের বাড়ি থেকে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে, অধিকাংশ ব্যক্তিকে ১৪-১৫ তারিখে একদল সশস্ত্র বাঙালি যুবক (নিহত ব্যক্তিদের পরিবার যাদেরকে আল-বদর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তারা) ছোট মাইক্রোবাসে করে ধরে নিয়ে যায়। তাদের অনেকের মৃতদেহ পাওয়া যায় রায়ের বাজার ইটের ভাটায় চার বা পাঁচদিন পরে। মৃতদেহগুলোর প্রত্যেকের হাত দু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল ও চোখ বন্ধ করা ছিল গামছা বা কাপড় দিয়ে। অনেক মরদেহ কখনোই পাওয়া যায়নি বা শনাক্ত করাও সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

ডিসেম্বর মাসে কারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল এবং কেন? এটা ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও বিশ্বাস করা হয় যে পাকিস্তান সেনবাহিনীর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান ছিলেন স্বাধীনতার সমর্থক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ডিসেম্বর হত্যাকাণ্ডের মুখ্য পরিকল্পনাকারী। এরূপ ধারণা করার প্রাথমিক কারণ হচ্ছে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে তাঁর লেখা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নামের একটি তালিকা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশীদের হাতে পড়েছিল।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান ছিলেন ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা অভিযানের দৃশ্যপটে অন্যতম বিতর্কিত ব্যক্তি। তিনি মার্চের পর থেকে যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসনের বেসামরিক বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং ওই সময়কার পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণরের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছেন। ধারণা করা হয় তিনি যুদ্ধকালীন সময়ে জান্তার সদর দপ্তরের সাথে পৃথকভাবে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন ও আত্মসমর্পণের সময় ইষ্টার্ণ কমান্ডের কমাণ্ডার জেনারেল নিয়াজীকে না জানিয়ে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। প্রশ্ন করা হয়-কি উদ্দেশ্যে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান বা পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঠিক আত্মসমর্পণের আগমুহূর্তে স্বাধীনতার সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল? এব্যাপারে স্বাধীনতার সমর্থক বাঙালিরা অভিযোগ করেন পশ্চিম পাকিস্তানী ও পূর্ব পাকিস্তানে তাদের বাঙালি সমর্থকরা চেয়েছিল যে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর যাতে দেশটি মেধাশূন্য হয়ে পড়ে। তাই বিশেষ করে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

যুদ্ধ পরবর্তী পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো সরকার গঠিত হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ নিয়ে কমিশন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান, লে. জে. নিয়াজী, ঢাকা বিভাগের উপসামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল জামসেদকে জেরা করেছেন। তিনজনই বিবৃতি দিয়ে বলেন তারা বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার দেয়া তালিকা অনুযায়ী কিছু লোককে গ্রেফতার করার সম্ভাবনার বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি খান পরামর্শ দিয়েছিলেন কাউকে গ্রেফতার না করার জন্য; লে. জে. নিয়াজী জানিয়েছিলেন যে তালিকাটি তাকে দেয়া হয়েছিল সেটি ছিল গেরিলা নেতাদের- কোনো বুদ্ধিজীবীর নয়, তারপরও তিনি কাউকে গ্রেফতার করতে দেননি। মেজর জেনারেল জামসেদ বলেছিলেন ওই ধরনের পরিকল্পনা ছিল অবাস্তব ও তিনি-এর বিপক্ষে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনজন সেনা জেনারেলই বলেছিলেন, সেনাবাহিনী কোনো বুদ্ধিজীবী বা পেশাজীবীকে যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত গ্রেফতার বা হত্যা করেনি।[৫]

এমনকি যদি মেজর জেনারেল ফরমানের হাতের লেখায় সন্দেহভাজন স্বাধীনতা সমর্থকদের তালিকাও পাওয়া যায় তাহলেও এতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না যে তিনিই ওই বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল নীলনকশা প্রণয়নকারী। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এমনিতেই যুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল ও ভারতের কাছে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। তবে এটা সম্ভব যে রাজাকার, আল-বদর বাহিনীর দল যেগুলোকে সেনাবাহিনী আগেই গঠন করেছিল সে সব আধা সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে তাদের নিজেদের মতো করে স্থানীয়ভাবে অভিযান চালাতে শুরু করে। তাদের হাতে ওই নামের তালিকা থাকার সম্ভাবনাই ছিল বেশি বা তারা নিজেরাও তালিকা তৈরি করে থাকতে পারে, কারণ তারাই ছিল গেরিলাদের স্থানীয় সমর্থকদের ব্যাপারে মূল

www.pathagar.com

গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকারী। কে বা কারা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্বাধীনতার সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল তা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে যারা ওই চরম গর্হিত কাজ করেছিল তাদের কারও নিকট থেকে পূর্ণ সহযোগিতা আদায় করা প্রয়োজনীয় তথ্য উদ্ধারের জন্য একটি উপযুক্ত বিচার বিভাগীয় তদন্তও এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হতে পারে। তবে যারা ওরকম তথ্য দিবে তাদেরকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান ও কিছুটা দায়মুক্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

স্বাধীনতার সমর্থক যাদেরকে টার্গেট করা হয়েছিল ও নিহত সকলের পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা ছিল একই রকম। এ ক্ষেত্রে ওই সব বর্ণনানুযায়ী সবাইকে একই পদ্ধতিতে কাদামাটি মাখা একটা বিশেষ মাইক্রোবাসে পিছনে হাত বেঁধে ও কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল আল বদরের যুবক সদস্যরা। সব পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায় বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের যারা ধরে নিয়ে যায় তাদের সকলেই ছিল বাঙালি।[৬] একইভাবে রায়ের বাজারে হত্যাকাণ্ডের একমাত্র বেঁচে যাওয়া ব্যক্তির দেয়া সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায় বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের অপহরণকারী ও হত্যাকারীরা ছিল সকলেই বাঙালি।[৭]

ডা. আলিম চৌধুরীর পরিবারের সদস্যরা মাওলনা মান্নানকে তাঁর হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। যুদ্ধের পর মাওলানা মান্নান চলে যান অজ্ঞাত স্থানে। সে সময় তার ছবিসহ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বাংলাদেশে তাকে গ্রেফতারের জন্য 'একে ধরিয়ে দিন' শিরোনামের বিজ্ঞাপন মারফত ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এক সময় তার অবস্থান জানা যায় ও অল্পসময়ের জন্য তাকে আটকানোও হয়। তবে তাকে চলে যেতে দেয়া হয়। চৌধুরী পরিবার উল্লেখ করেন মাওলানা মান্নানকে সাধারণ হত্যা মামলার আসামী করে বিচার করা সম্ভব ছিল না- কারণ তিনি নিজে অপহরণ বা হত্যা করেননি, এছাড়াও তিনি ডা. আলিম চৌধুরীর বাসায় ছিলেন যুদ্ধের প্রায় পুরো সময়টুকু। তার পরিবারের মতে, একমাত্র 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' এ বিষয়টিকে সামনে রেখে একটি সুষ্ঠু বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্মূল অভিযানে ওই সব অপরাধী কতোটুকু জড়িত ছিল, কে বা কারা অপহরণ করেছে, কে বন্দুকের ট্রিগার টিপেছে তা খুঁজে বের করা সম্ভব। মাওলানা সম্পর্কে শুধু এটুকুই বলা যায় যে তিনি হয় অক্ষম ছিলেন নয়তো তার কোনো ইচ্ছে ছিল না ডা. আলিম চৌধুরীকে রক্ষার যে মানুষটি তাকে তার চরম দুর্দিনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অবশ্যই তিনি ঋণী ছিলেন ডা.আলিমের কাছে, কিন্তু সেই ঋণশোধে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন।

মাওলানা মান্নান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে বিরোধীতা করলেও স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন। আমার ঢাকা সফরকালে সেখানে অসংখ্য বিল বোর্ড দেখেছি একটি দৈনিক পত্রিকার যার মালিক হচ্ছেন মাওলানা মান্নান। তিনি রাজনীতিতে ও সামাজিক পর্যায়ে ছিলেন বেশ সক্রিয় ও একপর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশ সরকারের একজন পূর্ণমন্ত্রীর পদেও আসীন হয়েছিলেন। শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী তার স্বামীর খুনীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য অনমনীয়ভাবে দাবি করে আসছেন অনেক দিন ধরে- এক্ষেত্রে বাইরে তার নম্র স্বভাবের আড়ালে তাকে মনে হয়েছে শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি এক নারী হিসেবে। তিনি প্রকাশ্যে অনবরত মাওলানা মান্নানের নাম উল্লেখ করে তাকে তার স্বামীর হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি আমাকে বলেছেন, বিচারের দাবি করায় মাওলানা মান্নান তাকে ও তার মেয়েকে হুমকি প্রদান করেছিলেন।[৮]

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের তুলে নিয়ে যাওয়া ও তাদের মৃতদেহগুলো পাওয়ার মাঝের সময়ে কি ঘটেছিল? চিহ্নিত ব্যক্তিদের বাসে তুলে নেয়ার পর কি হয়েছিল সে সম্পর্কে জানা যায় রায়ের বাজারের হত্যাকাণ্ডে বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি হিসাব রক্ষক দেলোয়ার হোসেনের কাছ থেকে। হোসেন তেমন কোনো বিশেষভাবে পরিচিত বুদ্ধিজীবী বা পেশাজীবী ছিলেন না এবং স্পষ্ট নয় যে কি কারণে তাকেও উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল ওই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে। তিনি লিখেছেন , তাকে তার শান্তিবাগের বাসা থেকে ১৪ ডিসেম্বর সকালে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার বাসার পাশের এক হোস্টেল থেকে ধরে আনা এক ব্যক্তির সাথে তোলা হয় কাদামাটি মাখানো বাসে। তার দুই হাত মুড়ে পিছনে নিয়ে বাঁধা হয় ও তার চোখ ঢেকে দেয়া হয় কাপড় দিয়ে। পথে বিভিন্ন স্থানে থামিয়ে আরো অনেককে উঠানো হয় বাসে।

চোখ বাঁধা অবস্থায় গন্তব্যে পৌছলে তাকে সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে উপরে তোলার পর একটি ঘরে যেখানে আরো লোক ছিল তাদের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়। কেউ একজন তার হাতের বাঁধন খুলে দেয়ার সময় হোসেন উচ্চস্বরে কেঁদে উঠেন। চোখের কাপড় কিছুটা ঢিলে করে হোসেন দেখেন যে তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছে সে ৮/৯ বছরের এক বালক মাত্র। বালকটির বাহুর চামড়া ছিল কাটা ও তার হাত দুটি ছিল ফোলা। ঘরের মেঝে ছিল রক্তাক্ত ও মেঝেতে রক্তমাখা কাপড় পড়ে ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই ছিল আহত ও ক্ষতবিক্ষত যা দেখে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তাদের নির্যাতন করা হয়েছে। হোসেনের মতে ওই বালকটি পুনরায় তার হাত দু'টো ঢিলে করে বেঁধে দেয় ও তিনি নিজে চোখ বেঁধে রাখা কাপড় এমনভাবে রাখেন যাতে বাইরের দৃশ্য কিছুটা দেখা সম্ভব হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় আরো অনেক বন্দি ধরে নিয়ে আসা হয় ও তিন বা চারজন লোক এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে। হোসেন দেখেন প্রায় সকল বন্দিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও এ ধরনের লোকজন। জিজ্ঞাসাবাদ ও উত্তরপর্ব চলছিল সম্পূর্ণ বাংলায়। প্রশ্নের সাথে সাথে চলছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও অবমাননা-পেটানোও হচ্ছিল একই সাথে। এরপর জিজ্ঞাসাবাদকারী লোকগুলো ওই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। মধ্যরাতে বা তার কিছুটা পরে বন্দিদের আবার উপর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে তিনটি বাসে উঠানো হয়। বাস তিনটি এক জায়গায় থেমে যাওয়ার পর সেখান থেকে বন্দিদের কিছুদুর নিয়ে যাওয়া হয় হাঁটিয়ে। হোসেন সেখানে দেখেন একটি বটগাছ, একটি বড় বিল (হ্রদ-এর মতো) এবং ১৩০-১৪০ জন অন্যান্য বন্দিদের বসে থাকতে।[৯] হোসেনের দেয়া ভাষ্য অনুযায়ী এরপর আল বদরের সদস্যরা বন্দিদের হাত দড়ি দিয়ে পিছনে বাঁধতে আরম্ভ করে। হোসেনকে বাঁধা হয়েছিল তার পিছনে দাঁড়ানো লোকটির গেঞ্জির সাথে তার (হোসেনের) গেঞ্জি দিয়ে। এরই মধ্যে একজন বন্দি চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'তোমরাও তো বাঙালি, আমাদের হত্যা করছ কেন?' হত্যাকারীরা বন্দিদের এক একটি দলে ভাগ করে নিয়ে যায় পাশের ফাঁকা মাঠে। তারপরই চালায় গুলি, একই সাথে চলে বেয়োনেটের খোঁচা। তার সামনেই হত্যাকারীরা যখন হত্যাকাণ্ডে ব্যস্ত, হোসেন তখন তার গেঞ্জির বাঁধন খুলে ফেলেন ও ঢিলে করে বাঁধা হাতের বাঁধন খুলে ও চোখ বেঁধে রাখা কাপড় ফেলে মরিয়া হয়ে দৌড় দেন জীবন বাঁচানো তাগিদে। পিছনে চিৎকার ও গুলির শব্দ হোসেনের কানে আসছিল, কিন্তু পানি ও কাঁদার মধ্য দিয়ে মরিয়া হয়ে সেখান থেকে তিনি পালাতে সক্ষম হন। বাকী রাতটুকু হোসেন কাটিয়ে দেন নদীর ধারে। সকালে হাঁটতে শুরু করেন গ্রামের দিকে। তার দেয়া বট গাছের বর্ণনা থেকে গ্রামবাসীরা ওই স্থানটিকে শনাক্ত

www.pathagar.com

করে রায়ের বাজারের ঘাট হিসেবে। তবে দেলোয়ার হোসেনের দেয়া বর্ণনাকে দৃঢ়ভাবে সত্য হিসেবে সমর্থন করার মতো সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি।

হত্যাকাণ্ডের উপর মিথ্যা রিপোর্ট: হত্যাকাণ্ডগুলো ছিল নিঃসন্দেহে ভয়াবহ, তারপরও ওই ঘটনাগুলোকে অতিরিক্ত ভয়াবহতার অলংকরণ দিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে। এ ধরনের প্রচারণায় যেমন একদিকে নিহতদের আপনজনরা অতিরিক্ত মানসিক আঘাতের মুখোমুখি হয়েছেন তেমনি প্রকৃতপক্ষে সে সময় কি ঘটেছিল সে সংক্রান্ত প্রামাণ্য দলিল তৈরির কাজকেও বাঁধাগ্রস্ত করেছে। ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের পরিচালক আমাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানান যে মুক্তিযুদ্ধকালে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে নিহতদের বিশেষ পদ্ধতিতে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে, দুটো চোখই তুলে নেয়া হয়েছে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. আলিম চৌধুরীর, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ফজলে রাব্বির হৃদযন্ত্র কেটে বের করা হয়েছে বুকের ভিতর- ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ জাতীয় খবর বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও বই-পুস্তকে ছাপা হয়েছে বহুবার এবং মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর কর্তৃপক্ষ এ ধরনের প্রকাশনার একটি সংখ্যাও আমাকে দিয়েছেন।

আমি ইতোপূর্বে মিসেস চৌধুরীর সাথে সাক্ষাত করে জানতে পারি যে ডা. আলিম চৌধুরীর চোখে কোনো প্রকার আঘাত ছিল না। আমি বার বার মিসেস চৌধুরীর কাছে ওই সব বেদনাদায়ক স্মৃতির কথা জানতে চাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি বলেন, না তিনি কখনোই কিছু মনে করেননি; তিনি তার স্মৃতিচারণগুলো-এর মাঝে প্রকাশও করেছেন যাতে তার স্বামীর উপর নির্যাতনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তার দেয়া বর্ণনাতে ডা. আলিম চৌধুরীর চোখে কোনো আঘাতের কথা উল্লেখ নেই। ডা. ফজলে রাব্বীর মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল রায়ের বাজারে ও তার মরদেহ সম্পর্কে তার স্ত্রী লিখেছেন, 'তার বাম গাল ও কপালের বাম পাশে ছিল অসংখ্য বুলেটের চিহ্ন। বুকেও অসংখ্য বুলেটের আঘাত ছিল তবে তা আমি গুণে দেখিনি। কিন্তু এটা ডাহা মিথ্যে কথা যে তার বুক চিরে ফেলা হয়েছিল। আমি সেই বুক দু'হাত দিয়ে ধরেছি ও দেখেছি।'[১০] তার স্বামীর ব্যাপারে প্রচারিত ভুল বর্ণনা সম্পর্কে মিসেস রাব্বী ভালোভাবেই জানতেন ও তার নিজের স্মৃতিচারণে কয়েকবছর আগে তা তিনি তুলেও ধরেছিলেন। তারপরও ওই অপ্রোয়জনীয় ভুল তথ্যটি পনের বছর পরও একটি দায়িত্বশীল মহল বারবার প্রচার করেছে।[১১]

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের অন্যান্য হত্যাকাণ্ড: ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে অনেকগুলো ন্যাক্কারজনক হামলা ও হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একবারেই অনুপস্থিত। এগুলোর মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছবিসহ ওই সময়ে ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রচার পেয়েছিল। এটি ছিল ঢাকার বুকে প্রকাশ্য জনসম্মুখে একদল বেসামরিক লোককে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী (বাঘা সিদ্দিকী) ও তার বিশেষ বাহিনী -কাদেরীয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা।

ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের পর ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর দি *ডেইলী টেলিগ্রাফ* তার প্রথম পাতায় যে খবরটি ছাপে তা ছিল এরূপ: 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পর প্রথম জনসমাবেশে চারজন তরুণকে মারধর ও নির্যাতন করা হয়েছে প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে এবং তারপর উল্লসিত বাঙালিদের সামনে ওই চারজনকে হত্যা করা হয়েছে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। ঢাকার রেসকোর্সে

www.pathagar.com

শনিবারের জনসমাবেশে কোনো মুক্তিযোদ্ধা নেতাই ওই চারজনের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারেননি অথচ ওই চারজন বাঙালিকে "ন্যায় বিচার"-এর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।'

দি *ডেইলি টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় ওই চারজনকে হত্যা করার যে ছবিটি ছাপা হয় সেটির শিরোনাম ছিল: 'সপ্তাহান্তে ঢাকায় হাস্যরত গেরিলারা তাকিয়ে দেখছে একজন বন্দিকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারার আগে কীভাবে তাকে পেটানো হচ্ছে ও নির্যাতন করা হচ্ছে।' ওই একই দিন *দি টাইমস্*-এর শিরোনাম ছিল: 'প্রার্থনার পর মুক্তিবাহিনী বন্দিদের বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করছে।' ওই ঘটনার ছবি ও মন্তব্যগুলো ১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি *লে ইউরোপিয়ো*'তে শেখ মুজিবের উপর লিখিত ওরিয়ানা ফালাচি'র এক ফিচার প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিদেশী সাংবাদিকদের তোলা ওইসব ছবির কয়েকটিতে দেখা যায় কীভাবে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা বেয়োনেট দিয়ে খুচিয়ে হত্যার আগে বন্দিদের চোখ সিগারেটের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এক বিশাল জনতা তা দাঁড়িয়ে দেখছে, তাদের কেউ কেউ আবার দাত বের করে হাসছে। দর্শকদের মধ্যে শিশুরাও ছিল ও প্রতিহিংসার শিকার ওই হতভাগ্যদের মধ্যে ছিল একজন বালক।[১২] জানা যায় ওই বর্বরোচিত ঘটনার পর ভারতীয় সেনাবাহিনী কাদের সিদ্দিকীকে গ্রেফতার করে।[১৩]

১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর তার লেখা স্মৃতিচারণের দু'টি অংশে কাদের সিদ্দিকী ওই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন জনসমাবেশে যাওয়ার পথে তিনি ও তার লোকজন একটি গাড়ি থেকে দু'জন অবাঙালি যুবতি, তাদের বয়স্ক পিতা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা উদ্ধার করেন, সেই গাড়িতে চারজন লোক তাদের অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ওই চারজনকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দেন ও ওই চারজনকে নিয়ে আসা হয় সমাবেশে যেখানে মঞ্চে তার সাথে শেখ মুজিবের পুত্র জামালও উপস্থিত ছিলেন। কাদের সিদ্দিকী লিখেছেন, জনসমাবেশ শেষে তিনি সবার উদ্দেশে জিজ্ঞেস করেন, যে চারজনকে ধরে আনা হয়েছে তাদের কি শাস্তি দেয়া উচিত? জনতা সমস্বরে চিৎকার দিয়ে বলে তাদের হত্যা করা হোক, কাজেই জনগণের মতের প্রতিফলন ঘটিয়ে চারজনকে গুলি করে ও বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করা হয়। সিদ্দিকী স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন ও অনুভব করেছিলেন যে বিদেশী সংবাদ মাধ্যম তাকে জনসমাবেশে প্রকাশ্যে 'লুটেরা ও নারী অপহরণকারীদের' হত্যা করার জন্য অন্যায়ভাবে সমালোচনা করেছে। বিচার বিভাগের কোনো রায় ছাড়া এ ধরনের নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডে সিদ্দিকী অন্যায় কিছু দেখেননি।[১৪]

হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া ঢাকার একজন খ্যাতিমান বাঙালি বুদ্ধিজীবী উল্লেখ করেছেন, 'আমি কয়েকজনকে আমার স্ত্রী ও আমার জ্ঞাতি ভাইয়ের সাথে তর্কে লিপ্ত হতে দেখি ... তাদের একজন আমার শার্টের কলার ধরে টেনে নিচে নামিয়ে এনে বাইরে অপেক্ষমান জীপে বসায়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পর অপহরণকারীরা আমাকে নিয়ে যায় একটি বাড়ির তৃতীয় তলার বড় একটি কক্ষে। যে যুবকটি আমাকে আমার কলার ধরে রেখেছিল হঠাৎ সে সজোরে আমার গালে থাপ্পড় মেরে বসে...। খুলে নেয়া হয় আমার সোয়েটার, শার্ট, গেঞ্জি, ঘড়ি ও চশমা। তারা আমার রুমাল দিয়ে আমার চোখ বেঁধে দেয়, হাত দু'টো বেধে দেয় পিছন মুড়ে এবং এরপর চামড়ার চাবুক দিয়ে আমাকে পেটাতে শুরু করে আর শক্ত কিছু দিয়ে আমার হাত ও পায়ের আঙ্গুলের গিটে আঘাত করে।'

এ অবস্থায় এক রাত বন্দি রাখার পর তাকে একটি জীপের পিছনে মেঝেতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অজানা এক জায়গায়। এখানে চোখ বাঁধা অবস্থায় গলা টিপে ধরে তার বুকে

www.pathagar.com

তিন দফা ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় ও তারপর তার শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড আঘাত করলে এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তখন মৃত ভেবে তাকে ফেলে দেয়া হয়। অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান ও পথচারীরা তাকে উদ্ধার করার সময় তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক সহকর্মীকে যিনি তখনও জীবিত ছিলেন তাকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখেন।

এ ঘটনা ১৪-১৫ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের অপহরণ ও হত্যার ভয়াবহতাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে পুনরায় বাংলাদেশে সে ধরনের ঘটনা ঘটে স্বাধীনতা লাভের ঠিক তিন দিন পর ১৯৭১ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর।

এ নির্যাতিত ব্যক্তিটি যিনি পঙ্গু অবস্থায় বেঁচে যান তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষার স্বনামধন্য অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। যিনি রাস্তায় তার পাশেই পড়ে ছিলেন অর্ধমৃত অবস্থায় তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক ড. হাসান জামান। এ ঘটনার হত্যাকারীরা পাকিস্তান সমর্থিত আল বদরের সদস্য ছিলেন না যারা তখন পালিয়ে ছিল, বরং যারা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তা ছিল স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধা, ড. হোসেন -এর মতে যাদের অধিকাংশই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ড. হোসেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ও এরপর অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানের একজন কট্টর সমর্থক। তার উপর হামলাকারীরাও ছিল আল-বদরের ন্যায় বাঙালি যুবক যারা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করতেন সাজ্জাদ হোসেনের সাথে । উভয়পক্ষের যুবকদের রাজনৈতিক আচরণ ছিল একই ধরনের। স্বাধীনতার সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের যেমন আল-বদরের সদস্যরা পাকিস্তান বিরোধী বিশ্বাসঘাতক হিসেবে বিবেচনা করেছেন, তেমনি স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারাও পাকিস্তান সমর্থিত বুদ্ধিজীবীদের আখ্যায়িত করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি বা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। যে ছাত্ররা সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে অপহরণ করেছে তারা তাকে আখ্যায়িত করে 'অননুতপ্ত শূকর' হিসেবে ও বলে যে 'ওই রকম একজন বিশ্বাসঘাতকের গুলি খাওয়াই উচিত'। ড.হোসেন বলেন,'তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে আমি নাকি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ও অনৈতিক কাজের জন্য পাকসেনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হোস্টেল থেকে মহিলা সরবরাহ করেছি। এ ধরনের অভিযোগে আমি হতবাক হয়ে যাই। আমি তাদের বলি, তাদের ইচ্ছে হলে তারা আমাকে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু তাদের সে সব অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও আমি যে কোনো অভিযোগের জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।' কিন্তু উভয়পক্ষেরই ওই অস্ত্রধারী যুবকরা কোনো ধরনের নীতি নৈতিকতা, গণতান্ত্রিক রীতি নীতি, মুক্ত সমাজ বা বিচারের প্রতি আগ্রহী ছিল না। লক্ষ্যীয় বিষয় যে আল বদর ও মুক্তিযোদ্ধারা ওই ক্ষেত্রে ছিল শিক্ষিত বাঙালি যুবক। যেখানে ড. সাজ্জাদ হোসেনকে আটকে রাখা হয় ও নির্যাতন করা হয় সেটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সাইন্স এ্যানেক্স বিল্ডিং। তাকে মৃত ভেবে যেখানে ফেলে দেয়া হয় সেটি ছিল জিন্নাহ এ্যাভিনিউ-এ (বর্তমান বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ) গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনের চত্বরে।[১৫]

১৯৭২ সালে আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি: খ্যাতিমান বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা

www.pathagar.com

জহির রায়হানের নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনাটি বড় অদ্ভুত। তার নিখোঁজ হওয়া ও নিহত হওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' সম্পর্কিত সাহিত্যে ও ইতিহাসে। যা হোক, জহির রায়হান ১৯৭২ সালে ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় নিখোঁজ হন। তার নিখোঁজ হওয়ার দায় দায়িত্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দেয়া যায় না কারণ তারা ওর মধ্যেই যুদ্ধবন্দি হিসেবে ভারতে অবস্থান করছিল, আবার আল-বদরকেও দায়ী করা যায় না কেননা তারা ব্যস্ত ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের বদলা নেয়ার ভয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ইতোমধ্যে জহির রায়হান নিখোঁজ হয়েছেন, শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন একজন বীরের বেশে; দায়িত্ব নিয়েছেন নতুন দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে।

১৪-১৫ ডিসেম্বর স্বাধীনতার সমর্থক নিহত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জহির রায়হানের ভাই সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সারও ছিলেন। উভয় ভ্রাতাই জড়িত ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির সাথে। শহীদুল্লাহ কায়সারকে আল বদর- এর যুবক সদস্যরা ১৪ ডিসেম্বর অন্যান্যদের মতো একই কায়দায় অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তার লাশ তার পরিবার কখনোই পায়নি। জহির রায়হান ১৭ ডিসেম্বর ভারত থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন ও তার ভাইয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তিনি স্বাধীনতার সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের ডিসেম্বর হত্যাকাণ্ড সংশিষ্ট অপরাধ প্রমাণ করতে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করেন। কিন্তু তিনি সেই তদন্ত চলাকালে নিজেই ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ নিখোঁজ হয়ে যান।[১৬]

আবারো বাঙালির হাতে বিহারী হত্যাকাণ্ড: প্রায় এক বছর আগে খুলনায় জুট মিলে বিহারী নারী, পুরুষ ও শিশুদের বাঙালিরা নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল, সেই বিহারীদের আবারও নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ শাসিত স্বাধীন বাংলাদেশে।[১৭] ভাগ্যবান বিহারী যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তাদের ভাষ্য অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ১০ মার্চ খুলনায় নিউ টাউন কলোনীতে বিহারী পাটকল শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজনদের সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বাঙালিরা ঘেরাও করে রাখে এবং বিহারী নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। বিহারীরা দাবি করেছেন, ওইদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক অবাঙালির উপর হামলা করা হয়েছিল। জুট মিলের বাঙালি শ্রমিকরা আমাকে নিশ্চিত করেছেন যে সেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ও ওই দিন শ' শ' বিহারীকে হত্যা করা হয়; অন্যদিকে বিহারীরা আমাকে জানান যে প্রকৃতপক্ষে ওইদিনের ঘটনায় নিহত বিহারীদের সংখ্যা হচ্ছে ২০,০০০-২৫,০০০ জন। তাহলে যৌক্তিক কারণেই বলা যেতে পারে ওইদিন হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে কয়েক হাজার বিহারী নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল।

কৌতুহলের বিষয় হলো বাঙালি শ্রমিকরা পুরনো টাউন কলোনী ও নিউ টাউন কলোনীর মাঝে এক তুলনামূলক বৈপরীত্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তারা জানান ওইদিন পুরনো টাউন কলোনীর ম্যানেজার জনৈক রহমান সাহেব নিজে বাঙালি ও আওয়ামী লীগ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিহারীদের রক্ষা করেন। অন্যদিকে নিউ টাউন কলোনীর ম্যানেজার শহিদ পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েক ঘন্টা সময় দিয়ে বিহারীদের হত্যা করতে সহায়তা করেছিলেন এবং হত্যাকাণ্ডের পর লোক দেখানোর জন্য তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন ওমন ভাব দেখান।

ঘটনাস্থলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পৌঁছলে বেঁচে যাওয়া বিহারীদের স্থানান্তর করা হয় শরণার্থী ক্যাম্পে। বেঁচে যাওয়া বিহারীরা জানিয়েছেন, রেডক্রস তাদের দেখতে এসে

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে নিয়ে যায়। বিদেশী সাংবাদিকরাও ওই হত্যাযজ্ঞের খবর ছেপেছিল। আমি যেদিন খুলনায় ওইসব ভুক্তভোগী বিহারী ও স্থানীয় বাঙালিদের সাথে কথা বলছিলাম সেদিন ঢাকায় আটকেপড়া বিহারীদের নেতারা অনশন ধর্মঘট করছিলেন যাদের পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কেউই গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। আমি অসংখ্য ক্যাম্পের মধ্যে দু'টো ক্যাম্প পরিদর্শন করেছি যেখানে হাজার হাজার অবাঙালি মানবেতর জীবন-যাপন করছেন ও তারা সকলেই ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর হারিয়ে ফেলেছেন তাদের জাতীয় পরিচয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় সম্প্রতিক সময়ে দু'দফায় সীমান্তরেখা টানার ফলে খুলনায় বেঁচে যাওয়াদের দুই দুই বার নিজ দেশেই আগন্তুক হতে হয়েছে। বিহারী পারভেজ আলম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য হয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনীর বিপক্ষে যুদ্ধ করেছেন ও এখনো খুলনাতেই বসবাস করছেন। অন্য অনেকের মতো তিনি মনে করেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সাথে প্রতারনা করেছে, কারণ যুদ্ধ শেষে তাদের যুদ্ধ বন্দি হিসেবে পাক সেনাদের সাথে যাওয়ার অনুমতি না দিয়ে নতুন সৃষ্ট দেশ বাংলাদেশে তারা তাদের ফেলে যায়। পারভেজ জানিয়েছেন তিনি দু'বছর দিনাজপুর জেলে ছিলেন এবং তিনি যে বেঁচে আছেন সেটা তার পরম সৌভাগ্য। পারভেজ বলেন তার সাথে জেলে তারই মতো বাহাত্তর জন বিহারী আটক ছিল। তবে বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করায় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়ায় পারভেজ এখন স্থানীয় একজন নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি জানান ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তার একজন আত্মীয় ছিলেন যিনি যুদ্ধ শেষে খুলনায় অবস্থানকালে তার পরিবারের সকলকে ভারতে নিয়ে যান যার ফলে ১৯৭২ সালের ১০ মার্চ খুলনায় নিউ টাউন হল হত্যাকাণ্ডে তাদের কেউই নিহত হননি। পারভেজ আলমের পিতা ছিলেন বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ও তাদের পরিবার ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল।

দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের স্বদেশ হিসেবেই তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান নামের দেশটি। আশা করা হয়েছিল যে ভারতের পূর্ব অঞ্চলের কিছু মুসলমান পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য চলে যাবে। কিন্তু মাত্র বিশ বছরের মাথায় বাঙালিদের ভাষা ও জাতিগত পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে ভূখণ্ডে পরিবর্তন আসে এবং এর ফলে ১৯৭১ সালের শেষে এ অঞ্চলে তিনটি জাতি রাষ্ট্রের জন্ম হয়; কিন্তু সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বিহারী মুসলমানরা এ তিনটি রাষ্ট্রের কোনোটিতেই যাওয়ার জায়গা পায়নি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৯

শব্দ ও সংখ্যা

স্মৃতি ও দানবীয় উপকথা

'তুমি কি স্মরণ করতে পারো যখন তারা ১০০০ লাশ ও তাদের কবরের কথা বলেছিল এবং আমরা সেখানে কুঁড়িটি লাশও পাইনি?'

-মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী উইলিয়াম রজারস কে হেনরী কিসিঞ্জার[১]

'উভয় পক্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরা নিজেদের ক্ষুদ্র মতভেদকে দানবীয় উপকথায় পরিণত করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেই স্বপক্ষকে উপস্থাপন করা হয় নির্দোষ শিকার হিসেবে ও বিপক্ষকে আখ্যায়িত করা হয় গণহত্যাকারী রূপে।'

-মাইকেল ইগনেতিয়েফ, ব্লাড এন্ড বিলংগিং[২]

শব্দগুলো

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'খানসেনা' হিসেবে। সেনা অর্থ 'সৈনিক' বা 'যোদ্ধা' এবং 'খান' একটি ইসলামি খেতাব যা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের অনেকেরই ছিল ও আছে। প্রকৃতপক্ষে কয়েক শতাব্দি পূর্বে আমার নিজের পূর্ব পুরুষদের কেউ কেউ এ খেতাবটি ধারণ করেছিলেন।[৩] যা হোক, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশীদের বর্ণনায় 'খানসেনা' শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য প্রয়োগ করা হতো এবং এ শব্দটি বহন করত একটি তীব্র নেতিবাচক অর্থ। মজার ব্যাপার, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা যাদের আমি আমার এ গবেষণা কাজের জন্য সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম তারা মোটেও জানতেন না যে ১৯৭১ সালের সংঘাতের সময় বাঙালিরা তাদের সমষ্টিগতভাবে 'খানসেনা' হিসেবে আখ্যায়িত করতো।[৪] এ 'খানসেনা' শব্দটির ব্যবহার মনে হয় শুধুমাত্র বাংলাদেশী বাঙালিরাই নিজেদের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

অপর পক্ষে, প্রায় সকল পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা আমাকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা তাদের 'শালা পাঞ্জাবী' বা আরো খারাপভাবে 'বেজন্মা পাঞ্জাবী' বলে উল্লেখ করতো। যদিও সকল কর্মকর্তাই পাঞ্জাব প্রদেশের ছিলেন না। ১৯৭১ সালের সংঘাতের

www.pathagar.com

উপর প্রকাশিত প্রায় সকল বাংলাদেশী প্রকাশনা ও সাহিত্যে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের বিভিন্ন পশুর নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দটি ছিল 'পাঞ্জাবী কুকুর'। এদের সাথে একটি প্রাণীর নাম ব্যবহার করার অর্থই ছিল এদেরকে সর্বাধিক উপায়ে ব্যাঙ্গ করার প্রচেষ্টা।

অন্যান্য বিশেষণগুলো হলোঃ 'বর্বর', 'দস্যু', 'নরপিশাচ', 'নরপশু','স্বাপদ' ইত্যাদি। আবার প্রায়শই বিশেষ কিছু বিশেষন জুড়ে দেয়া হয়েছে পশুর নামের সাথে যেমন-' হিংস্র হায়েনা' ।বাংলাদেশের পল্লী এলাকার নাটক বা যাত্রার খলনায়কেরা যেমন 'উল্লাস' ও 'অট্টহাসি'র সাথে তাদের খল চরিত্র রূপায়ণ করেন তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও একই চরিত্রের ভিলেন হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের বর্ণনায় বাঙালি গেরিলা বা বিদ্রোহীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তুলনামূলক অনেক নমনীয় ভাষায় যেখানে তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'দুবৃত্ত','মুক্তি' অথবা বড়জোড় 'আওয়ামী লীগের দুবৃত্ত' হিসেবে।

সকল পক্ষ একে অপরকে চিহ্নিত বা চিত্রিত করায় যেভাবে পরিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ঢাকঢোল বাজিয়েছে তাতে একটি নিরপেক্ষ বা নিদেনপক্ষে একটি সহজ সরল বর্ণনা উপস্থাপন করার জন্য কতোগুলো বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে 'অফিসার/সৈনিক','সামরিক কর্তৃপক্ষ/জান্তা' অথবা 'বিদ্রোহী' এসব শব্দের সাথে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদানকারী বেসামরিক 'স্বেচ্ছাসেবক' এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সৈনিক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহকারী পুলিশদের বিষয়গুলো নিরপেক্ষতার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা উচিত।

ভারত-বাংলাদেশের বর্ণনায় ১৯৭১ সালের সংঘাতকে বলা হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধ' ও এ স্বাধীনতা অর্জনে বেসামরিক ব্যক্তি, আধা সামরিক ও সামরিক বাহিনীর সদস্য যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাদের বলা হয়েছে 'মুক্তিযোদ্ধা'। ১৯৭১ সালের সংঘাতকে অনেক বাংলাদেশী গৃহযুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করতে আপত্তি জানিয়েছেন, যদিও এটা ছিল বাস্তবতা। বহির্বিশ্বের অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তিও ওই সংঘাতকে গৃহযুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করেছেন এক ধরনের বিশ্বাস থেকে যে তা না হলে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলতে যা বোঝায় তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হবে। বাস্তবে দ্বিধাহীনচিত্তে এটা বলা যায় যে কিছু লোক যুদ্ধ করেছিল পাকিস্তান থেকে বের হয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করার লক্ষ্যে এবং অন্যদিকে সেটা ছিল ওই বছর পাকিস্তানের জন্য একটি গৃহযুদ্ধ যা পরিশেষে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি সার্বিক যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না বছরের শেষ দিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি সরকারিভাবে জন্মলাভ করে ততোক্ষণ পর্যন্ত ওই ভূখণ্ডটি কিন্তু ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ।

বাংলাদেশী সাহিত্য ও প্রকাশনায় বাঙালি বিদ্রোহীদের (মুক্তিযোদ্ধা) 'বীর','বাংলার দামাল ছেলেরা' ও 'বিচ্ছুরা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তান সমর্থিত বাঙালিদের উল্লেখ করা হয়েছে 'রাজাকার' হিসেবে যা মূলতঃ গালি হিসেবেই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্তি লাভ করে ইংল্যান্ড হয়ে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার উদ্দেশ্যে দেশে ফেরার পথে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন,[৫] 'রাজাকার কি?' ২৫ মার্চ রাত থেকে শেখ মুজিব কারাবন্দি থাকাকালীন সময়েই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে রাজাকার গঠন করেছিল। পাকিস্তান সরকারকে সে সময় যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল তাদের 'হানাদারদের সহযোগি',

www.pathagar.com

'দালাল' বা 'দোসর' ও এজাতীয় অন্যান্য 'সম্বোধনে' চিহ্নিত করা হয়েছে।[৬]

বাংলাদেশী বই পত্র, পত্র-পত্রিকা বা প্রায় সকল প্রকাশনার মাধ্যমগুলোতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে উল্লেখ করা হয়েছে একটা 'হানাদার বাহিনী' বা 'দখলদার বাহিনী' বলে। এটি হচ্ছে বাস্তবতার একটি নির্বোধ ও ভ্রান্ত উপস্থাপনা বা অপব্যাখ্যা। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল ও পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ১৯৪৭ সালে গঠিত হয়েছিল দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে। তখন পাকিস্তান গঠনে বাঙালি মুসলমানরাই পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও তাদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই ওই রাষ্ট্রটির জন্ম হয়। ওই নতুন দেশটিতে তাই অন্যান্য সব প্রদেশের মতো পূর্ব পাকিস্তানেও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। বাঙালিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বের ইউনিটগুলোতেও যেমন অন্তর্ভুক্ত ছিল তেমনি পরবর্তীতে বিশেষভাবে গঠিত বেঙ্গল রেজিমেন্টেও ছিল তাদের সরব উপস্থিতি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যেমন পূর্ব পাকিস্তানে চাকরি করতো তেমনি বাঙালি অফিসাররাও চাকরি করতো পশ্চিম পাকিস্তানে ।

বাঙালি যারা পরে সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে একটি স্বাধীন দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে এবং বাঙালি সেনারা পাকিস্তানী বাহিনীকে দখলদার বাহিনী বা আগ্রাসী বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করেছে যেন ওই পাকিস্তানী বাহিনী তাদের উপর হঠাৎ করেই উদয় হয়েছিল কোনো ভিন দেশের মাটি থেকে। এ ছাড়া অনেক বাঙালি বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে সমর্থন করেননি ও পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে বৈধ সরকার হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং কিছু বাঙালি সেনা কর্মকর্তা পাকিস্তানী ভূখণ্ডকে রক্ষার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থেকে গিয়ে পুরো সময়টা যুদ্ধ করেছেন। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে একটাই 'দলখলদার শক্তি' ছিল- আর তা হচ্ছে ভারত।

দৈত্যের ন্যায় শত্রু

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামকালে খলনায়ক হিসেবে জান্তার প্রতিকৃতি অংকন ও সযত্ন অলংকরণ বেশ কিছু মজার রূপ ধারণ করেছিল। এর একটি ছিল ভিজ্যুয়াল আর্ট। ওই সময়ের উল্লেখযোগ্য ও মনে রাখার মতো একটি সৃষ্টি ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ব্যাঙ্গাত্মক স্কেচ: ভ্রূকুটি করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ও দাঁত যেন ড্রাকুলার মতো, জেনারেল ইয়াহিয়ার এ স্কেচটি একটি যথার্থ দৈত্যেকেই যেন উপস্থাপন করেছিল। রাজনৈতিক ব্যাঙ্গত্মক শিল্প হিসেবে এটি ছিল অসাধারণ। প্রচারণা হিসেবে এ হাতিয়ারটি ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যকরী যা জেনারেল ইয়াহিয়া, তার সরকার ও সেনাবাহিনীকে উপস্থাপন করেছিল দৈত্যতুল্য করে ।

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক সরকারের প্রধান ছিলেন ও একক ব্যক্তি হিসেবে বাঙালি বিদ্রোহীদের ধ্বংসে সেনা অভিযানের নির্দেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত তিনিই দিয়েছেন, সে জন্য বাঙালি বিদ্রোহীদের দৃষ্টিতে তিনিই পরিগণিত হন দৈত্যের যথার্থ প্রতীকে। এরপরও এটাই অদৃষ্টের পরিহাস যে সকল দায়-দায়িত্ব তার কাঁধেই বর্তেছে যদিও পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া খান কখনোই বাঙালিদের বিরুদ্ধে পক্ষাপাতিত্ব সহ্য করেননি বা এ ধরনের কর্মকাণ্ডকেও প্রশ্রয় দেননি। অপরদিকে তিনি বাঙালিদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার কথা, সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে তাদের চাকরির বিষয়টিও আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েই 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-এর ভিত্তিতে নির্বাচন দিয়েছিলেন এবং গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

রাজনীতিতে বাঙালিরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে জেনেই নির্বাচনে রাজী হয়েছিলেন। নির্বাচনের পর মনে হয়েছিল যে তিনি বিজয়ী শেখ মুজিবের সাথে এক চমৎকার বোঝাপড়ার জন্য তৈরি ছিলেন যার জন্য তিনি প্রকাশ্যে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের 'ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী' বলেও উল্লেখ করেছিলেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো প্রমাণ ছাড়াই স্বাধীনতাকামী পক্ষ পাকসেনাদের দৈত্যদানব ও ভয়ংকর হিসেবে চিহ্নিত করার সব ধরনের পন্থাই অবলম্বন করেছে। নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের যথেচ্ছ হত্যা, মহিলাদের শ্লীলতাহানি, বিশেষ করে ধর্ষণ ও হত্যা এবং শিশু হত্যার ন্যায় অভিযোগগুলো হচ্ছে শত্রুর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর এক স্বাভাবিক পদ্ধতি। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে দেখা গেছে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেকস্থানেই নিরস্ত্র লোকদের হত্যা করেছে -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫/২৬ মার্চ, শাঁখারিপট্টিতে ২৬ মার্চ, রাজশাহীর থানাপাড়ায় ১৩ এপ্রিল, চুকনগরে ২০ মে, বড়ইতলায় ১৩ অক্টোবর তারা অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ সব স্থানে পাক বাহিনী যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাতে একটি বিশেষ ধরণ লক্ষ্য করা যায় যেখানে তারা কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করে, কিন্তু মহিলা ও শিশুদের ছেড়ে দেয়। মহিলা হত্যা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না বলেই মনে হয়, যে সব মহিলা তাদের গুলিতে মারা যায় তারা ছিল ক্রসফায়ারের শিকার।

এসব দুর্ঘটনার বর্ণনা যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাতে গুটি কয়েক সেনা সদস্যের কর্মকাণ্ড গোটা সেনাবাহিনী ও সে সময়কার শাসকগোষ্ঠীকে কলংকিত করার জন্য যথেষ্ট। যা হোক, 'দানবীয়করনের' যে প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয়েছে তাতে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার চেয়ে প্রচার করা হয়েছে অনেক বেশী। প্রকৃত ঘটনায় হতাহতের সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করা ছাড়াও অপ্রয়োজনীয় বিকৃত তথ্য প্রায়শই অবিশ্বাস্যভাবে স্বাধীনতার সমর্থিত বাঙালিরা উদাহরণ স্থাপন করে উল্লেখ করেছে, যার কিছু ছিল প্রকৃত ঘটনার বিকৃতরূপ, অন্যগুলো মনগড়া এবং এর বাইরেও বাঙালি স্বাধীনতাকামীদের 'বর্বরতার' অভিযানকে অনেকক্ষেত্রেই শত্রুপক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এগুলোর আসলে কোনো প্রয়োজনই ছিল না। বরং এসবকে অর্থহীন বিকৃতিকরণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এভাবে বিকৃতভাবে ঘটনাকে উপস্থাপন করা হয়েছে বলেই ১৯ মার্চে জয়দেবপুরের ঘটনাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত সাহিত্যে বা ইতিহাসে 'নিরস্ত্র জনসাধারণের' উপর সেনাবাহিনীর 'বেপরোয়া' গুলিবর্ষণের ঘটনা হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। অথচ এটি ছিল অস্ত্রসজ্জিত ও উত্তেজিত জনতা কর্তৃক উস্কানী প্রদানের প্রতিক্রিয়ায় ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনা।

একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫-২৬ মার্চ মহিলা হোস্টেলে মহিলাদের উপর পাক সেনাদের হামলার খবর ব্যাপকাকারে প্রচারিত হয়, কিন্তু পরে এটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ১ এপ্রিল যশোরে বাঙালিদের দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানী বেসামরিক লোকদের হত্যাকাণ্ডকেও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার করা হয়েছিল পাক সেনা দ্বারা ব্যাপকভাবে বাঙালি হত্যাকাণ্ড হিসেবে।[৭]

ঢাকার এতিমদের লাশ : আমার ঢাকা সফরকালে অনেক উত্থাপিত গল্পের একটি ছিল এরূপ- যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি এতিমখানায় বোমাবর্ষণ করে হত্যা করেছিল শত শত শিশুকে। এটি ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, কারণ সকল সংবাদ মাধ্যমের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে

www.pathagar.com

ডিসেম্বর মাসে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ঢাকা বিমানবন্দরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমাবর্ষণের ফলে ঢাকায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে গ্রাউণ্ডেড হয়ে গিয়েছিল এবং ঢাকার আকাশ এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল ভারতীয় বিমান বাহিনী। আমি এ বিষয়টি উল্লেখ করলে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশীরা উত্তর দেন যে তারা উড়োজাহাজের শব্দ শুনেছিলেন এবং তা অবশ্যই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ছিল যা দিয়ে তারা ওই এতিমখানায় বোমা ফেলেছিল।[৮]

আমার প্রশ্ন- কেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় এতিমখানায় বোমা নিক্ষেপ করবে যে শহর রক্ষায় তারা নিজেরাই ছিল ব্যস্ত এবং সে সময় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েই তাদের সৈন্যরা যুদ্ধ করছিল ভারতের সাথে। এর কোনো সঠিক উত্তর বাংলাদেশীদের জানা ছিল না, তবে অতি অবশ্যই পাকিস্তানীদের তারা নরপশু বা দৈত্য হিসেবে চিহ্নিত করায় মোটেই বিরতি দেয়নি। তাদের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ছিল কেবলই দৈত্যদানব।[৯]

এতিমখানায় বোমাবর্ষণ নিয়ে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে সে সময় খবর প্রচারিত হয়েছে যা অনেকেই দেখেছেন। ১৯৭১ সালের উপর বাংলাদেশ সরকার যে ধারাবাহিক বিবরণ প্রকাশ করেছেন তাতেও ওই বোমাবর্ষণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। ওই ধারাবাহিক বিবরণ নিশ্চিত করে যে নিশানা ভুল করে ভারতীয় বিমান বাহিনীই ঢাকায় এতিমখানায় বোমা ফেলেছিল। ১২ ডিসেম্বর সংখ্যা *দি অবজারভার*- 'ঢাকা ডায়েরী'তে ৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারের ঘটনা উল্লেখ করেছে এভাবে:

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ইসলামিক এতিমখানায়, আজ সকাল ৪টায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে সৃষ্ট আতংকিত পরিস্থিতির মধ্যে এতিমখানায় তিনশত ছোট ছেলে ও মেয়েরা ঘুমিয়ে ছিল। আমি ওই স্থানে সূর্য উঠার পর দেখেছি বোমা প্রত্যেককে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে, অধিকাংশই ছিল মৃত, রাতে বোমাবর্ষণ সত্যিকার অর্থেই ছিল ভয়াবহ এবং এখানে অযথাই বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। এ বোমাগুলোকে ফেলা হয়েছে বিমানবন্দরের রানওয়েকে উদ্দেশ্য করে।[১০]

দি টাইমস তার ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানায়, ঢাকায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর অব্যাহত হামলার কারণে একদল বিদেশী নাগরিককে কয়েক দফা ব্যর্থ চেষ্টার পর অবশেষে বিমানে করে ঢাকা থেকে কোলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে। 'তারা ঢাকায় একটি এতিমখানা ধ্বংসের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে ক'দিন আগে ৫টি ৫০০ পাউণ্ড থেকে ১০০০ পাউণ্ডের বোমা এতিমখানায় ফেলা হয় যা আসলে ফেলার কথা ছিল ১০৫ গজ দূরের রেলওয়ে ইয়ার্ডে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের দাবি ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ওই বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন। একজন জার্মান টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান বলেন তিনি ২০টি মৃতদেহ দেখেছেন, কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন ইটপাথর ও ভাঙ্গা দেয়ালের মধ্যে আরো অনেকে চাপা পড়েছিল।' [১১]

এ ছাড়াও ভারতীয় যুদ্ধ বিমানের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বেসামরিক অবস্থানের উপর গোলাবর্ষণের অসংখ্য ঘটনার নজির রয়েছে। *দি অবজারভার* -এর 'ঢাকা ডায়েরী'তে নারায়ণগঞ্জ থেকে পাঠানো খবরে বলা হয়; 'রাতে গোলাবর্ষণ, ভারতীয় যুদ্ধ বিমানের পাইলটরা নারায়ণগঞ্জের একটি পাওয়ার স্টেশন থেকে আধা-মাইল দূরের হতোদরিদ্রদের একটি আবাসিক এলাকার উপর বোমা বর্ষণ করলে চারশ' থেকে পাঁচশ' সাধারণ মানুষ নিহত হন ও আহতাবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দেড়শ' জন।'[১২] জাহানারা ইমাম তার 'ডায়েরীতে' লিপিবদ্ধ

www.pathagar.com

করেছেন ১৪ ডিসেম্বর যেদিন তার স্বামীকে দাফন করা হয় সেদিন ঢাকায় প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল যার ফলে বেসামরিক মানুষ মারা যাওয়া ছাড়াও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় তার বাসার চারদিকের প্রতিবেশীদের।[১৩]

জাতিগত ঘৃণার স্বাদেশীকতা : ইতোপূর্বে এ বইয়ে দেখানো হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহীরা খোলাখুলিভাবে সংগ্রামে নেমে পড়েছিল ও খুব দ্রুত অবাঙালি, বিহারী, পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রকমের হিংস্রতা ও ঘৃণা প্রকাশ করেছিল, বিশেষভাবে বিহারীদের প্রতি যারা ভারত থেকে এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল, অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস তারাই ছিল সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে জাতিগত দাঙ্গা উন্মুক্ত হয়ে গেলে জবাই করা হয় অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশুদের। দৃষ্টান্ত দিয়ে খুলনা পাট কল, কর্ণফুলী পেপার মিল, চট্টগ্রামের হাউজিং এলাকা ও সান্তাহারের হত্যাকাণ্ডের কথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে। যশোরে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহে বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা সংখ্যার বিচারে অনেক কম তাদের পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মী ও তাদের পরিবার-পরিজনদের নির্বিচারে হত্যা করেছে বিভিন্ন ইউনিটে। খুনের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহতভাবে চলেছে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরেও, যেমন খুলনার জুট মিলগুলোর বিভিন্ন কলোনীতে। জাতীয়তার ভিত্তিতে যত্রতত্র হত্যা করা হয়েছে নারী, পুরুষ ও শিশুদের।

ভয়াবহ নৃশংসতার ঘটনা বাঙালিদের নিজেদের মধ্যেও ঘটেছে। যারা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তাদের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বিপরীত পক্ষের যারা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করতে যুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঠিক পূর্ব মূহূর্তে পাকিস্তান সরকার সমর্থিত আল্ বদর ডেথ স্কোয়াড দ্বারা স্বাধীনতার সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যাকাণ্ড নি:সন্দেহে ১৯৭১ সালের সংঘর্ষের অন্যতম জঘন্য হত্যাকাণ্ড। ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও তাদের নির্মূল করা যেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক মাইলফলক। ১৯৭১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা সমর্থক বাঙালিরা ছিল সুবিধাজনক অবস্থানে এবং তারপর বিহারী ও পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যপোষণকারি বাঙালিরা ওই বছরের শেষ সময় পর্যন্ত প্রতিপক্ষ অপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে বদলা নেয়। এরপর ভারতীয় অভিযান ও বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর আর এক দফা বদলা নেয় স্বাধীনতার পক্ষের সমর্থকরা। অপরাধীদের বিচারের আওতায় না আনার ফলে বাংলাদেশের রাজ-নীতিতে প্রতিহিংসার সাংস্কৃতি থেকেই গেছে।

বাংলায় সদাশয় 'বেলুচিরা'

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ একটি জাতিগত ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদ যার উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল সেই পূর্বের ধারণাটাকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয়। মনে হয়েছে ১৯৭১ সালের সংঘর্ষটি সম্পূর্ণরূপে জাতিগত দ্বন্দ্বের কারণেই ঘটেছে যেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে। যারা অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার সমর্থক ছিলেন তাদের সাথে যারা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করছিল তাদের যে রাজনৈতিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা

www.pathagar.com

নিছক পশ্চিম পাকিস্তান বনাম পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধ ছিল না বরং এটি রূপান্তরিত হয়েছিল বাঙালি ও পাঞ্জাবীদের মধ্যকার সংঘর্ষে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভাষা সাহিত্যে 'পাঞ্জাবী' শব্দ একটি নিন্দাসূচক শব্দ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সকল পশ্চিম পাকিস্তানীকেই এ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যদিও সকল পশ্চিম পাকিস্তানীই জাতিগত পরিচয়ে পাঞ্জাবী ছিলেন না। আবার বিহারী মুসলমান যারা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ বিহার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে তাদের পাঞ্জাবীদের মিত্র ও বাঙালিদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ বিষয়ে আমার গবেষণায় যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ বের হয়ে আসে তা হচ্ছে বাঙালি জাতী-য়তাবাদীরা 'বেলুচি' নামে একটি জাতিগত গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করেছেন যাদের পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের মধ্যে অধিক দয়াবান অর্থাৎ মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। বেলুচিরা পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের অধিবাসী যাদের রয়েছে নিজস্ব বিদ্রোহীসুলভ ইতিহাস। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে যাদেরই আমি সাক্ষাতকার নিয়েছি তাদের প্রত্যেকে আমাকে বলেন যে বেলুচি সেনারা পশ্চিম পাকিস্তানী অন্য সেনাদের চেয়ে অনেক ভালো ও ১৯৭১ সালে বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। ১৯৭১ সালের উপর অনেক বাংলাদেশীর স্মৃতিচারণেও বেলুচি সেনা কর্মকর্তা বা সৈনিকদের ভালো আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মাহমুদা বেগম গিনী সে সময় কিশোরী ছিলেন যখন তাকেসহ অন্যান্য মহিলাদের পুরুষদের থেকে আলাদা করা হয়েছিল ১৩ এপ্রিল রাজশাহীর থানাপাড়ায় নদীর তীরে, গিনী আমাকে দেয়া তার বর্ণনায় জানিয়েছেন যে ক'জন সৈনিক যারা মহিলাদের সেদিন পাহারা দিয়ে রেখেছিল তারা সকলেই হতাশাগ্রস্ত ছিল এবং মহিলাদের শোকাতুর অবস্থায় দেখে তাদের চোখে পানি এসেছিল। এরপর মহিলা ও শিশুদের বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। এতো সব হত্যাকাণ্ডের পরও গিনী আমাকে তার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন সব পাকিস্তানী সেনাই খারাপ ছিল না, বেলুচ সৈন্যরা ছিল অনেক দয়ালু।[১৪]

মাহমুদা বেগমের স্বামী রায়হান আলী একটি দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে আমাকে বলেছেন- ১৯৭১ সালে রায়হানের বয়স যখন ১২ বছর সে সময় একদিন তাকে বাড়ি থেকে দু'জন পাক সেনা ধরে নিয়ে তাদের বাংকার নির্মাণের কাজে লাগিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর একজন অফিসার (যাকে রায়হান বেলুচি মনে করেছিল) এসে তাকে ওই কাজে কে লাগিয়েছে তা রায়হানের কাছে জানতে চান। সেই দু'জন সেনাকে ওই অফিসারটি যথেষ্ট বকাবকি করেছিলেন, এরপর রায়হানকে কিছু টাকা দিয়ে বলেছিলেন বাড়ি ফিরে যেতে ।[১৫]

ঢাকার গেরিলা গ্রুপের আবুল বারক আলভী ও তার সহযোদ্ধাদের ঢাকায় এমপি হোস্টেলে অবস্থিত সামরিক আদালতে জেরা করার সময় ও নির্যাতন চালানোর পর তাদের কোনো কিছু খেতে দেয়া হয়নি এমনকি পানিও দেয়া হয়নি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই একজন বয়স্ক সৈনিক তাদের রুটি খেতে দেন। আলভীর ধারণায় সৈনিকটি ছিল বেলুচি।[১৬]

চট্টগ্রামে প্রবর্তক সংঘ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের জলধর সেনগুপ্ত লিখেছেন তিনিসহ কয়েকজন ২০ মে ধলঘাটে অবস্থিত তাদের একটি কেন্দ্রে আশ্রয় নিলে সেখানে পাঁচজন পাকিস্তানী সৈনিক এসে উপস্থিত হয়। তিনি বলেন, 'পাকসেনারা আমাদের সেখানকার স্কুলের মাঠে বসতে বলে। পাক সেনাদের পাঁচজনের তিনজন বেলুচ সেনা আমাদের বলে আমরা নিরস্ত্র বয়স্ক লোকদের গুলি করবো না এবং এরপর তারা ওই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। বাকী দু'জন পাঞ্জাবী সেনার একজন আমাদের উপর গুলি ছুঁড়েছিল।[১৭]

www.pathagar.com

২৯ মার্চ রাতে কুমিল্লায় তাদের বাড়িতে কিভাবে পাক সেনারা ঢুকে পড়ে তার এক ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছেন প্রতীতি দেবী। পাক সেনারা তার বয়স্ক শ্বশুর রাজনীতিবিদ ও আইন পরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও তার দেবর দীলিপকে ধরে নিয়ে যায় যারা আর কোনোদিন ফিরে আসেননি। তাদের বাড়িতে সম্পূর্ণ তল্লাশি চলাকালীন তাকে ও তার কন্যাকে একটি ঘরে থাকতে বলা হয় এবং 'বাড়ি থেকে সর্বশেষ সৈনিক চলে যাওয়া পর্যন্ত একজন তরুণ বালুচ ক্যাপ্টেন সে ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে ওই একটি তরুণ বেলুচের জন্যই আমার কন্যা এরোমা ও আমি সেদিন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।'[১৮]

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এতো বেশি সংখ্যক বেলুচির উপস্থিতি অনেকটা বিস্ময়কর বলেই মনে হয়েছে, কারণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ঐতিহাসিকভাবে জাতিগত বেলুচি সেনার আনুপাতিক হার বরাবরই অত্যন্ত কম।

পূর্ব পাকিস্তানে সে সময় বেলুচ রেজিমেন্ট ছিল, কিন্তু বেলুচ রেজিমেন্ট শুধুমাত্র জাতিগত বেলুচি দ্বারা গঠিত ছিল না; বরং অধিকাংশ সেনা সদস্য ছিল পাঞ্জাবী ও পাঠান। প্রকৃতপক্ষে আমি পাকিস্তানে যাদের সাক্ষাতকার নিয়েছি তারা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে আমাকে বলেছেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্য যে রেজিমেন্টেগুলো পূর্ব পাকিস্তানে ছিল তাদের সাথে বেলুচিরা ছিল না। এ ছাড়া অন্য একটি জাতিগত গোষ্ঠীকেও সহানুভূতিশীল ও ভালো আচরণের জন্য প্রশংসা করেছেন বাঙালিরা, যারা ছিল ছিল জাতীয়তার পরিচয়ে পাঠান।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে অবশ্যই অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে অনেক জাতিগত পাঠান ছিল। এখানে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যাকে বাঙালিরা দৈত্য-দানবের সাথে তুলনা করেছেন, সেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ছিলেন একজন পারসী ভাষাভাষী পাঠান। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জে. আমির আবদুলাহ খান নিয়াজী ছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী একজন পাঠান। লে. জে. (ব্রিগেডিয়ার) জাহানজেব আরবাব যিনি ৫৭ ব্রিগেড-এর নেতৃত্বে ছিলেন এবং ঢাকা ও রাজশাহীতে মার্চ/এপ্রিল মাসে সামরিক অভিযানে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন তিনিও ছিলেন একজন পাঠান। অপরপক্ষে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের চোখে বীর ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইষ্টার্ন কমান্ডার লে. জে. জগজিত সিংহ অরোরা একজন পাঞ্জাবী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবী সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিক রয়েছে অনেক বেশি সংখ্যক।

এখন কথা হচ্ছে যদি পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনীতে জাতিগত বেলুচি অতো বেশি সংখ্যায় নাই থেকে থাকে তাহলে ওইসব 'রহস্যজনক বেলুচি' কারা ছিল যারা বিদ্রোহী ও সাধারণ বাঙালিদের সাথে ভাল আচরণ করে পাক সামরিক জান্তাকে আরো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছিল? যুক্তিসংগত উত্তর হচ্ছে-বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করা ছাড়া অন্য কোথাও বেলুচি ছিল না। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সংঘাত ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক যুদ্ধ যেটাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা একটি সুস্পষ্ট জাতি ও ভাষাগত দ্বন্দ্বের রূপ দিয়েছিল। সুস্পষ্টভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালের সংঘাত ছিল নিছক রাজনৈতিক যুদ্ধ: একদিকে পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম ও অপরদিকে স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি করার জন্য পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার যুদ্ধ। সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা এটাকে জাতিগত সংঘর্ষ হিসেবেই বিবেচনা করেছে- যেন তা ছিল (স্বাধীনতাকামী,

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক) বাঙালি বনাম (উপনিবেশবাদী,নিবর্তবাদী) পাঞ্জাবী'র লড়াই। ভাষা ও জাতিগত ভিত্তিতে নতুনভাবে সঙ্গায়িত পরিচয় দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমান 'জাতি'র আবাসভূমিতে মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় সংঘাত- সংঘর্ষে। বৈষম্য, অংশীদারিত্ব, যুক্তরাষ্ট্রবাদ বা ফেডারেলিজম ও স্বায়ত্তশাসন- এর মতো ইস্যুগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে একতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে লড়াইয়ের জন্ম দেয়। পরে তা পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানী বনাম পূর্ব পাকিস্তানীর মধ্যকার সংঘাত ও দ্বন্দ্বে। সর্বশেষে এর পরিসর আরো ছোট হয়ে এসে তা দাড়ায় 'পাঞ্জাবী' ('বিহারী' সহ) বনাম 'বাঙালি'র যুদ্ধে।

রাজনীতির পরিবর্তে জাতিগত বিবেচনাকে মুখ্য করে সংঘর্ষের যে ধারনার সৃষ্টি হয়েছে তাতে 'দানবিক' শত্রুর মধ্যে কোন 'ভালো মানুষ'- এর উপস্থিতি যেন এক বিশেষ সমস্যার জন্ম দিয়েছে। 'শালা পাঞ্জাবীদের' ভিতরে ব্যতিক্রমী অল্প ক'জন ভালো মানুষ আছে শুধু একথা বলে বাঙালি জাতয়িতাবাদীরা পাঞ্জাবীদের সম্পর্কে তাদের ধারনা প্রকাশ করলেই চলতো, কিন্তু তার পরিবর্তে তারা পাঞ্জাবীদের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন জাতিগত গোষ্ঠীকেই যেন আবিস্কার করেছে। অন্যদিকে বেলুচিস্তানকে পছন্দের কারণ হতে পারে যে বাঙালিরা বেলুচিদের মনে করেছে তাদেরই মতো নির্যাতিত ও বিদ্রোহী একটি প্রদেশের অধিবাসী হিসেবে। একাত্মবোধের হয়তো আরো একটা কারন ছিল- জেনারেল টিক্কা খান; যাকে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্ণর হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ও যিনি সেখানে সেনা অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি এর আগে বেলুচিস্তানে বিদ্রোহ দমনের জন্য পরিচিতি পেয়েছিলেন 'বেলুচিস্তানের কসাই' হিসেবে।

কিভাবে বেলুচিদের সম্পর্কে এ অবাস্তব ধারনা বাঙালিদের আচ্ছন্ন করেছিল তা স্পষ্ট নয়। তবে বাঙালিরা হচ্ছে আশ্চর্যরকম গল্পবাগিস ও তাদের মাঝে গুজব ছড়ায় খুব দ্রুত। বিদ্রোহীরা জাতি ও ভাষাগত পরিচিতির ছাপ লাগিয়ে সংঘাতটিকে নতুন রূপ দান করায় এতোটাই সফল হয়েছিল যে এর শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছিল সুদূর গ্রাম পর্যন্ত। তাই দেখা যায় রাজশাহী জেলার থানাপাড়ায় ১৩ এপ্রিল পুরুষ গ্রামবাসীদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে গ্রামবাসী আমাকে বলেছিল যে যেখানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেখানে তা করেছে একজন 'পাঞ্জাবী'। আর অন্য যে জায়গায় ভিন্ন এক অফিসার গিয়েছিলেন যেখানে কোন হত্যাকাণ্ড হয়নি সেই অফিসারটি ছিলেন 'পাঠান'। গ্রামবাসী এমন ব্যাখ্যা দিয়েছিল কেবলমাত্র তাদের ধারনার উপর ভিত্তি করে,সেখানে তাদের কাছে কিন্তু এ সম্পর্কে কোন তথ্য প্রমাণ ছিল না।

এ বইটির জন্য বিশেষ ঘটনাবলীর উপর গবেষণা চালানোর সময় আমি ২৭ বালুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সামাদ আলি নামে একজন পাকিস্তানী অফিসারের পরিচয় জানতে পারি যিনি ছিলেন বেলুচিস্তানের অধিবাসী ও ওই অফিসারটিকে তার কোম্পানীর সাথে ২৫-২৬ মার্চ কুষ্টিয়া পাঠানো হয়েছিল। লে. আতাউলাহ্ শাহ যিনি ক্যাপ্টেন সামাদের সাথে কুষ্টিয়ায় ছিলেন, আমাকে জানিয়েছেন ক্যাপ্টেন সামাদ ছিলেন বালুচিস্তানের 'হাজারা' গোত্রভুক্ত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, লে. আতাউলাহ ২৯ মার্চ রাতে কুষ্টিয়ায় চার জন অফিসারসহ ১৫৫ জন পাক সেনার মধ্যে বেঁচে যাওয়া ১১ জনের একজন। ওই রাতে তারা তাদের মূল ঘাটি যশোরে ফিরে যাবার পথে গেরিলাদের এ্যামবুশের মুখে পড়েছিলেন। সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যখন পশ্চিম পাকিস্তানী একজন বেলুচিকে মুঠোর মধ্যে পায় তখন তারা কি করেছিল? তাকে তো তারা ছেড়ে দেয়নি। বরং লে. আতাউল্লাহ যিনি

www.pathagar.com

ওই নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার ভাষ্য মতে, বাঙালিরা এ্যামবুশের পর ক্যাপ্টেন সামাদকে ধরে ফেলে নিয়ে যায় নদীর পাড়ে ও সেখানে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।[১৯]

সংখ্যা

বিচ্ছিন্নতার পক্ষে জনসমর্থন : পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনী ফলাফলকে বাংলাদেশ সৃষ্টির পক্ষে প্রায় তর্কাতিতভাবে ব্যাপক সমর্থনের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুর্ব পাকিস্তানে সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের ৭৫ ভাগ ভোট পায় ও ওই প্রদেশে ১৬২টি আসনের ১৬০টিতে জয়লাভ করে।[২০] নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে এ রায়টি ছিল সকল বিতর্ককে স্তব্ধ করার জন্য যথেষ্ট। পাকিস্তানের- বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বীকার করেছেন ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনটি ছিল অবাধ ও নিরপেক্ষ ও যে কেউই আশা করেছিলেন যে তুলনামূলক বেশি ভোট প্রদান করা (Vote Casting / voter turnout) হয়েছে। তারপরও আশ্চর্যজনকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৫৬ ভাগ ভোটার তাদের ভোট প্রদান করেন যেখানে অন্য দু'টি প্রদেশে ভোট প্রদানের হার ছিল অনেক বেশি। পাঞ্জাবে তা ছিল ৬৬ ভাগ, সিন্ধুতে ৫৮ ভাগ। অন্যদিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪৭ ভাগ ও বেলুচিস্তানে ৩৯ ভাগের চেয়ে কিছু বেশি ভোগ প্রদান করা হয়। অর্থাৎ এতে পূর্ব পাকিস্তানে ৪৪ ভাগ ভোট দাতা ওই নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না অথবা ওই ভোটারদের ভোট দানে বাধা সৃষ্টি করা হয় বা নিরুৎসাহীত করা হয়।

পুর্ব পাকিস্তানে যারা ভোট প্রদান করেন তাদের তিন-চর্তুথাংশ ভোট দিয়েছিল আওয়ামী লীগকে এবং নির্বাচনের দিন আওয়ামী লীগ তাদের পক্ষে ভোট প্রদান নিশ্চিত করায় অর্জন করেছিল ব্যাপক সফলতা। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৫৬ ভাগ ভোটার তাদের ভোট প্রদান করেন সে হিসেবে আওয়ামী লীগ একক দল হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পায় মোট ভোটের ৪২ ভাগ ভোট। আবার এ ৪২ ভাগ ভোটারই যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার জন্য রায় দিয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। ভোটারদের তুলনামূলক কম উপস্থিতি থেকে আন্দাজ করা যায় যে ভোটাররা ওই নির্বাচনকে বিচ্ছিন্নতার পক্ষে একটি গণভোট রূপে বিবেচনা করেননি। নির্বাচনী প্রচারণায়ও শেখ মুজিব কখনোই মূল ফেডারেশন থেকে পুর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কথা কোথাও বলেননি। তবে হ্যাঁ যারা শেখ মুজিবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাদের অনেক অভিযোগ ছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, তারা চেয়েছিলেন পরিবর্তন, বৈষম্যের অবসান ও অধিক স্বায়ত্তশাসন।কেবলমাত্র অজানা একটি ক্ষুদ্র অংশ হয়তো সে সময় সরাসরি বিচ্ছিন্নতা কামনা করেছিল।

একইভাবে মোট ভোটারের ৫৮ ভাগ যারা শেখ মুজিবকে ভোট দেননি তারা হয়তো ভোটের দিন বাড়িতেই অবস্থান করেছেন অথবা অন্যান্য দলকে ভোট দিয়েছেন। এরাও যে আবার সাম্যাবস্থা বা স্ট্যাটাস ক্যু' বজায় রাখার পক্ষে মত প্রদান করেন তা নাও হতে পারে। তারাও অন্যান্য ভোটারের মনের ক্ষোভের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন তবে শেখ মুজিব বা তার দলকে সমস্যা সমাধানে সঠিক সমাধান বলে মনে করেননি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রকাশনা বা সাহিত্যে একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বিষয় হচ্ছে 'রাজাকার' বা 'কোলাবরেটরস' শব্দের ব্যাপক বিকৃত উপস্থিতি। রাজাকার বা কোলাবরেটর (সহযোগী) হচ্ছে সে সব বাঙালি যারা পাকিস্তানের দুই অংশকে সংযুক্ত রাখতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিল এবং তারা চাননি যে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক। এককভাবে বাংলাদেশীদের

www.pathagar.com

স্মৃতিচারনমূলক রচনার তের খণ্ড- 'স্মৃতি ১৯৭১' ও অন্যান্য সকল 'স্বাধীনতার পক্ষের' সাহিত্য অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে থাকা ও জান্তার সমর্থকদের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এসব সাহিত্যে তাদের খুব নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে; যেন তারা স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দেয়নি, 'মুক্তিযোদ্ধাদের' ব্যাপারে পাক কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহ করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেফতার করেছে, পাক সেনাদের কাছে হস্তান্তর করেছে, আটকে রেখেছে, এমনকি তাদের (মুক্তিযোদ্ধাদের) হত্যা করেছে। বলা যায় উল্লেখিত সাহিত্যে,প্রকাশনায় এধরনের চরিত্র প্রত্যেকটি ঘটনায়,প্রত্যেকটি গল্পে, প্রত্যেকটি গ্রামে ও প্রত্যেক প্রতিবেশীর মাঝেই যেন উপস্থিত রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে,বর্ণনা করা হয়েছে। হতে পারে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় 'রাজাকাররা' ছিল কেবলমাত্র একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেনী, কিন্তু তারা সহ স্বাধীনতার পক্ষের সক্রিয় যোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক বিভাজনের সবদিকেই সমর্থক কর্মীবাহিনী ছিল। তবে এমন অনেক মানুষ ছিলেন যারা নীরবে ওইসব (রাজাকার বা মুক্তিযোদ্ধা উভয় শ্রেণী) রাজনৈতিক পক্ষের মতাদর্শকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। আবার একটি বিশাল অংশ দৃঢ়ভাবে এ পক্ষ ও পক্ষ- কোনো পক্ষের সাথেই ছিলেন না।বাংলাদেশী 'স্বাধীনতার পক্ষের' সাহিত্যে নিরন্তর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে পাকিস্তানপন্থী বা তাদের দোসরদের স্বাধীন বাংলাদেশে দ্রুত পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং তারা উচ্চ সরকারী পদে ও প্রভাবশালী আসনে বসার সুযোগ পেয়েছে। এতে এটাই প্রমান হয় যে বাংলাদেশ সৃষ্টির সক্রিয় সমর্থনের বিরোধী এমনকি ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার সক্রিয় বিরোধীতা বহু বাংলাদেশীর কাছে 'বৃহৎ কোনো' অপরাধ বলে স্বীকৃতি পায়নি। এমনকি যারা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক শোষনের ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন তারা হয়তো বিশ বছর পূর্বে অর্জিত একটি 'মাতৃভূমি' থেকে তাৎক্ষণিক ও হঠাৎ বিচ্ছিন্নতায় হতবাক হয়ে পড়েছিলেন ও তা মেনে নিতে পারেননি। তারা হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষন থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, কামনা করেছিলেন সমানাধিকার কিন্তু বিচ্ছিন্নতা তাদের কাম্য ছিল না।

যুদ্ধের দিনক্ষণ: ১৯৭১ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার তারিখটি একটি বিতর্কের বিষয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ঘোষণা করা তারিখটি ছিল ৩ ডিসেম্বর যেটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রচলিত, কিন্তু মূলত: এ তারিখটি হচ্ছে ভারতের পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধ শুরুর তারিখ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে ভারতের সংশ্লিষ্টতা শুরু হয়-এর অনেক পূর্বেই- মার্চ মাসের প্রথম থেকে এবং পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারত সম্ভবত জড়িয়ে পড়েছিল তারও বেশ আগে। অগনিণ মুক্তিযুদ্ধ সমর্থক বাংলাদেশী ভারতের সাথে সার্বক্ষণিক নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাদের দেয়া বিভিন্ন বিবৃতি ও বর্ণনায়। অনেক পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তার কাছ থেকে জেনেছি যে ভারতীয়রা ওই বছরের প্রথম দিক থেকেই পুর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। ১৯৭১ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর *দি গার্ডিয়ান* এর একজন বাঙালি বংশোদ্ভুত প্রতিবেদক তার এক গাইডসহ ভারতে মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করে ও পূর্ব পাকিস্তান ঘুড়ে এসে তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে 'পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে বড় অভিযানগুলো সব সময় ভারতীয়রাই পরিচালনা করছে।' তিনি যে সীমান্ত এলাকা সফর করেন সেখানে শত শত বাঙালি 'স্বেচ্ছাসেবকদের' উপস্থিতি থাকলেও ওই সময় পর্যন্ত মাত্র ছয় জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল এবং কেবলমাত্র তিন জন অংশ নিয়েছিল কোনো অভিযানে।[১]

www.pathagar.com

কাজেই সর্বাত্মক যুদ্ধ পূর্ব পাকিস্তানে আরম্ভ হয়েছিল ৩ ডিসেম্বর-এর অনেক আগেই। ইষ্টার্ণ কমান্ডার জেনারেল নিয়াজী ভারতের 'লাইটনিং ক্যাম্পেইন' বা বিদ্যুৎগতির অভিযান সম্পর্কিত দাবির প্রেক্ষিতে এতোটাই বিস্মিত হন যে, তিনি যুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণের সময় নিয়ে তার বইয়ে একটি পৃথক অধ্যায় রচনা করেন 'যুদ্ধের তারিখ' বা 'দি ডেট অব দি ওয়ার' শিরোনামে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন,'১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসের ২০/২১ তারিখ রাতে ভারতীয় বাহিনী চারদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে।' [২২] জেনারেল নিয়াজীর এ দাবিকে সমর্থন করেছেন মার্কিন গবেষক সিসন ও রোজ তাদের গবেষণায়। এ দুই মার্কিন লেখক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভারতীয়রা ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয় ও সে অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে একটি সার্বিক কর্মপন্থা অবলম্বন করে। 'এ ব্যাপারে মার্কিন সরকারের মূল্যায়ন ছিল সঠিক যেখানে তারা বিশ্বাস করেছিল যে ইন্দিরা গান্ধী যখন নভেম্বরের প্রথম দিকে ওয়াশিংটন সফরে আসার কথা তার পূর্বেই ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদিও তখন পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী ভান করছিলেন যে তিনি একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজছেন।'

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্রোহী বাহিনীকে ভারতের সহযোগিতা প্রদান তেমন কাজে লাগেনি বরং বলা যায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কারণ 'মুক্তিবাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গতিরোধ করতে পারেনি। পাক সেনারা তখন তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব পাকিস্তানে ভারত সীমান্তের প্রায় সকল শহর ও অধিকাংশ গ্রাম এলাকায় । দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতের কৌশল ও কর্মসূচি ছিল জুলাই মাস থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত যখন তারা মুক্তিবাহিনীকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে ও মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রমে ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। এ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর অভিযানে ছদ্মবেশে ভারতীয় বাহিনীর অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যেখানে প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে।'

পরবর্তী পর্যায় ছিল মধ্য অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর ব্যাপী। সিসন ও রোজের মতে সেসময় ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী, ট্যাংক ও বিমান বাহিনীকেও ব্যবহার করা হয় পূর্ণমাত্রায়।' অভিযানের লক্ষ্যবস্তু মুক্তি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর ভারতীয় সেনা ইউনিটগুলোকে ভারতীয় ভূখণ্ডে ফিরিয়ে নেয়া হতো, যদিও ওই সময় এ ব্যবস্থা ছিল স্বল্পকালীন সময়ের জন্য এবং কৌশলগত কারণ বিবেচনা করেই এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। তবে পাক সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালালে মুক্তিবাহিনী কদাচিৎ তাদের অবস্থান ধরে রাখতে পারতো যা ভারতীয়দের বিরক্তির কারন হয়ে দাঁড়ায়।'

'২১ নভেম্বর রাতের পর রণকৌশলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়- ভারতীয় বাহিনীকে আর পিছনে সরিয়ে আনা হয়নি। ২১ থেকে ২৫ নভেম্বর কয়েকটি ভারতীয় ডিভিশনকে ছোট ছোট কৌশলগত দলে ভাগ করা হয় ও পূর্ব পাকিস্তানের সকল গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় ট্যাংক ও জঙ্গি বিমানের সহায়তা নিয়ে একযোগে চালানো হয় সামরিক হামলা।'[২৩]

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ প্রসঙ্গে সিসন ও রোজ লিখেছেন, 'ভারত সরকার অত্যন্ত স্বস্তি লাভ করে ও আনন্দের সাথে বিস্মিত হয় যখন প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান গরিমসি করার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে

www.pathagar.com

তাদের বিমান বাহিনীকে ৩ ডিসেম্বর উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রধান বিমান ঘাটিগুলোতে হামলা করার নির্দেশ প্রদান করে।'[২৪] দু'সপ্তাহ ধরে অব্যাহত নিষ্ক্রিয়তা পাকিস্তানের চিরায়ত কৌশলগত মতবাদকেই অস্বীকার করেছিল যেখানে তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনায় বলা হতো যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তনের উপর নির্ভরশীল। এতো কিছুর পরও অদ্ভুত গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে-জেনারেল নিয়াজী নিশ্চিত করে বলেছেন তাকে না জানিয়ে বা তার সাথে কোনোধরনের পরামর্শ ছাড়াই পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবশেষে ৩ ডিসেম্বর পশ্চিম রণাঙ্গনে হামলা চালায়, অথচ ইষ্টার্ণ কমান্ড ইতোমধ্যেই পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধবন্দি: ১৯৭১ সালের যুদ্ধের আরো একটি উল্লেখযোগ্য 'সংখ্যা' হলো '৯৩,০০০ পাকিস্তানী সৈন্য'র প্রসঙ্গটি যাদের ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষে বন্দি করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। যুদ্ধবন্দি সৈন্যের এ সংখ্যাটি একাধিকবার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, বাস্তবে ও সব ধরনের প্রকাশনায় সত্য হিসেবে মেনে নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এ সংখ্যাটিকে কখনোই চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। বিষয়টি মোটেই সাধারণ কোনো বিষয় নয়, কারণ ভারতের মাটিতে পাকিস্তানী বন্দি সেনাদের সংখ্যাটি অবশ্যই হতে হবে সঠিক সংখ্যা, এখানে 'প্রায়' জাতীয় শব্দ দ্বারা সংখ্যাটি প্রকাশ করা কোনোভাবেই উচিত নয়। তারপরও ৯৩,০০০ পাকিস্তানী সেনাকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়নি অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কোনোভাবেই বন্দি সেনাদের সংখ্যা ৯৩,০০০ ছিল না।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২,০০০।[২৫] সংকট মোকাবিলায় আরো সৈন্য আনা হয়েছিল ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লে. জে. এ. এ. কে নিয়াজি এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'আমার হাতে মোট সৈনিক বা যোদ্ধা ছিল ৪৫,০০০, এরমাঝে ৩৪,০০০ ছিল সেনাবাহিনী থেকে ও ১১,০০০ ছিল সিএএফ (সিভিল আর্মড ফোর্সেস-প্যারা মিলিটারী) ও পশ্চিম পাকিস্তানী বেসামরিক পুলিশ ও অস্ত্রধারী নন-কমব্যাট্যান্টস।' ৩৪,০০০ নিয়মিত সেনার মধ্যে ২৩,০০০ ছিল পদাতিক বাহিনীর সৈন্য, বাকীরা ছিল সাজোয়া, গোলন্দাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যালস ও অন্যান্য সহায়ক বাহিনীর।[২৬]

তাহলে কীভাবে ৩৪,০০০ সেনা সদস্য ও ১১,০০০ বেসামরিক পুলিশ ও অন্যদেরসহ মোট ৪৫,০০০ সদস্যের বাহিনী দ্বিগুণেরও বেশি '৯৩,০০০ সৈন্য' হয়ে ডিসেম্বর মাসে ভারতে যায় যুদ্ধবন্দি হিসেবে?

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঠিক সংখ্যার বিষয়ে জেনারেল নিয়াজি লিখেছেন:

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩৪,০০০; রেঞ্জারস, স্কাউটস, মিলিশিয়া ও বেসামরিক পুলিশ মিলে ছিল ১১,০০০ জন, সব যোগ করে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৪৫,০০০- এ। আমরা যদি-এর সাথে নৌ ও বিমান বাহিনীর ডিটাচম্যান্টস ও সকল পোশাকধারী যারা ফ্রি রেশন পেতো যেমন- মার্শাল ল' হেডকোয়ার্টার, ডিপোসমূহ, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কশপ, কারখানা, নার্স, মহিলা ডাক্তার, নাপিত, বাবুর্চি, মুচি ও ঝাড়ুদার-এর সংখ্যা যোগ করি তাহলে মোট ৫৫,০০০ জন হবে এবং কোনোভাবেই ৯৬,০০০ বা ১০০,০০০ জন হবে না। বাকীরা ছিল বেসামরিক কর্মচারী-কর্মকর্তা, মহিলা ও শিশু।[২৭]

সুতরাং বার বার যে '৯৩,০০০ পাকিস্তানী সেনা'কে যুদ্ধবন্দি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে বলা হয় তা সঠিক নয় ও এতে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সেনা শক্তিকে অনেকখানি বাড়িয়ে বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এ ছাড়া আরো কিছু পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দির সংখ্যা অজান্তেই থেকে যায় যাদের ১৯৭১ সালের প্রথম দিক থেকে শত্রু সেনা হিসেবে ভারতের মাটিতে বন্দি রাখা হয়। ২৭ বালুচ রেজিমেন্ট-এর লে. আতাউলাহকে গ্রেফতার করা হয় কুষ্টিয়ায়- ২৯ মার্চ ও এপ্রিলের প্রথম দিকে বিদ্রোহী বাঙালিরা তাকে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের হাতে তুলে দেয়। তিনি আমাকে বলেছেন, তাকে ভারতের পশ্চিম বাংলা, পানাগড় সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তিনি ৬০ থেকে ৮০ জন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদের লোকজনকে বন্দি অবস্থায় দেখতে পান। মার্চ থেকে ভারতে বন্দি অন্যান্য পাকিস্তানী অফিসারদের মধ্যে ছিলেন ৪ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লে. ক. খিজির হায়াত ও ওই ইউনিটের অন্যান্য অফিসাররা। এদের ওই ইউনিটের বিদ্রোহী বাঙালি সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর খালেদ মোশাররফ হত্যা না করে নিজের হেফাজতে নিয়ে পরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। থানাপাড়ার গ্রামবাসীর ভাষ্য অনুযায়ী ১১ এপ্রিল সারদা পুলিশ একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত ২৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী শিক্ষানবিশকেও গ্রেফতার করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল।

'ত্রিশ লাখ গণহত্যা'- একটি চূড়ান্ত যোগসূত্র : সর্বশেষ যে 'শব্দ-সংখ্যার' সমন্বিত উদাহরণ দেয়া যায় তা হচ্ছে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে নিহতদের সংখ্যা নিয়ে। বাংলাদেশীদের দাবি যা ভারতীয়সহ বিশ্বের অনেক মানুষ এমনকি অনেক পাকিস্তানীরাও বিশ্বাস করেন যে পাক সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের যুদ্ধে 'গণহত্যা' চালিয়ে তিন মিলিয়ন অর্থাৎ ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যা করেছে। প্রাধান্য বিস্তারকারী বর্ণনায় বলা হয়েছে সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যারা পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত ছিলেন তাদের সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী ও ধরে নেয়া হয় নিহতদের বেশিরভাগই ছিল জাতিগতভাবে বাঙালি অর্থাৎ বিদ্রোহী প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। নিহত 'ত্রিশ লাখ' বাঙালিকে আবার স্বাভাবিকভাবেই নিরপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যারা কেউই যোদ্ধা ছিল না এবং এ ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করা হয়েছিল তাদের জাতি ও ভাষাগত পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে।

আমি এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছিলাম শুরু থেকে যেখানে কোলকাতায় শিশুবস্থায় ১৯৭১ সালের স্মৃতিগুলো জড়িয়ে ছিল এবং সেখানে বেড়ে উঠেছি ওই ধরনের ধারণার মধ্য দিয়েই। আমি ধারণা করেছিলাম ত্রিশ লাখের সংখ্যাটি হয়তো কাছাকাছি হবে বা প্রায় ত্রিশ লাখ হবে, কিন্তু এটি ছিল ব্যায়াম বীরদের মাংশপেশী স্ফীত হওয়ার মতো একটি ফুলে ফেপে ওঠা সংখ্যা মাত্র।

আমি এও মনে করেছিলাম যে এটি সরজমিনে পরীক্ষিত ও বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি হিসাব। অথচ ১৯৭১ সালের যুদ্ধের উপর প্রাপ্ত সকল বাংলা ও ইংরেজী প্রকাশনায় যে ত্রিশ লাখ বাঙালি নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা কোন প্রকার সরজমিনে জরিপ বা কোনো নিয়মতান্ত্রিক হিসাব-নিকাশ ছাড়াই প্রকাশ করা হয়েছে। সিসন ও রোজ উল্লেখ করেছেন ত্রিশ লাখ মৃতের এ সংখ্যাটি দেয়া হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে, অপরদিকে বাংলাদেশের কিছু সূত্র থেকে জানানো হয়েছে যে ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিব ওই সংখ্যাটি ঘোষণা করেছিলেন এবং শেখ মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের জেলে নয় মাসের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাকে মৃতের সংখ্যাটি 'বলা' হয়, তবে এটি পরিস্কার নয় কে তাকে, কিসের ভিত্তিতে এই ত্রিশ লাখ মৃতের সংখ্যাটি বলেছিলেন? যাহোক, শেখ মুজিব নতুন সৃষ্ট বাংলাদেশে ফিরে এসে জনসম্মুখে 'ত্রিশ লাখ' লোক নিহত হওয়ার কথা ঘোষণা করেন যা সেসময় সকল সংবাদ মাধ্যম প্রচার করেছিল গুরুত্বের সাথে। ১৯৭২ সালের ১১

www.pathagar.com

জানুয়ারি *দি টাইম* পত্রিকায় পিটার হেজেলহার্স্ট ঢাকা থেকে শেখ মুজিবের আবেগপূর্ণ ঘরে ফেরার উপর রিপোর্ট করেছিলেন। তাতে তিনি বলেন: স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিব তার প্রথম জনসভায় বলেছেন, 'আমি জানতে পেরেছি তারা আমার ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে।' [২৯]

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আপাতদৃষ্টিতে তাকে 'বলা হয়েছে'-এর উপর ভিত্তি করে জনসম্মুখে ত্রিশ লাখ বাঙালির নিহত হওয়ার কথা বলার পর শেখ মুজিব এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ তৈরির জন্য ১৯৭২ সালে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।[৩০] পরবর্তীতে ওই তদন্ত কমিটির তদন্তের ফলাফল বা তারা কি উদ্‌ঘাটন করেছেন সে সম্পর্কে কোনোরূপ তথ্য পাওয়া যায়নি। অভিযোগে বর্ণিত পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যার ব্যাপক ও বহুল প্রচারিত ধারণা কোনো সরকারী রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়নি।

কোন প্রকারের যাচাই বাছাই ছাড়াই দশকের পর দশক ধরে দক্ষিণ এশিয়া ও পশ্চিমা দেশগুলোর তাত্ত্বিক মহল এবং সংবাদ মাধ্যমে ত্রিশ লাখ নিহত হওয়ার দাবির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবোধের উপর তার গবেষণায় রওনক জাহান 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা ও ব্যাপকহারে হত্যাকাণ্ডের' উপর লিখেছেন ও উল্লেখ করেছেন যে, 'দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রামে এক থেকে তিন মিলিয়ন লোক নিহত হয়েছে।'[৩১] তবে তিনি ওই ত্রিশ লাখ- এর সংখ্যা কোথা থেকে পেয়েছেন তার কোনো উৎসের নাম উল্লেখ করেননি। ত্রিশ বছর পর, ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান সংঘাতের বিষয়ে একক সূত্র উল্লেখ করে সামান্যা পাওয়ার তার পুলিৎজার বিজয়ী গ্রন্থ 'এ প্রবলেম ফ্রম হেল:আমেরিকা এন্ড দি এজ অফ জেনোসাইড' শিরোনামের বইয়ে দাবি করেছেন '১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আরম্ভ করে ... পাকিস্তান সেনাবাহিনী দশ থেকে ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যা করেছে এবং ধর্ষণ করেছে প্রায় দু'লাখ কিশোরী ও মহিলা'। তবে তার এ দাবির পক্ষে তিনি কোনো সূত্র বা উৎসের নাম উল্লেখ করতে পারেননি।[৩২] এদিকে সিসন ও রোজ মন্তব্য করেছেন, 'ভারত অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনীর বর্বরতা নিয়ে সুস্পষ্টভাবে একটি ঘটনা সাজানোর চেষ্টা করে যেখানে তারা দেখতে পায় যে বিদেশী সংবাদ মাধ্যম কোনোরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই ঢাকার বর্বরতার গল্পগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করার ফাঁদে পড়েছে ও অনেকখানি ফুলিয়ে ফাপিয়ে অব্যাহতভাবে প্রচারও করেছে।' [৩৩]

যখন কোনো প্রমাণ ছাড়াই অনেকে 'ত্রিশ লাখ' বাঙালি নিহত হওয়ার খবর অব্যাহতভাবে প্রচার করেছেন তখন দৈবাৎ কোন বিদেশী পর্যবেক্ষক এ ব্যাপারে দাবি ও প্রকৃত তথ্য প্রমাণের মধ্যে বেশ বড় মাত্রার পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। এরূপ একটি খবর *দি গার্ডিয়ানে* ছাপা হয় 'দি মিসিং মিলিয়নস' শিরোণামে ১৯৭২ সালের ৬ জুন সংখ্যায়। তাতে প্রতিবেদক উইলিয়াম ড্রমণ্ড লিখেছেন 'এ ত্রিশ লাখ মৃতের সংখ্যা যা শেখ মুজিব বাংলাদেশে ফিরে বার বার উচ্চারণ করেছেন তা আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমের অনেকেই প্রচার করেছে কোনো রকম বাছ-বিচার না করেই। বার বার এ সংখ্যার পক্ষে সমর্থন দানের মাধ্যমে দাবিটা একরকম বৈধতা প্রাপ্তির পর্যায় পৌঁছে গেছে ও ধীরে ধীরে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কোনো তথ্য উপাত্তের প্রয়োজন হচ্ছে না। বাংলাদেশে আমার অসংখ্যবার ভ্রমণ এবং সেখানকার গ্রাম ও সরকারি পর্যায়ে অসংখ্য মানুষের সাথে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে ত্রিশ লাখ মৃতের সংখ্যাটি এতোটাই অতিরঞ্জিত যে এটা একবারেই অসম্ভব একটি বিষয়।'[৩৪]

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে হেনরী কিসিঞ্জার- এর মন্তব্য ছিল এরূপঃ বাঙালিরা দাবি করেছিল কবরে আছে ১০০০ লাশ অথচ সেখানে পাওয়া গেছে ২০টিরও কম মৃতদেহ। ১৯৭২ সালের জুনে ড্রুমণ্ড লিখেছেন ' অবশ্যই বাংলাদেশের সর্বত্র 'গণকবর' পাওয়া গেছে , কিন্তু কেউই এমনকি সবচেয়ে ক্রুদ্ধ পাকিস্তান বিদ্বেষীও নিশ্চিত করে দাবি করতে পারেনি যে ওইসব গণকবরে ১০০০-এর বেশি লাশ ছিল। তাছাড়া ওইসব গণকবরে একটি লাশ পাওয়ার অর্থ এ নয় যে ওই হতভাগা নিহত হয়েছে পাকিস্তান সেনবাহিনীর হাতে।'

আমি আগের অধ্যায়গুলোতে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছি যা প্রায় একই ধরনের। প্রকৃতপক্ষে কবরগুলো থেকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে লাশের শনাক্তকরণ, গণনা করা সহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে একটা মোটামুটি সঠিক তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল যা বাংলাদেশ সরকার বা সে দেশের সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান যারা এ ব্যাপারে নিয়মিত গবেষণা করছেন তারা তা করেননি। কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হত্যাকাণ্ড ও সেখানকার লাশগুলোর সঠিক হিসেব-নিকেশ ইত্যাদি সহজেই করা যেত যা আমি ইতোমধ্যেই এ বইয়ে উল্লেখ করেছি। এছাড়া ড্রুমণ্ড ১৯৭২ সালে উল্লেখ করেছিলেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লাশের বিস্তারিত তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারে না যে ওই লাশগুলো বাঙালির না অবাঙালির, তারা কি যোদ্ধা- না যোদ্ধা নয়, অথবা তাদের কি পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যা করেছে- কি করেনি? অদৃষ্টের পরিহাস, ড্রুমণ্ড স্বীকার করেছেন পাকিস্তানীরা অবশ্যই বাঙালিদের মেরেছে, তবে নিহতের সংখ্যা নিয়ে বাঙালিদের দাবি ছিল 'একেবারে অসম্ভব-অবাস্তব' যা পুরো বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ড্রুমণ্ড রিপোর্ট করেছিলেন যে, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯৭২ সালে সরজমিনে তদন্ত করে পাক বাহিনীর হাতে ২,০০০ মৃত্যুর অভিযোগ পেয়েছিল মাত্র।

এ পরিস্থিতিতে 'ত্রিশ লাখের' সংখ্যাটি স্রেফ বিশাল গুজব ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। বিশ্বাসযোগ্য হিসেব নিকেশ দ্বারা এর একটি সুরাহা না করা পর্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের এ বিশাল সংখ্যাটির পুনরাবৃত্তি করা অবশ্যই বন্ধ হওয়া দরকার। যতোক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ হিসাব বাংলাদেশ সরকারের সংশিষ্ট সরকারি আর্কাইভ থেকে প্রকাশিত না হচ্ছে ততোক্ষণ কোনো সংখ্যাকেই মৃতদের সংখ্যা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত হবে না।

অন্যদিকে পাকিস্তানে যুদ্ধের পর জুলফিকার আলী ভুট্টোর নতুন সরকার যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় সম্পর্কে তদন্ত করতে হামুদুর রহমান কমিশন গঠন করে ও তদন্ত শেষে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।ওই প্রতিবেদনের ডিক্লাসিফাইড(গোপনীয়তার বেড়ি উঠিয়ে দেয়া) অংশ উপস্থাপন করা হয় পাকিস্তানে জনসাধারণের সামনে। 'ত্রিশ লাখ' নিহত হওয়ার দাবির উপর হামুদুর রহমান কমিশনের মন্তব্য ছিল এরূপ: 'বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মতে ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যা ও দু'লাখ পূর্ব পাকিস্তানী নারী ধর্ষণের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী দায়ী। এ সংখ্যাগুলো যে পরিষ্কারভাবে অতিরঞ্জিত তা বুঝতে আর বিস্তারিত যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নেই। এমনকি অন্যকোন কিছু যদি নাও করতে হতো তাও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করেও এ ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হতো না।'[৩৫]

ঢাকার এ দাবিকে সার্বিক অর্থে 'চমৎকার ও উদ্ভট' আখ্যা দিয়ে কমিশন নিজে নিহতের সংখ্যার হিসেবে দিয়েছিল এভাবে : 'সর্বশেষ বিবৃতি দিয়ে সেনা সদর দপ্তর থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিচালিত অভিযানে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ২৬,০০০ জন নিহত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড থেকে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে বিভিন্ন

www.pathagar.com

সময়ে দাখিলকৃত ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের (সিচুয়েশন রিপোর্ট) উপর ভিত্তি করে এ সংখ্যাটি পাওয়া গেছে।'

কমিশন এ ২৬,০০০ জন মৃতের সংখ্যাটিকে পক্ষপাতমূলক বলে মনে করেছিলেন, তবে তারা ওই সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে দিয়ে পক্ষপাত করা হয়েছে বলেই ধারণা করেন। 'এটা হতে পারে যে এমনকি এ সংখ্যাতেও হয়তো অতিরঞ্জিত কোনো বিষয় রয়েছে,কেননা সেসময় বিদ্রোহ দমনে নীচের দিককার ইউনিটগুলো তাদের অর্জনকে আরো বাড়িয়ে প্রকাশ করার মানসিকতা পোষণ করতে করতো।' 'অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে' কমিশন ২৬,০০০ মৃতের সংখ্যাকে 'যুক্তিসহ সঠিক' হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং এর পক্ষে 'যুক্তি ছিল যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে প্রতিবেদনগুলো পাঠান হয়েছিল এমনি এক সময় যখন পূর্ব পাকিস্তানে দায়িত্বরত সেনা কর্মকর্তাদের কোনো আগ্রহই ছিল না এসব বিষয়ে কোনো ধরনের জবাবদিহিতার'।[৩৬]

পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে দু'পক্ষের দাবির উপর ভিত্তি করে আমার হাতে যে তথ্য আছে তা হচ্ছে এক পক্ষের দাবি ২৬,০০০ নিহত হওয়ার- যা তারা পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে জেনারেল হেডকোয়ার্টারে প্রেরিত যেসব প্রতিবেদন তদন্ত কমিশনে দাখিল করেছিল তার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত; দ্বিতীয় পক্ষের অর্থাৎ বাংলাদেশ/ভারতের দাবি হলো ত্রিশ লাখ লোক নিহত হওয়ার যার কোনো ভিত্তি নেই অর্থাৎ কোনো কিছুর উপর ভিত্তি না করেই তারা নিহতের সংখ্যা ত্রিশ লাখ বলে দাবি করেছে।

১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর রীতিসম্মত উপায়ে গবেষণার সময় সিসন ও রোজ যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কতোজন মারা গিয়েছিল সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে চেষ্টা করেছিলেন। তারা লিখেছেন:

'ভারত পাকিস্তানী নৃশংসতার বলি হিসেবে ত্রিশ লাখ বাঙালি হত্যার সংখ্যাটি নির্ধারণ করেছে ও আজ পর্যন্ত এ সংখ্যাটি সর্বত্র উল্লেখ করা হচ্ছে। আমরা দু'জন ভারতীয় কর্মকর্তা যারা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ব্যাপারে দায়িত্বশীল পদে আসীন ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে ১৯৭১ সালে সঠিক হিসেবে কতজন লোক নিহত হয়েছে, তখন তাদের একজন উত্তর দিয়ে বলেছিলেন প্রায় তিন লাখ। যখন তার দেয়া সংখ্যাটি তার সহকর্মীর চোখের ইশারার অনুমোদন পেলো না তখন তিনি সংখ্যাটি পরিবর্তন করে বললেন- তিন থেকে পাঁচ লাখ হবে।'[৩৭]

ভারতীয় এই কর্মকর্তাদের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এটাই প্রতিফলিত হয়েছিল যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কোন বাস্তব হিসেব ছাড়া মৃতের সংখ্যা নির্ধারন করেছিল ও যতোটা সম্ভব বেশী করে উল্লেখ করা যায় সেদিকেও তাদের একটা প্রবণতা ছিল। এ যুক্তিতে এটা বলা যায় যে প্রথম কর্মকর্তাটি নিহতের সংখ্যা ৩০০,০০০ বলে যা উল্লেখ করেন তাও ছিল অতিরঞ্জিত। কিন্তু তার সহকর্মী অন্য কর্মকর্তাটি একেও ততো বড় করে দেখানো হয়নি এমন চিন্তা থেকে তা ৫০০,০০০ এ উন্নীত করেন। এ দু' টো সংখ্যার একটিও মাঠ পর্যায়ের কোন হিসেব বা তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়নি, আর তাই উভয় সংখ্যাকেই প্রত্যাখ্যান করা দরকার।

সিসন ও রোজ নিহতদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে আরো ক'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় এনেছিলেন তা হচ্ছে '(১) এদের মধ্যে স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা ছিলেন কতোজন, (২) কতজন বিহারী মুসলমান ও পাকিস্তান সমর্থক ছিল যাদের বাঙালি মুসলমানরা হত্যা করেছে, (৩) সংঘর্ষের সময় পাকিস্তানী, ভারতীয় ও মুক্তিবাহিনীর গুলি ও বোমায় কতজন

www.pathagar.com

লোক নিহত হয়েছেন? একটা বিষয় পরিষ্কার আর তা হচ্ছে নৃশংসতা ঠিক এককভাবে হয়নি যদিও এ নৃশংসতার মূল ভুক্তভোগী ছিল বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুরা।'[৩৮]

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে দেখানো হয়েছে যে সংঘাতের সময় নিহতদের একটা বড় অংশ ছিল উগ্রবাঙালিদের হাতে নিহত অবাঙালি সম্প্রদায়। এ অবাঙালিদের হত্যা করা হয়েছিল নারী-পুরুষ-শিশু বাছ-বিচার না করেই; অন্যদিকে পাকিস্তানী সেনারা হত্যা করেছিল শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালি পুরুষদের। বাঙালি ও অবাঙালিদের হতাহতের সংখ্যা নিরূপনে আবার সুনির্দিষ্ট কোনো তালিকা পাওয়া সম্ভব নয়। হতাহতের মধ্যে কারা যোদ্ধা আর কারা যোদ্ধা নয় তাও চিহ্নিত করা দুরূহ, কারণ বাংলাদেশের পক্ষে যারা যুদ্ধ করেছেন তাদের বেশিরভাগই ছিলেন বেসামরিক ব্যক্তি (অথবা বেসামরিক পোশাক পড়া)। এ গবেষণায় যেমন দেখা গেছে যেখানে অনেক বেসামরিক ব্যক্তি পরিকল্পিক হত্যাযজ্ঞের মুখোমুখি হয়েছিলেন তেমনি অনেক বেসামরিক নাগরিক নিশ্চিহ্ন হয়েছেন ক্রসফায়ারে বা বোমাবর্ষনের শিকার হয়ে। বাস্তবতার নিরিখে যুদ্ধে হতাহতের ঘটনায় বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে নির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস উপস্থাপন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়- যেমন নিহতরা কি বাঙালি ছিল না অবাঙালি, যোদ্ধা না যোদ্ধা নয়(নন কমব্যাটেন্টস), হত্যাকাণ্ড কি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে না কি তা ছিল কথিত 'কোলেটারাল ড্যামেজ'?

এ ক্ষেত্রে আরেকটি জটিলতা হচ্ছে যে সংঘর্ষকালে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হয়েছিল সংঘাত শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মার্চ-এপ্রিল মাসে ও শেষের দিকে যখন নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সে সময়। কিছু গ্রামে এককভাবে বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল যেমন- চুকনগর, থানাপাড়া, সাথিয়ার চোরা; আবার অন্যদিকে বাকী প্রায় সব গ্রামেই তুলনামূলকভাবে এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। কাজেই কোন একটি বিশেষ জেলা থেকে বা একটি বিশেষ সপ্তাহের মোট মৃতের সংখ্যা নিয়ে মোট নিহতের সংখ্যা বের করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকেই একমাত্র যথাযথভাবে 'মাথা গণনা' বা সৈন্য সংখ্যা, আহত ও নিহতের সংখ্যা পাওয়া যেতে পারে। তবে সেগুলোও প্রায়ই একদম সুনির্দিষ্ট হয় না যেমন সচরাচর মনে করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর লে.জেনারেল জে.এফ.আর জ্যাকব-এর মতে, ডিসেম্বর মাসেই শুধু ভারতের হতাহতের সংখ্যা ছিল- ১,৪২১ জন নিহত, ৪,০৫৮ জন আহত ও ৫৬ জন নিখোঁজ (মৃত ধরা হয়)। অথচ ডিসেম্বরের আগে থেকেই ভারতের বাংলাদেশের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনলে এবং ডিসেম্বরের আগে ভারতীয় সেনাদের হতাহত হওয়ার ব্যাপারে অনেক বাংলাদেশী ও পাকিস্তানীর দাবি হিসেবের অন্তর্ভুক্ত করলে ভারতের হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া যাবে। তবে তা হবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দেয়া হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি। লে. জে. জ্যাকব-এর মতে, পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ব্যাপারে ভারতের মূল্যায়ন হচ্ছে : ২৬ মার্চ থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে-নিহত ৪,৫০০ ও ৪,০০০ আহত; ৪-১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিহত ২,২৬১ ও আহত ৪,০০০; সর্বমোট নিহত ৬,৭৬১ জন ও আহত ৮,০০০ জন।[৩৯] জেনারেল নিয়াজী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিহতের সংখ্যা ৪,০০০ ও প্রায় সমান সংখ্যক আহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন।[৪০]

পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে তালিকাভুক্ত করেছে এবং দাবি করেছে ১ মার্চ থেকে শুরু হওয়া

www.pathagar.com

'আওয়ামী লীগ সৃষ্ট সন্ত্রাসের দিনগুলোয়' তাদের উগ্র কর্মীদের হাতে ১,০০,০০০ নারী, পুরষ ও শিশু নিহত হয়েছে ।[৪১] এটা মনে হতে পারে পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে নিহতের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রকাশ করা হয়েছিল ঠিক যেমন বাঙালিরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত বাঙালির সংখ্যা অতিরঞ্জিত করে সর্বত্র প্রকাশ ও প্রচার করেছে। তবে অধ্যায় ৪ ও অধ্যায় ৮- এ বর্ণিত খুলনার কেস স্টডিতে দেখা যায় কোনো একটি একক ঘটনাতেই বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা হাজার হাজার অবাঙালি নারী, পুরষ ও শিশু হত্যা করেছে। এর ফলে 'বিহারী জনগোষ্ঠী'র মোট নিহতের সংখ্যা হাজার হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

যুদ্ধরত উভয়পক্ষই তারা কতো মানুষ হত্যা করেছে তার সংখ্যা হ্রাস করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। উভয় পক্ষই উৎসাহী ছিল তাদের নিজেদের 'অর্জন' নিয়ে গর্ব করতে, আর তাই তারা শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে নিজের দাবি প্রচার করতো। সেনা অভিযান আরম্ভ হওয়ার পরবর্তী সপ্তাহগুলোয় উভয়পক্ষের মধ্যেই ভয়ানক রক্তপাত ও ব্যাপক হতাহত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে কুষ্টিয়ায় দীর্ঘসময়ব্যাপী যুদ্ধ ও এ্যামবুশে প্রায় ১৪৪ জন পাক সেনা নিহত হওয়ার কথা। যাহোক, টাঙ্গাইলের সাথিয়ার চোরায় স্বাধীনতাকামী গেরিলারা নিজেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ২০০-২৫০ জন পাক সেনা হত্যার যে দাবি করেছে তা কিন্তু অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়।

এসোসিয়েট প্রেসের ফটোগ্রাফার যিনি ২৫-২৬ মার্চ সামরিক অভিযান শুরুর পর অন্য বিদেশী সাংবাদিকদের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়ন এড়িয়ে ঢাকায় কয়েকদিন আত্মগোপন করেছিলেন তিনি তার পাঠানো এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে ২০০ জন ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে।[৪২] অধ্যায় ৩-এ বর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী ঢাকার অপারেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অন্যতম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা আমাকে জানিয়েছিলেন ইকবাল হলে নিহতের সংখ্যা ছিল বারো ও জগন্নাথ হলে বত্রিশ জন। আবার ওই অধ্যায়ে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সম্পর্কিত আলোচনায় যা দেখা গেছে, তাতে যাদের জোর করে লাশ বহন করানো হয়েছে ও পরে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাদেরসহ নিহতের সংখ্যা ছিল সত্তর থেকে তিনশ' পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান পরিচালনাকারী সেনা ইউনিটের কমান্ডিং অফিসারও ওরকম হিসেব দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিসৌধে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে মোট ১৪৯ জনের নাম যারা ওই বছর যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এসব কিছুই হচ্ছে সেনা অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠানো পত্রিকার প্রতিবেদনে উল্লেখ করা নিহতের সংখ্যার সাথে পরস্পর বিরোধি।

একইভাবে অধ্যায় ৪-এ যা আলোচনা করা হয়েছে তাতে পাক বাহিনী ২৬ মার্চ পুরানো ঢাকার হিন্দু এলাকা শাঁখারীপট্টি আক্রমণ করেছিল এবং আমার সাক্ষাতদাতা প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে যাওয়া লোকদের দেয়া বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেখানে ১৪-১৫ জন পুরুষ ও ১ জন শিশু নিহত হয়েছিল। অন্যদিকে একজন সুপরিচিত পাকিস্তানী সাংবাদিক তার রিপোর্টে সেখানে ৮,০০০ লোক নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় ৬-এ চুকনগরে হিন্দু শরণার্থীদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে যেসব তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে তা একটি বড় ধরনের হত্যাযজ্ঞের কথাই ফুটিয়ে তোলে যেখানে ২০ মে শত শত হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল। এটিই স্থানীয় ও বাংলাদেশী লেখক- বুদ্ধিজীবীদের কাছে যথেষ্ট ওই ঘটনাটিকে 'বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ ও বড় হত্যাকাণ্ড' হিসেবে চিত্রিত করায়। তাদের দাবি হলো সেদিন এক প্লাটুন পাক সেনা তাদের অস্ত্র দিয়ে ১০,০০০ এরও অধিক মানুষ হত্যা করেছিল।

www.pathagar.com

প্রাপ্তসাক্ষ্য প্রমাণ যা এ গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে তাতে যুক্তিসংগত আস্থার সাথে আন্দাজ করা যায় যে ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান / বাংলাদেশ সংঘাতে কমপক্ষে ৫০,০০০-১০০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে যাদের মধ্যে ছিল বাঙালি- অবাঙালি, হিন্দু-মুসলমান, যোদ্ধা- যোদ্ধা নয় এমন ব্যক্তি, এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানী। এক লাখের উপর আহতের সংখ্যা নির্ধারন করা হলে তাকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় তবে তারচেয়ে বেশি বলে দাবি করা হলে তা হবে কোনো অর্থহীন ধারণা মাত্র।

নিপীড়নের শিকার ও সন্ত্রাসের সংস্কৃতি: মৃতের সংখ্যা যাই হোক না কেন, ১৯৭১ সালের সংঘাতকালীন সময়ের মৃত্যুগুলোর ধরণ ব্যাপক 'গণহত্যা'র ন্যায় কিনা সেটাই দেখার বিষয়। গণহত্যার অপরাধ নিহতের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নির্ণত হয় না বরং হত্যাকাণ্ড কি জাতীয়তা, গোত্র, জাতি বা ধর্মের উপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয়েছে কি না সেটাই জানার বিষয়। গণহত্যার অপরাধ বন্ধ ও এর শাস্তি সম্পর্কিত জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের কনভেনশন (United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948) অনুযায়ী গণহত্যার সংজ্ঞা হচ্ছে :

গণহত্যা বলতে বোঝায় নিম্নলিখিত যে কোনো একটি তৎপরতাকে যেখানে এ সব পদক্ষেপ নেয়া হয় কোনো একটি জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর পূর্ণ বা আংশিক বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে :
(ক) কোনো গোষ্ঠীর সদস্যকে হত্যা করা,
(খ) কোনো গোষ্ঠী বা দলের কোনো সদস্যের শারীরিক বা মানসিক বিশেষ ক্ষতিসাধন করা,
(গ) কোনো গোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় পরিকল্পিত উপায়ে আঘাত করা যাতে তাদের সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে বিনাশ সাধন করা যায় এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা,
(ঘ) গোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নিরোধ করার উদ্দেশ্যে কোনো পদ্ধতির অবলম্বন করা,
(ঙ) এক গোষ্ঠীর শিশুদের অন্য গোষ্ঠীর কাছে জোর করে বিতাড়ণ করা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের হত্যাকাণ্ডকে একটি গণহত্যা হিসেবে অভিযোগ আনায় একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে বলা প্রয়োজন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় সত্তর মিলিয়ন জনসংখ্যার সবাই ছিল বাঙালি। তাই 'টার্গেট' জনগোষ্ঠীকে 'বাঙালি' বলা হবে অযৌক্তিক,কারন এতো বড় জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা সহজ কাজ নয়। এদিকে যারা স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল তারা সকলেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি অধ্যুষিত প্রদেশের বাঙালি। সেক্ষেত্রে আশ্চর্য হওয়ার তো কিছু নেই যে বিদ্রোহ দমনে পাক বাহিনীর হাতে যারা নিহত হয়েছেন স্বভাবিকভাবেই তারা বাঙালিই হবেন।

এ গবেষণায় স্পষ্টভাবে দেখা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বিচারে সব বাঙালিকে হত্যা করেনি, এমনকি যে সব স্থানে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল যেমনঃ থানাপাড়া, চুকনগর ও বড়ইতলা সেখানেও বেছে বেছে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিল এবং নারী ও শিশুদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ২৫-২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া সেনা অভিযানের শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ধরণ ছিল প্রায় একই- প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হত্যা করা হলেও নারী ও শিশুদের রেহাই দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার প্রাপ্তবয়স্ক অবাঙালি পুরুষ কর্মচারীদেরও হত্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে সকল প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালি পুরুষরাও পাক বাহিনীর হত্যার টার্গেট ছিলেন না। অনেক বাঙালি পুরুষ ছিলেন পাক জান্তার সমর্থক যাদের বলা হতো 'রাজাকার'। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালি ছিল দু'পক্ষের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় এবং এ ধরনের পুরুষদের বেশিরভাগই যুদ্ধের মাঝেও বেঁচে গেছেন, এমনকি জেরা করার জন্য প্রকৃত গেরিলাদের সাথে (যেমন ঢাকার গেরিলাদল) তাদের ধরে নিয়ে গেলেও জেরার পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। যা হোক, কেবলমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে হিন্দু পুরুষদের অধিকহারে গেরিলা বলে সন্দেহ করেছিল পাক সেনারা। অতএব প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নির্দেশ করে যে পাক বাহিনী রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে যেখানে হত্যার শিকারদের ধরে নেয়া হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে যারা চিরশত্রু ভারতের বশংবদ হিসেবে চিহ্নিত হয় 'বিশ্বাসঘাতক রূপে'। যুদ্ধ নয় এমন পরিস্থিতিতে নৃশংস বিচার বহির্ভূত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে নিসন্দেহে নিন্দা জানানো উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বা বিশ্বের অন্য কোথাও সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে জাতিসংঘের নির্ধারিত 'গণহত্যা'র সংঘায় ফেলা যায় না।

যাহোক, সরাসরি যুদ্ধ ছাড়া পাক সেনাবাহিনী তাদের টার্গেট- বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলাদের সনাক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পরিচয় (প্রক্সি- প্রকৃত পরিচয় নাও হতে পারে), শ্রেণী বা প্রোফাইলের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে যেতো,যেমন- রাজনৈতিক মতাদর্শ (যেমন ধরা যায় আওয়ামী লীগের সদস্য); আবার কোনো কোনো সময় বয়স (প্রাপ্ত বয়স্ক), লিঙ্গ (পুরুষ) ও ধর্মের (হিন্দু) উপর ভিত্তি করে তারা গেরিলাদের চিহ্নিত করতো। শেষের দিকে গেরিলা চিহ্নিতকরনের গন্ডি যেন ছোট হয়ে আসে যেখানে ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুত্বই টার্গেট হয়ে দাড়ায়। এবং এভাবে একটি বিশেষ ধর্মের অনুসারীদের টার্গেট মনে করায় তা পাক সেনাবাহিনীকে হত্যাকাণ্ডের দিকে ঠেলে দেয়। এসব হত্যাকাণ্ড 'রাজনৈতিক' উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হলেও প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলোকে গনহত্যাও বলা যেতে পারে।

এরপরও ১৯৭১ সালে অনেক হিন্দুই পাক বাহিনীর হাত থেকে অক্ষত ছিল। অধ্যায় ৬-এ প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় জানা যায় অনেক হিন্দুই তাদের বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাক সেনাবাহিনীর হামলার জন্য নয় বরং প্রতিবেশী বাঙালি মুসলমানদের হাতে নির্যাতন সহ্য না করতে পেরেই তারা দেশ ছেড়ে চলে যান। সে সময় আবার অসংখ্য হিন্দু সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কারনে তাদের প্রতিবেশী বাঙালি মুসলমানদের হাতে নাজেহাল হন যেখানে হিন্দুদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি দখলের লোভই ছিল মূল উদ্দেশ্য। হিন্দুদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, হত্যা ও বিতাড়ন তা পাক বাহিনী বা বাঙালি মুসলমান যাদের দ্বারাই হোক না কেন তা পরবর্তীতে 'জাতিগত নির্মূল অভিযান' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

যখন ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে পাক সেনাবাহিনী যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা যদি 'গণহত্যা' হিসেবে চিহ্নিত হয় তাহলে বাঙালিদের হাতে অবাঙালি বিহারী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের হত্যাকাণ্ডকেও পরিষ্কারভাবে জাতিসংঘের সংজ্ঞায় গণহত্যা বলা যায়। এ গবেষণায় অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, যাতে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানে অনেক বাঙালি মুসলমান অবাঙালি মুসলমান এবং বাঙালি ও অবাঙালি হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'গণহত্যা' সংঘটিত করেছে ও 'জাতিগত নির্মূল অভিযান'পরিচালনা করেছে। এ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের টার্গেট করা হয়েছে জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতেই ।

তথ্যের দ্বারা প্রমানের প্রয়োজনীয়তাকে পরম আনন্দে অবজ্ঞা করে বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার সাহিত্যসমুহ' ১৯৭১ এর বর্ণনায় 'গনহত্যা','ব্যাপক হত্যাকান্ড','কনসেনট্রেশন ক্যাম্প' জাতীয় শব্দগুলো বারংবার উল্লেখ করেছে নাৎসী জার্মানীর বিভীষিকার সাথে তুলনা করে সুবিধা আদায়ের জন্য। তাই বাংলাদেশে ' মিলিয়ন' বা লাখ লাখ মৃতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ষাট লাখ ইহুদী হত্যাযজ্ঞের সাথে তুলনা করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ও সহানুভূতি কাড়ার লক্ষ্যে। এদিকে নাছোড়বান্দার মতো 'নিপীড়ন / নির্যাতনের শিকার সংক্রান্ত সংস্কৃতি' বপন করা হয়েছে যেখানে শুধু রয়েছে অপরের প্রতি অভিযোগের পর অভিযোগ। পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে শোষন,বঞ্চনার শিকার হওয়া, ১৯৭১ এর 'গনহত্যা', অযত্নশীল বিশ্বের অবহেলা তো বটেই একসময়ের মুক্তিদাতা ভারতের বিরুদ্ধেও শোষনের অভিযোগ উত্থাপন করে আসছে বাংলাদেশীরা ।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা ও জোর দেয়া প্রয়োজন যে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের সংঘাত ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নৎসী এবং তার মিত্রদের দ্বারা ইউরোপের কয়েক মিলিয়ন ইহুদী, অন্যান্য সংখ্যালঘু ও ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকদের পরিকল্পিত নির্মূল অভিযানের মধ্যে কোনো তুলনা করা যায় না। নির্বোধের মতো এরূপ তুলনা করা নৎসীদের হাতে নিহত ও ১৯৭১ সালের সংঘর্ষে নিহতদের নিছক বিদ্রূপ করারই সামিল।এক্ষেত্রে হত্যাকাণ্ড বা নিহতদের ভোগান্তিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আরো ভয়াবহরূপে উপস্থাপনের লক্ষ্যে কোনোরূপ অতিরঞ্জন করার প্রয়োজন নেই।

১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনারা যখন শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য তার বাড়িতে আসে তখন তিনি (শেখ মুজিব) ওভাবে গ্রেফতার হওয়ার আশংকাই করছিলেন; সেনারা তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে কারাবন্দি করে রাখে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশী সেনারা শেখ মুজিবের ওই একই বাড়িতে তাকে গ্রেফতার করতে আসলে তিনি তাদের নিজের লোক হিসেবে বিবেচনা করে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকেসহ তার পরিবারের অন্যসব সদস্য যার মধ্যে ছিলেন তার স্ত্রী, দুই পুত্রবধূ ও তিনজন পুত্র যার মধ্যে আবার একজনের বয়স ছিল মাত্র দশ বছর তাদের সকলকে গুলি করে হত্যা করে। পরিশেষে বলা যায় সংখ্যা বা লেবেল বিবেচ্য বিষয় নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সংঘাতের প্রকৃতি বা ধরন যা ছিল মূলতঃ কয়েকটি গোষ্ঠির মধ্যে ক্ষমতার জন্য জটিল ও সহিংস লড়াই। ১৯৭১ এর যুদ্ধ এক সাগর সহিংসতার স্মৃতি রেখে গেছে যেখানে দেখা গেছে ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ভীতি প্রদর্শন,পাশবিকতা ও নির্মূল করার মধ্য দিয়ে মোকাবিলা করার উদগ্র সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

পুস্তক সংক্রান্ত বিবরণ

এ গবেষণার কাজটি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে গৃহীত সাক্ষাতকার ও সরজমিনে অনুসন্ধান এবং সে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে অতিরিক্ত কিছু কাজের উপর ভিত্তি করে সম্পন্ন করা হয়েছে। সাক্ষাত দাতাদের তালিকা পরিশিষ্ট ২-এ দেয়া হয়েছে এবং সরাসরি তাদের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে। এখানে ইংরেজী ও বাংলায় এ ব্যাপারে প্রকাশিত ও সহজলভ্য বইপুস্তক ও সেগুলোর উপর সংক্ষেপে ব্যাখ্যাসহ মন্তব্য দেয়া হলো। ১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর বিগত পঁয়ত্রিশ বছর পক্ষপাতহীন, তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী খুব কম কাজই হয়েছে। যুদ্ধের উপর বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশিত অধিকাংশ বইপুস্তক যুদ্ধে সরাসরি সংশ্লিষ্টদের ব্যক্তিগত বর্ণনা ও তাদের নিজস্ব মতামত অথবা যে যার পক্ষের কট্টর সমর্থক তার নিজস্ব যে মতামত ও বর্ণনা দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্য ঘটনা উদ্‌ঘাটন ও তার উপস্থাপন করায় কোনো পদ্ধতিগত উদ্যোগ যেমন নেয়া হয়নি; তেমনি গবেষণামূলক কাজ করার কোনো পরিস্থিতিও সৃষ্টি করা হয়নি। অপরপক্ষে এ সংঘাতের সাথে জড়িত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ প্রকাশ করেননি।

এ টিকা শুরু হয়েছে যুদ্ধে সরাসরি জড়িত ছিল না এমন কিছু ব্যক্তির গবেষণা ভিত্তিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের বর্ণনার মাধ্যমে। এগুলো সরকারি দলিলসমূহের পরামর্শের উপর মন্তব্যকে অনুসরণ করেছে। পরের স্তরে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ও বর্ণনাকে বিবেচনা করা হয়েছে। গবেষণা কাজের কিছু বর্ণনা করেছেন ওই সব লেখকরা যারা কোনো না কোনো পক্ষের সমর্থক ছিলেন, তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে গবেষণা বা খোলা মন নিয়ে অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে গবেষণা কর্মকে উপস্থাপন করেছেন। অবশিষ্ট গবেষণাকর্ম বর্ণনা হচ্ছে, ব্যক্তিগত পর্যায়ের ব্যাপক বর্ণনা যারা সরাসরি সংঘাতে জড়িত ছিলেন, যা প্রাথমিক তথ্য হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত এমনকি যদি বিষয়বস্তুগুলো কখনো কখনো ঘটনার সাথে সম্পর্কিত না হয়ে মিশ্র বর্ণনাও হয়ে থাকে। গণমাধ্যমের বিষয়বস্তু এখানে অন্তর্ভুক্তি করা হয়নি- এগুলো বইয়ের মূল বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রকাশিত বই, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার ধরণ ও ব্যাপকতার একটা ভালো ধারণা দেয়াই এ টিকা উপস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্যে:

www.pathagar.com

যারা অংশগ্রহণ করেননি তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাকর্ম

১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর বিদ্যমান পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা নিয়ে কোনো ধরনের আলোচনা অবশ্যই শুরু হবে রিচার্ড সিসন ও লিও রোজ (Richard Sisson and Leo Rose)-এর *'War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh (1990)'* বইটি দিয়ে। এটি হচ্ছে ১৯৭১ সালের সংঘাত সম্পর্কিত ব্যাপক বিশ্লেষণ ও রীতিসিদ্ধ গবেষণাধর্মী একমাত্র বই যেখানে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অত্যন্ত সম্মানিত দু'জন পণ্ডিত নতুন মৌলিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে আগ্রহী যে কারো জন্য বইটি পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য। এতে নীতি ও নীতিনির্ধারকদের পর্যায়ে দ্বন্দ্ব নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে এবং ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সত্তর দশকে গৃহীত সাক্ষাতকার ও যুক্তরাষ্ট্রের আর্কাইভের তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের উপর সিসন ও রোজ-এর গবেষণা এবং তাদের সংগৃহীত তথ্যসমূহ সমকালীন দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত গবেষণা বা মূল্যায়নের জন্য অমূল্য সম্পদ। তাদের সাক্ষাতদাতাদের অধিকাংশই যেহেতু পরলোকগমণ করেছেন তাই পুনরাবৃত্তি করা (আবার তাদের সাক্ষাতকার নেয়া) সম্ভব নয়। সিসন ও রোজ তাদের বইয়ে ১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর ভারত ও বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত বর্ণনা বা পাকিস্তানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেয়া বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা দিয়েছেন।

ওয়েইন উইলকক্স (Wayne Wilcox)-এর *'দি ইমার্জেন্স অফ বাংলাদেশ' (The Emergence of Bangladesh)* বইয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যত মার্কিন নীতির প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। বইটি ১৯৭৩ সালে আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং এটি ১৯৭১ সালের ঘটনার উপর গোড়ার দিককার বিশ্লেষণমূলক মন্তব্যে সমৃদ্ধ। রাজনীতি ও সরকার বিষয়ক অধ্যাপক এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথান এশিয়া ইন্সটিটিউট-এর সদস্য ওয়েইন উইলকক্স ১৯৭০ দশকের জন্য মার্কিন নীতি কি হবে সে ব্যাপারে আলোচনার পূর্বে ১৯৭১ সালের সংঘাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন তাঁর বইয়ে।

এ বইটিতে রয়েছে কতোগুলো কৌতুহলোদ্দীপক যুক্তিতর্কের সাথে সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ যেখানে কয়েক বছর পর সিসন ও রোজের অনুসৃত বিস্তারিত গবেষণার মতো একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন উইলকক্স।

অক্সফোর্ডের অল সোলস্ কলেজের ফেলো রবার্ট জ্যাকসন (Robert Jackson) ১৯৭২ সালের বসন্তকালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর জন্য *সাউথ এশিয়ান ক্রাইসিস* বইটি লেখেন যা প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। এ বইটিতে সংঘাতের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখানে দক্ষিণ এশিয়ায় ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা করা ছাড়াও বৃহৎ শক্তি ও তাদের প্রতিপক্ষ কীভাবে এ সংকটে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল তারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাঁর বইয়ের বিষয়বস্তু অন্যান্য পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের মতো হলেও বিস্তারিত বিবরণ ও গুরুত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে তা কিছুটা ভিন্ন। শেষ অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ের বিষয়গুলো নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যেখানে ভারতের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ ছাড়া ১৯৭১-এর পরিস্থিতিতে যে শেষ ফলাফলে উপনীত হওয়া যেতো না তার উল্লেখ করা হয়েছে। একই সাথে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে বিশ্ব শক্তিগুলোর প্রতিক্রিয়া ও সংঘাতে তাদের জড়িত হওয়ার বিষয়টিও।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত পর্যায়ে বেশ কিছু প্রকাশনা পাওয়া যায়, যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও তথ্যবহুল। যাদের এ সব প্রকাশনা তারা কেউই সংঘাতে সরাসরি জড়িত ছিলেন না, কিন্তু যে কোনো এক পক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাদের। প্রধান বিষয়বস্তু নিয়ে গবেষণাধর্মী তাদের বইগুলো যুদ্ধের গবেষণার একটি যথার্থ সংযোজন।

এরূপ তিনজন লেখককে একই শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে, তারা হলেন-একজন বাংলাদেশী, দ্বিতীয়জন পাকিস্তানী ও তৃতীয়জন বৃটিশ।

বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রওনক জাহান লিখিত বই *'পাকিস্তান:ফেইলিওর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন' (Pakistan: Failure in National Integration) (১৯৭২)*- এর উপসংহারের শিরোনাম হচ্ছে- 'পাকিস্তানের বিভাজন ও বাংলাদেশের জন্ম।' বইটির প্রকাশনার তারিখ থেকে যা দেখা যায় সে হিসেবে ও এর সংক্ষিপ্তসারে রওনক জাহান সুস্পষ্টভাবে বাঙালিদের ক্ষোভের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। বিশেষ করে তিনি আইয়ুব আমল-এর সময়কার ঘটনাবলীর উপরই জোড় দিয়েছেন। তাই নি:সন্দেহে এ বইটিকে বিশেষ করে ১৯৭১ সালের উপর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ বলা যাবে না। বরং এতে ঘটনার (১৯৭১) জন্য দায়ী ইস্যুগুলোর একরকম সংক্ষিপ্তাসার উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহারের তিন-চর্তুথাংশ জুড়ে রয়েছে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ঘটনাসমূহের সংক্ষিপ্ত ও ভারসাম্যমূলক বিশ্লেষণ।এতে দেখানো হয়েছে আইয়ুব খানের চিন্তার বিপরীতে ইয়াহিয়া খানের চিন্তায় ছিল রাজনীতিবিদ ও রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা এবং এ সবের স্বীকৃতি। বলা হয়েছে ইয়াহিয়া খান বাঙালিদের দাবির প্রতি অনেক ছাড় দিতে চেয়েছিলেন ও তাঁর মনোভাব ছিল আপোষকামী। এছাড়া তিনি ১৯৭০ সালে একটি সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানেও সফল হয়েছিলেন। তবে নির্বাচন উত্তর সংকট যা একপর্যায়ে ১৯৭১ সালের সংঘাতের সূচনা করে তার জন্য দায়ী ছিলেন ভুট্টো। যা হোক,নয় মাসের সংঘাতের শেষ পর্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি (রওনক জাহান) কোনোরূপ স্বীকৃত গবেষণা ছাড়াই প্রচলিত বর্ণনার উপর নির্ভর করেছেন বলে মনে হয়েছে- যা যুক্তিতর্ককে অনেকখানি দুর্বল করে দিয়েছে। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন ভূমিকা ও যুদ্ধের শেষ পর্যায়েই কেবল ভারতের সম্পৃক্ততা প্রশ্নে তার অভিমতগুলো যুক্তির দুর্বল দিকগুলোকেই চিহ্নিত করেছে। এছাড়া পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত 'চরম বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ড যা গণহত্যার পর্যায়ে পড়ে' এমন অভিযোগের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায় যেখানে হত্যাকাণ্ড নিয়ে বর্তমানে প্রচলিত দাবি 'এক লাখ থেকে ত্রিশ লাখ মানুষ বাংলাদেশের যুদ্ধে নিহত হয়েছেন' এমন প্রসঙ্গে তার অভিমত যুক্তিপূর্ণ নয় বলে মনে হয়।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লে. জেনারেল কামাল মতিনউদ্দিন যিনি পরবর্তীতে *ইসলামাবাদ ইন্সটিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক ষ্টাডিজ*-এর মহাপরিচালক ছিলেন তিনি বাঙালিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগের বিষয়ে রওনক জাহানের সাথে সরাসরি দ্বিমত পোষণ করেছেন। বাঙালিদের সাথে পক্ষপাতমূলক আচরণের বিষয়টি পৃথক ও স্পষ্ট বিতর্কিত বিষয় হিসেবেই উল্লেখিত হয়েছে তার লেখা *'ট্রাডেজি অফ এররস্: ইস্ট পাকিস্তান ক্রাই-সিস' (Tragedy of Errors: East Pakistan Crisis 1968-71[1993])* বইয়ে। নি:সন্দেহে এটি একটি তথ্যবহুল, বিশ্লেষণমূলক ও বিশদ বর্ণনা সমৃদ্ধ বই যাতে সেনা অভিযানের জন্য তৎকালীন সামরিক শাসকের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারপরও বলা যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল হিসেবে তাকে কখনোই সত্যিকার

www.pathagar.com

অর্থে একজন নিরপেক্ষ ও স্বাধীন অভিমত প্রদানকারী বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ যেমন হিন্দু ছাত্রদের ভূমিকা, অবাঙালিদের বিরুদ্ধে আতংক সৃষ্টি করা, আওয়ামী লীগের দ্বারা একটি সশস্ত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা করা এবং পূর্ব পাকিস্তানে গোলযোগ সৃষ্টি করায় ভারতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি যে অভিমত দিয়েছেন তা তাঁর নিরপেক্ষতা হ্রাস করেছে।

একজন বৃটিশ ইতিহাসবিদ, সিভিল সার্ভেন্ট ও সাংবাদিক এল.এফ.রাশব্রুক উইলিয়ামস (L. F. Rushbrook Williams) ১৯৭১ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তানে সংঘাত চলছিলো তখনই লিখেছিলেন *'ইস্ট পাকিস্তান ট্রাজেডি' (The East Pakistan Tragedy)* শিরোনামের বইটি। কারণ ওই সংকটকে যেভাবে বিশ্বের বুকে প্রচার করা হয়েছিল তা দেখে তিনি হতবাক হয়েছিলেন। ওই অঞ্চলকে ভালোভাবে জানার ফলে ওই সময়ে তিনবার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ঘুরে আসার পর তিনি এ বইটি লেখেন। এল.এফ. রাশব্রুক উইলিয়ামস ছিলেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্পর্কিত একজন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিদেশী নাগরিক এবং তাঁর রচিত বইয়ে ওই সংঘাতে বিশেষ একটি পক্ষকে সুনজরে দেখার আশা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বইটি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য, উপলব্ধি করার মতো প্রশ্ন ও পর্যবেক্ষণ করার মতো বিষয়ে ভরপুর রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, নির্বাচন পরবর্তী সমঝোতা প্রক্রিয়া বা সেনা অভিযান সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে বইটি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও সেনাবাহিনীর পক্ষে সমর্থন দিয়েছে। তিনি আওয়ামী লীগের উগ্র কর্মীবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে প্রকৃত 'গণহত্যা' বলে আখ্যায়িত করেছেন ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা গুজবকে অস্বীকার করেছেন। তিনি ইয়াহিয়া খানের সাথে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছেন ও শাসকগোষ্ঠী প্রণীত শ্বেতপত্রকে গ্রহণ করেছেন তুলনামূলক কম জটিল হিসেবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে পাক সরকারের প্রচেষ্টাকেও তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। এ ধরনের অভিমতকে অনেকেই হয়তো পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ ও ভারতের তীব্র বিরোধীতা এবং ধোকাবাজ পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনা করায় তিনি হয়তো পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবেই বিবেচিত হবেন।

যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর ব্যাপকতর গবেষণায় কখনো কখনো দক্ষিণ এশিয়ার ১৯৭১ সালের সংঘর্ষের বিষয়ে অল্পবিস্তর উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এরূপ একটি উদাহরণ হচ্ছে- আন্তর্জাতিক যুদ্ধে রণাঙ্গনে নিহতদের নিয়ে *Obermeyer etal. in the British Medical Journal (2008)*-এর আলোচনা যেখানে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ওসলো'র উপ্সালা বিশ্ববিদ্যালয় (Uppsala University) ও আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (International Peace Reaserch Institute)-এর সশস্ত্র সংঘর্ষ সম্পর্কিত তথ্যাসমূহ। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে ওসলোর এ প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী যুদ্ধে ৫৮,০০০ মানুষ নিহত হওয়ার সংখ্যাটি প্রকৃতার্থে সঠিক নয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান এ সংখ্যাকে বাড়িয়ে নিহতের সংখ্যা ২,৬৯,০০০ জনে উন্নীত করেছে (মৃতের সংখ্যা ১,২৫,০০০ থেকে ৫,০৫,০০০-এর মধ্যে)।

সরকারি দলিলসমূহ

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০০৫ সালে ১৯৭১-এর সংকট নিয়ে একটি দলিল প্রকাশ করেছে *'দক্ষিণ এশিয়ার সংকট, ১৯৭১'* শিরোনামে যা *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক,*

www.pathagar.com

১৯৬৯-১৯৭৬ (২০০৫) পর্বের নবম খণ্ডে সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি সংকট চলাকালীন নিক্সন প্রশাসনের মধ্যে আলোচনার একটি অমূল্য দলিল। সংঘাতে মার্কিন সরকারের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে যে কোনো গবেষণার জন্য এ দলিলটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি তথ্যসম্ভার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বিভিন্ন কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত সীমিত সরকারি দলিল হতাশাজনক ও অনির্ভরযোগ্য। পাকিস্তান সরকার ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে *পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের উপর একটি শ্বেতপত্র* প্রকাশ করেছিলো। এ শ্বেতপত্রে নির্বাচনোত্তর আলোচনায় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের প্রেক্ষিতে প্রতিদিনের ঘটনার বিবরণ, একটি অধ্যায়ে সংকটকালীন ভারতের ভূমিকা, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বাঙালি বিদ্রোহীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শ্বেতপত্রের অসুবিধাজনক দিকটা হচ্ছে এটি শাসকগোষ্ঠীর সরকারি মতামত এবং এতে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতকে উপস্থাপন করা হয়েছে। শ্বেতপত্রের সুবিধাজনক দিক হচ্ছে এতে ঘটনার তারিখ, স্থান বিস্তারিত দেয়া হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে গবেষণার কাজ যেমন সহজে হবে- তেমনি শ্বেতপত্রে উল্লেখিত ঘটনাবলীর ব্যাপারে যাচাই-বাছাইয়ের কাজও করা যাবে। মেজর জেনারেল শওকত রিজার পাকিস্তান সেনাবাহিনী (১৯৬৬-৭১) সম্পর্কে বর্ণনাও মোটামুটি একপেশে এবং এটি লেখা হয়েছিল সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হকের পৃষ্ঠপোষকতায়। যা হোক, এ বইটিতেও তারিখ, স্থান ও ঘটনার অনেক বর্ণনা দেয়া আছে যা গবেষকদের কাজে সহায়ক হতে পারে।

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সরকার ডিক্লাসিফাইড (এক সময়ে গোপনীয় ছিল এমন নথি যা প্রকাশ করে দেয়া হচ্ছে) হিসেবে ঘোষণা করার প্রেক্ষিতে ভ্যানগার্ড বুকস তা প্রকাশ করে। এটি সীমিত আকারে হলেও কার্যকর তথ্যসূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে, তবে এটিও অনেক সমস্যা জর্জরিত। কারণ প্রকাশিত শ্বেতপত্রটি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গুজব আছে যে এটি কমিশনের পূর্ণ রিপোর্ট নয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো হচ্ছে কমিশনের তদন্ত চালানোর সীমিত এখতিয়ার, বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে স্বাধীনভাবে কাজ করার সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন ও সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে নিম্নমান বজায় রাখার অভিযোগ। এখানে 'প্রমাণ' হিসেবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে আসলে 'অভিযোগ' যেখানে দায়ী ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শীর দেয়া সাক্ষ্য প্রমাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো সুযোগ ছিল না। শ্বেতপত্রে দেখা যায় সহজ টার্গেট হিসেবে ইয়াহিয়া বা নিয়াজীর ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু জেনারেল টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী ও সে সময়কার ক্ষমতায় থাকা রাজনীতিক জুলফিকার আলী ভুট্টোর ব্যাপারে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। অবাধ ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে জেনারেল ইয়াহিয়া ও জেনারেল নিয়াজীসহ কয়েকজনের জন্য জনসম্মুখে ও কোর্ট মার্শালে বিচার হওয়া প্রয়োজন ছিল যা এ দুই জেনারেল নিজেরাই দাবি করেছিলেন। তারা বলেছেন যে, তাদের এ ধরনের বিচারের সুযোগ দেয়া হয়নি ও এর ফলে সম্পূর্ণ ঘটনা প্রবাহের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ উদ্‌ঘাটনের সুযোগ থেকে কমিশন বঞ্চিত হয়েছে। এ সকল সমস্যা কমিশন রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা থেকে বঞ্চিত করেছে।

বাংলাদেশ সরকার '*স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস*' শিরোনামে প্রকাশ করেছে পনের খণ্ডের দলিল। এ খণ্ডগুলোতে সংযুক্ত করা হয়েছে ঐতিহাসিক পটভূমি যার মধ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গবঙ্গের বিষয়ও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এ খণ্ডগুলোতে গবেষকদের জন্য বাঙালি

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৭১ সালের ঘটনার অনেক মজাদার বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যা হোক, ওই দলিলগুলোতে রয়েছে দু'টি মৌলিক সমস্যা- একটি হচ্ছে সাধারণভাবে সম্পাদনার দুর্বলতা ও অন্যটি হলো একপক্ষীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় ঘটনার বিশ্লেষণ যা এর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে অনেকখানি। এর ফলে এতে অন্তর্ভূক্ত তথ্যসমূহ কেবলমাত্র আংশিক উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর একটি খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে পাকিস্তান সরকার প্রণীত তথ্য উপাত্তসমূহ। কিন্তু সার্বিকভাবে সংগ্রহটিতে পূর্ব পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা বা সকল পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্ণ উপস্থাপন করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের এ দলিলটিকে সামগ্রিকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির দোষে দুষ্ট মনে হতে পারে। এছাড়া অন্তর্ভূক্ত দলিলসমূহে গুরুত্ব বা প্রাসঙ্গিকতায় ব্যাপক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুসমূহ ব্যাপকভাবে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে বলেই মনে হয়েছে এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টসহ জানা বিষয়গুলো যা মূল ঘটনার সাথে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে সেগুলো বাদ দেয়া হয়েছে *স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস* থেকে।

যারা অংশগ্রহণ করেননি তাদের ধারাবর্ণনা

কয়েকজন সাংবাদিক ও লেখক ১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর বেশকিছু বই ও নিবন্ধ লিখেছেন যারা ওই সংঘাতের সাথে জড়িত ছিলেন না বা যা নিয়ে লিখেছেন সে সব ঘটনার সাথেও সম্পর্কিত ছিলেন না, তাদের প্রকাশনাগুলো পক্ষপাতহীন ছিল না বা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের বিশ্লেষণও তাতে পাওয়া যায়নি। এ সব লেখক-সাংবাদিকের কোনো না কোনোভাবে যে কোনো একপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ ছিল আর সে জন্যই তাদের লেখাগুলোর মাঝে বিশেষ এক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিই ফুটে উঠেছে।

এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একজন লেখক হচ্ছেন এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস। এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস একজন পাকিস্তানী সাংবাদিক যিনি বৃটেনে পালিয়ে গিয়ে ও পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাদের অভিযানকে নিন্দা করে *'সানডে টাইমসে'* প্রতিবেদন লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা অভিযানের পর পাকিস্তান সরকার যে একদল সাংবাদিককে প্রথমবারের মতো ওই বছর এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন স্থান দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। *'সানডে টাইমসে'* এ্যান্থনী ম্যাসকারনেহাসের প্রতিবেদন ছিল গা শিউরে ওঠা বিবরণে পরিপূর্ণ যেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কারণে-অকারণে রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের সমূলে ধ্বংস করতে খুব খুশী মনেই যখন তখন ইচ্ছেমতো অস্ত্রের ট্রিগার টিপে দিতো। অবশ্য প্রতিবেদনে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের চলমান গৃহযুদ্ধে দু'পক্ষের অপকর্মের বিবরণও তিনি দিয়েছেন। ম্যাসকারেনহাস তার প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলোর কলেবরে বৃদ্ধি করে *'দি রেপ অব বাংলাদেশ'* শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করেন যা ওই বছরই অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। সেনা অভিযানকে প্রচণ্ড ঘৃণার চোখে দেখার জন্য ম্যাসকারেনহাস সহানুভূতি পেতে পারেন। কিন্তু তাঁর দেয়া বর্ণনাগুলো ছিল আবেগতাড়িত। তার অনেক বর্ণনার পিছনে কোনো সমর্থনযোগ্য তথ্য ছিল না বলে এগুলো ছিল যথেষ্ট দুর্বল। এ গবেষণায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে অনেক বর্ণিত ঘটনার তিনি নিজে প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না যেগুলো পরবর্তীতে পুরোপুরি ভুল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেশে প্রথম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও এরপর রাজনীতিবিদদের সাথে নির্বাচনোত্তর

www.pathagar.com

সমঝোতা প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান কখনোই বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক ছিলেন না বলে ম্যাসকারেনহাস তাঁর বইয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সংঘাতের ব্যাপারে অনেক মতবাদের এটিও একটি বহুল প্রচারিত ও পরিচিত ধারণা, কিন্তু এটাকে সমর্থন করতে ম্যাসকারেনহাস কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। তিনি ছয় দফার অর্থপ্রকাশকে আরো আকর্ষণীয় করেছিলেন ও আওয়ামী লীগের দাবি দাওয়াকে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে তাঁর সাথে শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিল যার উপরে ভিত্তি করেই তিনি এসব অভিমত প্রদান করেছেন।

বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরালো সমর্থন দান ও সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপনের আগ্রহ তাঁর ওই বইটিকে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর পক্ষে প্রচারণার উপকরণে পরিণত করেছে। যা হোক, এতে অনেক পরস্পর বিরোধী মতামত আছে। মার্চ মাস সংক্রান্ত অধ্যায়টি ম্যাসকানেহাসের নিজের অবস্থানকে অনেকখানি খাটো করেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসারসহ আন্দোলনের অনেক কট্টর কর্মীদের তৎপরতার বিপরীতে ম্যাসকারেনহাস সমঝোতা প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ায় শেখ মুজিবের ইচ্ছার কঠোর সমালোচনা করেছেন। বইটিতে 'গণহত্যা' শব্দটিকে সামরিক অভিযানের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু কি কারণে তাকে গণহত্যা বলা হবে তার কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা যুক্তি দেয়া হয়নি। নিষ্ঠুরতা, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বেশ কিছু প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হলেও পরবর্তীতে সেগুলো প্রমাণিত হয়েছে অতিরঞ্জিত বা বিকৃত বলে। তার পরের বই- *'বাংলাদেশ: এ লিগেসী অব ব্লাড'* (১৯৮৬) যেটিতে ম্যাসকারেনহাস বাংলাদেশ সৃষ্টির পর হত্যা আর পাল্টা হত্যার ব্যাপক বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি শেখ মুজিব, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও জেনারেল জিয়াউর রহমানকে নতুন দেশের আশা-ভরসার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দায়ী করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি শেখ মুজিবের রক্ষী বাহিনীকে তুলনা করেছেন নাৎসী ব্রাউন শার্টের সাথে ।

সংঘাত চলাকালীন অন্য একটি বই দ্রুত প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল যেটি ছিল সাংবাদিক ডেভিড লোশাকে'র লেখা *'পাকিস্তান ক্রাইসিস'* (১৯৭১)। লেখক স্বীকার করেছেন এটি একটি সাংবাদিকতা ধাঁচের কাজ, একাডেমীক ধরনের কোনো কাজ নয়। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়োজিত একজন সংবাদ প্রতিনিধি হিসেবে তিনি কেবলমাত্র যে সব ঘটনা সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণা ছিল সেগুলোতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর মতামত দেয়ার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হননি, কিন্তু সংঘাত চালাকালীন এ ধরনের কাজ যা জানার গভীরতা ও দাবির যথার্থতা ছাড়াই সম্পন্ন করা হয়েছে তা সংকটকে বোঝার জন্য খুব কমই সহায়ক হতে পারে। অন্য একটি গবেষণামূলক কাজ যা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়, সেটি হচ্ছে লরেন্স লিফৎসুলজ-এর *'বাংলাদেশ:দি আনফিনিশ্‌ড রেভ্যুলিউশন'* (১৯৭৯)। কিন্তু এ বইটি ১৯৭৫ সালে সংঘটিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান এবং ষড়যন্ত্রের জটিল গল্প সম্পর্কিত একটি প্রকাশনা হিসেবেই অধিক প্রযোজ্য হতে পারে (তাঁর দেয়া ঘটনার বর্ণনার সাথে ম্যাসকারেনহাসের বর্ণনার অনেক অমিল রয়েছে এবং সিসন ও রোজ তাঁর বইয়ে উল্লেখিত তথ্যের বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করেছেন।) বাঙালিদের প্রকাশিত বর্ণনাগুলোর মধ্যে কয়েকটিকে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য হিসেবে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় একপেশে বর্ণনা। এ লেখকদের লেখাগুলোকে এ বিবেচনাতে নিয়েই পড়া দরকার। উদাহরণস্বরূপ মঈদুল হাসান-এর যুদ্ধের বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে (১৯৮৫-১৯৯২)। তাঁর লেখা যেন

www.pathagar.com

বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন ও ভারতে-এ অবস্থানরত 'প্রবাসী সরকারের' নীতিমালাকেই প্রতিফলিত করেছে। নীলিমা ইব্রাহীমের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (১৯৮৯) হোক বা সাতজন বাঙালি নারীর (১৯৯৮-২০০০) কাল্পনিক ধাঁচের অভিজ্ঞতার কথাই হোক সেগুলো অবশ্যই বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন ঘোর সমর্থকের মতামতকেই চিত্রিত করেছে। অন্যান্য একপেশে বর্ণনা যা সেগুলোকে নিজ সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে তা পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। নীরদ সি চৌধুরী তীব্র সমালোচনার মাধ্যমে তাঁর যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা সীমান্তের উভয় দিকের বাঙালির বিপক্ষেই গেছে।

কুতুবউদ্দিন আজিজের লেখা বই *'ব্লাড এণ্ড টিয়ারস্'* (১৯৭৪) মূলতঃ বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে কীভাবে ব্যাপকহারে হত্যা করেছিল ও তাদের উপর নির্যাতন ও জুলুম চালিয়েছিল তারই বিশদ বিবরণ সমৃদ্ধ একটি সংগ্রহ। ওইসব হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে বেঁচে যাওয়াদের সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করেই বইটি রচনা করা হয়েছে। এ বইটি হচ্ছে পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকারী একটি পক্ষের মতামত বা সাক্ষ্যর উপর ভিত্তি করে গ্রন্থিত একটি প্রকাশনা। এতে সংঘাতকালে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতা ও বর্বরতার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক শিক্ষক এম আব্দুল মুমিন চৌধুরী'র *'বিহাইন্ড দি মিথ অব থ্রি মিলিয়ন'* বইয়ের মতো প্রকাশনাগুলোর বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা দুষ্কর। কারণ এগুলো প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে। তবে এগুলোতে বেশ বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে যেগুলো বাংলাদেশে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা যেতে পারে যদি কখনো প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

অংশগ্রহণকারীদের বর্ণনা

১৯৭১ সালের উপর প্রকাশিত বিষয়ের বৃহৎ কাজটি হয়েছে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের উপর ভিত্তি করে যেখানে রয়েছে ছোট ছোট বিবৃতি থেকে শুরু করে পরিপূর্ণ গ্রন্থ। এগুলো অত্যাবশকীয় মূল উপাদান সরবরাহ করেছে, কিন্তু এর অনেকগুলোই গুণগত মানে অসম যেখানে প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য এগুলোর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

মার্কিনী, ভারতীয়, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশীদের দ্বারা ১৯৭১ সালের সংঘাতের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনা ইংরেজীতে পাওয়া যায়, আবার অনেক বাঙালি ওই সংঘাতে অংশগ্রহণকারী হিসেবে বাংলায় তাদের স্মৃতিচারণ করেছেন। এ ধরনের সরাসরি ব্যক্তিগত বর্ণনার ঘটনা সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এরা সকলেই তাদের নিজস্ব পক্ষকে যথার্থ প্রমাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন বলে তাদের বর্ণনায় তথ্যের ভারসাম্য খুঁজতে যাওয়া ঠিক হবে না। অর্থাৎ বলা যেতে পারে কোনোভাবেই এদের সকল বর্ণনাই যে সঠিক হবে তার শতভাগ নিশ্চয়তা দেয়া যায় না।

মার্কিনী : ঢাকার মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন। আর্চার ব্লাড ২০০২ সালে তার আত্মজীবনী প্রকাশ করেন। ব্লাড সে সময় বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে যে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন তাতেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর আত্মজীবনীতে সহানুভূতিপূর্ণ বর্ণনা স্থান পেয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তান সংকটের উপর ঢাকায় মার্কিন

www.pathagar.com

কূটনৈতিক চত্বর থেকে আকর্ষণীয়ভাবে ঘটনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ বইটি ১৯৭১ সম্পর্কে জানার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকাশনা যেখানে তথ্যভিত্তিক বর্ণনা রয়েছে ও অন্তর্দৃষ্টির সাথে ঘটনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য উপস্থাপনায় ভুল ভ্রান্তি থাকলেও বইটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচিত হবে।

১৯৭১ সালের সংকট নিয়ে গ্রন্থিত কিসিঞ্জারের *'হোয়াইট হাউস ইয়ারস্'* ও নিক্সনের *'মেময়ারস্'* বই দু'টিতে প্রকাশ পেয়েছে সে সময়ের দু'জন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার সাথে জড়িত দু'জন মূল খেলোয়াড়ের দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে দু'জনের মধ্যে সে সময় যে সব বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় তারও বিবরণ রয়েছে যা মার্কিন নীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ায় সংকটের উপর স্মৃতিচারণ করার ক্ষেত্রে সেসময় চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল তা মিলিয়ে পড়া উচিত। পাকিস্তানে মার্কিন দূতাবাসে সামরিক প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত চুক ইয়েগের-এর আত্মজীবনীতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধ ফুটে উঠেছে আশ্চর্যজনকভাবে।

ভারতীয় : ১৯৭১ সালের উপর প্রকাশিত অধিকাংশ ভারতীয় প্রকাশনা বছরের শেষ দিকের পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের জয়লাভের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। যা হোক, ভারতীয় পক্ষের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে লিখেছেন বলে মনে হয় না। যেমন ইষ্টার্ণ কমান্ডারের কথাই বলা যেতে পারে এবং ডিভিশনাল কমান্ডারগণ ও তেমন কেউই যারা যুদ্ধে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে যাননি। মাত্র কয়েকজন তাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। এ ক্ষেত্রে লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব-এর *'সারেণ্ডার এট ঢাকা'* (২০০১) বইটি হচ্ছে তদ্রূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। এটি সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজনের প্রামাণিক সাক্ষ্য।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের উপর মেজর জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং-এর বইটি মূলত: গ্রন্থিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মতৎপরতার উপর যা তিন খণ্ডের একটি গবেষণাকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে। মেজর জেনারেল লচমন সিং-এর বর্ণনা সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার উপর ভিত্তি করে রচিত, যাদের কেউ তাদের অভিজ্ঞতার কথা নিজে লিপিবদ্ধ করেননি। ভারতীয় লেখকদের এ বইগুলো যুদ্ধ নিয়ে নিজেদের মাঝে 'উত্তপ্তযুদ্ধ' ও যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে যুক্তিতর্কে আচ্ছন্ন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এ বইগুলোতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে মতভেদ, এমনকি একটি বড় বিজয়ের বর্ণনা দেয়া নিয়েও ভারতীয় কর্মকর্তাদের একে অপরের কঠোর সমালোচনার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে বেশ দৃষ্টিকটুভাবে।

পাকিস্তানী : লে. জেনারেল এ এ কে নিয়াজী লিখেছেন *'দি বিট্রেয়াল অফ ইস্ট পাকিস্তান'* (১৯৯৮)। বইটিতে নিয়াজী তাঁর অভিজ্ঞতা ও একজন পাকিস্তানী কমান্ডারের পূর্ব রণাঙ্গন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি লিপিবদ্ধ করেছেন। যদিও জেনারেল নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে অবস্থান করছিলেন তারপরও তিনি বইটিতে সংঘাতের শেষ দিনগুলো এবং যুদ্ধ পরিকল্পনার বিস্তারিত বর্ণনার উপর অপরিহার্যভাবে জোর দিয়েছেন। যুদ্ধের শেষে তাঁর দেশে যেভাবে তাঁর প্রতি বিরূপ আচরণ করা হয়েছে সেটাকে তিনি বড় ধরনের অবিচার বলেই মনে করেছিলেন এবং এর প্রতিবাদে জেনারেল নিয়াজী তাঁর নিজের বিবরণ লিখে যাওয়ার কথা চিন্তা করেন। বলা যায় তাঁর প্রতি

www.pathagar.com

অপমানসূচক ব্যবহারই তাঁকে এ বইটি লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ সব সত্ত্বেও সংঘাতের অন্যতম নায়ক হিসেবে তার বর্ণনা অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর অনেক বর্ণনাই অন্যদের বর্ণনার সাথে তুলনা করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

আরো বেশ কিছু পাকিস্তানী কর্মকর্তা ১৯৭১ সালের সংঘাত নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। কিছু প্রকাশিত হয়েছে বই হিসেবে, অন্যগুলো নিবন্ধ হিসেবে এবং তারপরও আরো অনেক অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। ভারতীয় অফিসারদের ন্যায়, পাকিস্তানী সেনা অফিসারদের মধ্যেও যুদ্ধ পরিকল্পনা ও বছরের শেষে ভারতের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে মতভেদ ছিল। কিন্তু সংঘাত চলাকালীন পূর্ব পাকিস্তানে থাকায় তাদের দেয়া বর্ণনা সরেজমিনে ঘটনার পুনর্গঠন ও বিশ্লেষণের জন্য মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

আরো কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা ১৯৭১ সালের সংঘাতে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বই লিখেছেন। মে. জেনারেল এ ও মিঠা'র আত্মজীবনী (২০০৩) ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহসহ তাঁর নিজের জীবনের পূর্ণগল্প। অনেকে অবশ্য জেনারেল মিঠার বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে একমত হবেন না তারপরও ঘটনাগুলোর বর্ণনা যথেষ্ট সহায়ক ও প্রয়োজনীয়। মে. জেনারেল এইচ এ কোরেশী'র বইটিতে কেবলমাত্র ১৯৭১ সালের সংঘাতের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এটি যুদ্ধকালীন একজন কমান্ডারের পূর্ণসময়ে মাঠে উপস্থিত সৈনিকের ন্যায় বর্ণনামূলক বই। অনেকে মনে করেন ওই বছর যুদ্ধক্ষেত্রে যারা নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে (কমান্ড পজিশনে) ছিলেন তাদের কাছে থেকে ঘটনার অনেক বেশি বর্ণনা পাওয়া যেতো যদি তারা বই লিখে যেতেন।

সাহাবজাদা ইয়াকুব খান, যিনি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আর চাকরি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি সে সময় তাঁর পাঠানো টেলিগ্রামগুলো উপস্থাপন করেন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ বোঝানোর জন্য। (২০০৫)। আইয়ুব খানের ডায়েরী (২০০৭) থেকে সাবেক সামরিক শাসকের ব্যক্তিগত মতামত পাওয়া যায় যদিও যিনি সে সময় সঠিক বা পূর্ণতথ্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বেসামরিক আমলা রোয়েদাদ খানের স্মৃতিকথা (২০০৪) হচ্ছে শিক্ষামূলক বর্ণনা সমৃদ্ধ একটি প্রকাশনা যাতে প্রত্যক্ষদর্শীর বরাতে ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকাশিত নিবন্ধের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ হায়াতের (১৯৯৮) নিবন্ধ একটি ইউনিটের অভিজ্ঞতার সরজমিন বর্ণনা যে ইউনিটটি ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ভিন্ন স্থানে আত্মসমর্পণের নির্দেশে হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া মেজর জেনারেল কোরেশীর বর্ণনাও অনেকটা একই রকম । সাক্ষাতকারের আদলে রচিত নিবন্ধগুলো যেমন ব্রিগেডিয়ার তাজের (২০০২) দেয়া বর্ণনায় একটি গুরুতপূর্ণ মুহূর্তে দায়িত্বপালনকারী একজন কমান্ডারের অভিজ্ঞতার ব্যাপক তথ্য পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখিত অনেক ঘটনা নিয়ে আমি লেখকদের সরাসরি সাক্ষাতকার নিয়েছি যার ভিত্তিতে তৈরি করেছি এই গবেষণার বিষয়বস্তু। অন্যান্য ক্ষেত্রে লেখকরা, যেমন ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ ও ব্রিগেডিয়ার শওকত কাদির পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্জাত অপ্রকাশিত বিষয়বস্তু দয়াপরবশ হয়ে আমার সাথে ভাগাভাগি করেছেন। পাকিস্তানী কর্মকর্তা যারা ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন তাদের অনেকের বিবরণ এ গবেষণার কাজে সীমিতাকারে ব্যবহারের উপযোগী বলে মনে হয়েছে। তবে এরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ধারাবর্ণনায় তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে গেছেন যেগুলো মাঠ পর্যায়ের ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

www.pathagar.com

এদিকে শুধুমাত্র একজন দর্শক হিসেবে ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী'র *'ইস্ট পাকিস্তান:দি এন্ড গেম'* বইটির সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠেছে এর 'এন অনলুকারস্ জার্নাল' (১৯৬৯-৭১) সাবটাইটেলের মধ্য দিয়ে। তাৎক্ষণিক তথ্য পেতে বইটি মূল্যবান, তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে লেখক ছিলেন প্রকৃতপক্ষে একজন 'দর্শক,' প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা ও পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত সেনা কর্মকর্তা হিসেবে যিনি বিশেষ বিশেষ সময় ঢাকা সফর করেছেন মাত্র। সিদ্দিক সালিক, যিনি লিখেছেন *'উইটনেস টু সারেন্ডার' (১৯৭৭)*, ইনিও ছিলেন জনসংযোগ কর্মকর্তা , তবে দায়িত্বপালন করেছেন পূর্ব পাকিস্তানে। যার ফলে তাঁর এ বইয়ে অনেক ঘটনার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বিশেষ করে এতে দেয়া হয়েছে দু'বছরের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের বিস্তারিত বর্ণনা। যা হোক সিদ্দিক সালিকের বইয়ে সামরিক বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত তথ্য দেয়া আছে বলে জেনারেল মিঠা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত একজন জুনিয়র অফিসার হিসেবে জনসংযোগ কর্মকর্তার দায়িত্বে থেকে যুদ্ধের ময়দানে সেনা বিন্যাসের ব্যাপারে লিখেছেন যা তার জানার কথা নয় বা সে বিষয়ে তাঁর পর্যাপ্ত জ্ঞান আশা করা যায় না। একজন বেসামরিক আমলা হিসেবে হাসান জহীর পূর্ব পাকিস্তানকে ভালোভাবেই জানতেন যিনি সেখানে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন এবং ১৯৭১ সালের মে মাসে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসনে। তিনি তার সরাসরি বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরেও তাঁর বইয়ে (২০০১) অনেক বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।
তিনি যেখানে প্রথম দিকের দশকগুলোতে বাঙালি বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকড় সঠিকভাবে সন্ধান করেছেন, তেমনি ইয়াহিয়ারও তীব্র সমালোচনা করেছেন পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবির প্রেক্ষিতে প্রণীত রাজনৈতিক পদ্ধতির সংস্কারের জন্য। তিনি শেখ মুজিবকে রাজনৈতিক আলোচনার টেবিলে বসতে ইয়াহিয়ার উদ্যোগেরও সমালোচনা করেছেন। তাঁর বইয়ে বেশকিছু ধারা বর্ণনা করা হয়েছে সরজমিন অভিজ্ঞতার বাইরে।

বাংলাদেশী : যে সকল বাঙালি অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন বা যারা পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে প্রত্যাশা করেননি ও আওয়ামী লীগের শাসনের পক্ষে ছিলেন না তাদের হাতেগোনা প্রকাশনা পাওয়া যায়। তবে তাদের প্রকাশিত লেখাগুলো সতর্কতার সাথে পড়ে দেখা দরকার। জি.ডবিউ.চৌধুরীর *'দি লাস্ট ডেজ অফ ইউনাইটেড পাকিস্তান' (১৯৭৪)* বইটি সুবিধাজনক অবস্থান থাকা একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির লেখা একটি গবেষণাকর্ম। জান্তার সাথে জড়িত থাকায় পর্দার অন্তরালের অনেক ঘটনাই তিনি জানতে পেরেছিলেন। তাঁর বইয়ে তিনি একদিকে বাঙালিদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন, অন্যদিকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত সদিচ্ছাকে সমর্থন জানিয়েছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও ১৯৭১ সালের সংঘাতকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসন-এর *'দি ওয়েস্টেস অফ টাইম'* (১৯৯৫) বইটিও তথ্যবহুল ও প্রাণবন্ত বর্ণনায় ভরপুর। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন কেন তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি প্রাণবন্ত বর্ণনা দিয়ে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন কীভাবে তাকে নতুন দেশ-বাংলাদেশে একজন দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হোস্টেল 'রোকেয়া হলের' প্রভোষ্ট বেগম আখতার ইমাম (১৯৯৮-২০০২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও হোস্টেলের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ঘটনার বর্ণনা থেকে ছিল লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন। সে সময়

www.pathagar.com

তিনি নানাভাবে ভুক্তভোগী হলেও তাকে পরবর্তীতে দালাল হিসেবে চিহ্নিত হতে হয়েছিল। একজন দেশপ্রেমিক ও সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল চাকমা প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় তাঁর আত্মজীবনী *'দি ডিপার্টেড মেলোডী'* (২০০৩)-তে পূর্ব পাকিস্তানে উগ্রবাঙালি জাতীয়তাবাদ উত্থানের বিরুদ্ধে চাকমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশী-স্বাধীনতার সাহিত্য: বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বিশাল ইতিহাস আছে, প্রথমতঃ বাংলা ভাষায়। স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের অনেকেরই ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা আছে- যাদের মধ্যে রয়েছেন সেনাবাহিনীর সদস্য যারা বিদ্রোহ করেছিলেন ও বেসামরিক ব্যক্তি যারা সরাসরি বা সমর্থক ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা। এ ছাড়া অনেকেই ব্যক্তিগত আগ্রহ নিয়ে যারা ওই সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বা যারা যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তাদের কাছ থেকে ঘটনার বিস্তারিত শুনে ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু ওই সব বর্ণনার উপযোগিতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে ব্যাপকভাবে বিসদৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায়। ঘটনায় অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ব্যক্তিগত বর্ণনাকে মৌলিক তথ্যের উৎস হিসেবে ধরে নেয়া হলেও দেখা যায় যে এগুলোতে প্রচণ্ড রকমের রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব বা একপেশে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত বিবরণ তথ্যের মৌলিক উপকরণ হিসেবে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী বিবরণটিও কিছু সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এরকম একটি সমস্যা হচ্ছে ধারা বর্ণনায় একপক্ষীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন যা প্রকৃতপক্ষে উপস্থাপিত তথ্য উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই খর্ব করে দেয়। অন্যটি হচ্ছে কিছু বর্ণনাকারীর নিজেকে ও অন্যকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘটনায় বিশেষভাবে উঁচুতে প্রতিস্থাপনের বিষয়টি। এ ধরনের প্রচেষ্টাও ইতিহাসের বর্ণনায় বিকৃতির জন্ম দিয়েছে। এ জন্য প্রতিটি ব্যক্তিগত বর্ণনাকে সমষ্টিগত বর্ণনার সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বহুল প্রচারিত একটি হচ্ছে জাহানারা ইমামের জার্নাল আকারে প্রকাশিত *'একাত্তরের দিনগুলি'* (১৯৮৬)। এটি তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণনায় ভরপুর একটি বই যা তার সন্তান রুমীকে অমর করেছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল ও আরো অনেকের মতো যাদের পাক সেনাবাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত অনেকের মতে বইটি সাবলীলতার সাথে লেখা হলেও এতে উল্লেখিত প্রতিটি বর্ণনাকেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যাবে না। বাসন্তী গুহঠাকুরতার 'একাত্তরের স্মৃতি (২০০০)' বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা বইটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫/২৬ মার্চ পাকবাহিনীর অভিযান ও তাঁর স্বামী অধ্যাপক জোর্তিময় গুহ ঠাকুরতার হত্যার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধ্যাপক আনিসুর রহমানের স্মৃতিচারণে (২০০১) সেনা অভিযানের অভিজ্ঞতা ও তাঁর দেয়া প্রাথমিক বর্ণনা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে রশিদ হায়দার সম্পাদিত তের খণ্ডের *'স্মৃতি ১৯৭১'* যা এক বিশাল সংগ্রহ। এ খণ্ডগুলিতে ১৯৭১ সালের সংঘাতে অংশগ্রহণকারী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের দেয়া বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে সাজানো হয়েছে। ওই বছর দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সময়ের ঘটনার বর্ণনা সংযোজিত করা হয়েছে ওই তের খণ্ডে। এ ছাড়া অন্য লেখকদের লেখার সংকলন

www.pathagar.com

হিসেবে আরো একটি বই- *'১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা'* (১৯৮৯) সম্পাদনা করেছেন রশিদ হায়দার। এ বর্ণনাগুলো বাংলা ভাষায় তথ্যের প্রাথমিক উৎসের এক বিশাল সংগ্রহ সরবরাহ করেছে। আমি সম্পাদককে বাংলাদেশে আমার গবেষণাকালীন পরামর্শ দিয়েছিলাম যে তিনি যেন অন্তত:পক্ষে এগুলোর একটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন যাতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্য দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা এটি পড়তে পারেন। রশিদ হায়দারের আরো একটি সম্পাদনা হলো- *'শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ'* (১৯৯৪)। এটিতে ১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ও তাদের নিরুদ্দেশের বিস্তারিত উপাদান পাওয়া যায়।

দালিলিক গবেষণায় যখন এ জাতীয় ব্যক্তিগত ঘটনাবলীর সংগ্রহ একটি ভালো উদ্যোগ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে তখন এতে যথার্থভাবে সম্পাদনার অভাব ও তথ্য-উপাত্ত যাচাই বাছাইয়ে কিছুটা দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ *১৯৭১: ভয়াবহ অভিজ্ঞতা* (১৯৮৯)-তে প্রকৃত অংশগ্রহণকারী বা প্রত্যক্ষদর্শী যেমন নূরুল উলা, কালীরঞ্জন শীল, ইমামুজ্জামান, শমসের মুবিন চৌধুরী, জানাহারা ইমাম, আবুল বারক আলভী, কে এম সফিউল্লাহ, শ্যামলী চৌধুরী ও নীলিমা ইব্রাহিম-এর দেয়া সাক্ষ্য প্রমাণ অন্যান্য কয়েকজনের নিবন্ধের সাথে মিশিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ অন্যদের নিবন্ধগুলোয় নিবন্ধকার ঘটনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রদানে তেমন অবদান রেখেছেন বলে মনে হয়নি। এ ছাড়া সেখানে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধতার বা যাচাই-বাছাই পদ্ধতি ছিল বলে মনে হয়নি; যা লেখকরা দাবি করেছিলেন, ফলে গবেষণার বিশ্বস্ততা ও গুণগতমানে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন বাঙালি সদস্য একটি বই লিখেছেন যারা বিদ্রোহ করে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার, লে. ক. মাসুদ উল হাসান খান, মে. জে. কে. এম. সফিউল্লাহ ও মে. জে. ইমামুজ্জামান। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কাদের 'টাইগার' সিদ্দিকীর দু'খণ্ডের *'স্বাধীনতা '৭১'* এ সিদ্দিকী যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত উপস্থাপন করেছেন। মাহবুব আলমের বই (১৯৯৩) গেরিলা যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। কয়েকজন বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবক যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তাদের ব্যক্তিগত বর্ণনা উপরে উল্লেখিত সংগৃহীত খণ্ডে পাওয়া যাবে। ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের যাদুঘর তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সময়ের ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ যাদুঘরে অসংখ্য ছবি, দলিল, মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য জিনিস সংরক্ষিত আছে। এ যাদুঘরের রয়েছে নিজস্ব প্রকাশনা এবং যুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে উল্লেখ করা যায়। এতদসত্ত্বেও এটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণার একটি উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করায়-এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠানটিকে এর মৌলিক দুর্বলতা অতিক্রম করতে হবে। প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রধান দুর্বলতা হলো স্বাধীনতার সমর্থক পক্ষকে একপেশে সমর্থন দিয়ে যাওয়া ও অন্য দুর্বলতা হচ্ছে দলিল দস্তাবেজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতার অনুপস্থিতি এবং এর প্রদর্শনী ও প্রকাশনার বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য প্রক্রিয়া যা ওই প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাটির উল্লেখিত লক্ষ্যের ক্ষতিসাধন করছে।

এদিকে যুদ্ধ ও নারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯৭১ এর পণ্ডিতসূলভ বিবেচনা এখনো পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯৪৭ সালের বিভক্তির গবেষণা পাঞ্জাবের

www.pathagar.com

উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে, বাংলার উপর নয় এবং দীর্ঘ দিনের জন্য ১৯৭১ সালের বিভক্তি পর্যন্ত এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়নি। সম্ভবত এ ধরনের সর্বত্তোম গবেষণাটি হয়েছে ইয়াসমিন সাইফিয়া দ্বারা (২০০৪, ২০০৮), যার প্রকাশিত গবেষণা সরকারি বর্ণনাকেও চ্যালেঞ্জ করেছে ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ করেছে তাদের জাতিগত বা রাজনৈতিক পরিচয় গ্রাহ্য না করে।

বাংলাদেশী স্বাধীনতা আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে যেগুলো যাচাই-বাছাই,বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার মানদণ্ড থেকে অনেক নিচের স্তরের যা প্রকৃতপক্ষে গবেষণায় তেমন সহায়ক নাও হতে পারে। অনেক প্রকাশনা যেগুলোতে অন্ধভাবে পক্ষপাতদুষ্ট ও অসমর্থিত দাবি যাচই-বাছাই ছাড়াই সংযুক্ত করা হয়েছে (ইন্টারনেটসহ) সেগুলো পদ্ধতিগতভাবে দলিল তৈরি করতে সাহায্য না করে বরং বাঁধা সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ মুনতাসির মামুন সম্পাদিত (২০০২) ১৯৭১ *চুকনগর গণহত্যা* শীর্ষক সংগ্রহটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি এমনি একটি সংগ্রহ যা মহামারির ন্যায় অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত, বিশেষ করে বেসামরিক শরণার্থীদের প্রকৃত হত্যাকাণ্ড ভিত্তিক দলিলপত্র তৈরি করার মূল্যবান সুযোগকে নষ্ট করে সকলকে হতাশ করেছে। উপরে উল্লেখিত বাঙালিদের সকল সাক্ষ্য প্রমাণের সংগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এ জাতীয় সমস্যার কারণে। এ ধরনের লেখা বা সম্পাদনার কাজে যারা নিজেদের বিশেষভাবে চ্যাম্পিয়ন মনে করেন তাদের কিছু বর্ণনা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্ণনার সামগ্রিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে। তাদের একজন হচ্ছেন শাহরিয়ার কবির (১৯৯৯)। এ সব উপাদান ইন্টারনেটে বার বার প্রচারিত হয়ে সমস্যা আরো জটিল করেছে ও অসমর্থিত দাবির লালন-পালন করার সংস্কৃতি ও প্রশ্নবিদ্ধ মনকে অসহিষ্ণু করেছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

অংশগ্রণকারী / প্রত্যক্ষদর্শী যাদের সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে

বাংলাদেশ

কিছু সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে মূল সাক্ষাতদাতার সাথে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর উপস্থিতিতে:

লে. (মে. জে.) ইমামুজ্জামান, ঢাকা (৫৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট, মুক্তিযোদ্ধা)
শমসের মবিন চৌধুরী, ওয়াশিংটন (৮ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মুক্তিযোদ্ধা)
কবির মিয়া, নরসিংদী (মুক্তিযোদ্ধা)
আবুল বারক আলভি, ঢাকা (মুক্তিযোদ্ধা)
ইকবাল, ঢাকা (মুক্তিযোদ্ধা)
ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রবীন্দ্র মোহন দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী, ঢাকা
ড. আবুল কালাম, ঢাকা
জাফর আহমেদ, ওয়াশিংটন
জয়নুল করিম, ঢাকা (মুক্তিযোদ্ধা)
জয়নাল আবেদীন দেওয়ান (এবং তার স্ত্রী শিউলী আবেদীন) সাথিয়ারচোরা, টাঙ্গাইল
রায়হান আলী (এবং তার স্ত্রী মাহমুদা বেগম গিনী) থানাপাড়া, রাজশাহী
ওয়াজান, থানাপাড়া, রাজশাহী
মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, থানাপাড়া, রাজশাহী
মোহাম্মদ জিন্নাতুন আলম, থানাপাড়া, রাজশাহী
মোহাম্মদ আব্দুল হক, ময়মনসিংহ
শেখ সুলতান আহমেদ, ময়মনসিংহ
আব্দুল আজিজ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
মোহাম্মদ আলী আকবর, দামপাড়া, ময়মনসিংহ (বড়ইতলা, আরো অনেক গ্রামবাসী)
জয়নাল আবেদীন, বড়ইতলা, ময়মনসিংহ (মুক্তিযোদ্ধা, আরো অনেক গ্রামবাসী)
অমর সূর, শাঁখারীপট্টি (অমরের ছোট ভাই যে একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে গেছেন সেসহ আরও অনেকের উপস্থিতিতে)
অমিয় কুমার সূর, শাঁখারীপট্টি (নারায়ণ নন্দী ও অন্যান্য)
অচিন্ত সাহা, বটিয়াঘাটা, খুলনা
শৈলেন্দ্রনাথ জোয়াদ্দার, কাথামারি গ্রাম, খুলনা (চুকনগর)

www.pathagar.com

মুহম্মদ ওয়াজেদ আলী, চুকনগর (অনেক লোকের উপস্থিতিতে)
দলিল উদ্দিন দুলু, চুকনগর, খুলনা
নিতাই গায়েন (চুকনগর), খুলনা
লতিকা গায়েন, (চুকনগর), খুলনা
তারাদাসী বৈরাগী (ঝাউডাঙ্গা), খুলনা
ময়না মিস্ত্রি, (ঝাউডাঙ্গা), খুলনা
বিমল মণ্ডল, খুলনা
তানভীর মোকাম্মেল, ঢাকা (খুলনা)
তানভীর মোকাম্মেলের ভাইয়ের শ্বশুর, খুলনা
এস এম রকীব আলী, খুলনা, (মুক্তিযোদ্ধা, যশোর)
রুস্তম আলী সিকদার, খুলনা (মুক্তিযোদ্ধা)
আব্দুর রব সর্দার, খুলনা (মুক্তিযোদ্ধা)
মুহাম্মদ সফি, সবেক, পারভেজ আলম খান এবং অন্যান্যরা নিউ কলোনী, খালিশপুর, খুলনা
বেগম আখতার ইমাম, ঢাকা (টেলিফোন-এর মাধ্যমে)

পাকিস্তান

লে. জে. আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, কমান্ডার, ইষ্টার্ণ কমান্ড
মে. জে. গোলাম ওমর, সচিব, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল
সাহাবজাদা ইয়াকুব খান, কমান্ডার, ইষ্টার্ণ কমান্ড ,১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত
লে. ক. (মে. জে.) হাকিম আরশাদ কোরেশী, ২৬ এফ এফ
লে. ক. (ব্রিগেডিয়ার) মুহাম্মদ তাজ, ৩২ পাঞ্জাব
ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ হায়াত, ১০৭ ব্রিগেড
ব্রিগেডিয়ার সেলিম জিয়া, ৮ পাঞ্জাব
ক. (ব্রিগেডিয়ার) শওকত কাদির, ১৩ এফ এফ
ক. (ব্রিগেডিয়ার) মনসুর শাহ, স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস
ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ, পিওএফ, গাজীপুর
ক্যাপ্টেন সুজাত লতিফ, ১৫ এফ এফ
ক্যাপ্টেন (লে. জে.) আলি কুলি খান খটক, ৪র্থ আর্মি এভিয়েশন
ক্যাপ্টেন (মেজর) ইকরাম সেহগাল, ২ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
লে. (লে. জে.) গোলাম মোস্তফা, ৫৫ ফিল্ড
মেজর (কর্ণেল) আনিস আহমেদ, ২০৫ ব্রিগেড
মেজর (ব্রিগেডিয়ার) জাফর খান, ৫৭ ব্রিগেড
মেজর (কর্ণেল) শামীম জান বাবর, ২২ এফ এফ
(লে. ক.) মুহাম্মদ কামরান খান দোতানী, ২২ এফ এফ
মেজর আব্দুল মজিদ, ৫৩ ফিল্ড
লে. নঈমুল্লাহ, ২৩ পাঞ্জাব
ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফি, ৫৩ ফিল্ড

www.pathagar.com

লে. ক. (ক.) মুহাম্মদ সফি, ২৩ ফিল্ড
লে. ক. (ব্রি) আমির মুহম্মদ খান, ৩৪ পাঞ্জাব
লে. ক. মাতলাব হুসাইন,, ১৮ পাঞ্জাব
লে. সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ, ২৭ বেলুচ
ক্যাপ্টেন (ব্রিগেডিয়ার) এ এল এ জামান, ৫৩ ফিল্ড
(কর্ণেল) এম কামাল উদ্দিন, ৫৫ ফিল্ড
ক্যাপ্টেন (কর্ণেল) মুহাম্মদ আলী শাহ, ১৮ পাঞ্জাব
ক্যাপ্টেন সরওয়ার আজহার, ১৮ পাঞ্জাব
জনাব কুতুবউদ্দিন আজিজ
জনাব আলী ইয়াহিয়া
মি. আরদেশীর কাওয়াসজী
কর্ণেল এনায়েত হাসান

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন এ শর্তে যে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না এবং এদের মধ্যে চাকরিরত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও ছিলেন।

নিম্নের ব্যক্তিবর্গ সাক্ষাতকার দিতে রাজি হননিঃ

ব্রিগেডিয়ার (লে. জে.) জাহানজেব আরবাব, ৫৭ ব্রিগেড
লে. ক. বাশারত সুলতান, ১৮ পাঞ্জাব
ক্যাপ্টেন (মেজর) সালেহ হাসান মীর্জা, ১৮ পাঞ্জাব
লে. ক. এস এফ এইচ রিজভী, ৩২ পাঞ্জাব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

সূচনা: ঝাপসা স্মৃতি

১। একটি চরমপন্থী আন্দোলন যা ভারতের পশ্চিম-বাংলাকে ষাটের দশকের শেষ ভাগ ও সত্তর দশকের প্রথমদিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। উত্তর বাংলার নকশালবাড়ীর নাম অনুসারে এ চরমপন্থীদের নকশালী বলা হতো। এ সংগঠনটির আদর্শ কোলকাতার মেধাবী ছাত্রদের আকর্ষণ করেছিলো। ভারত সরকার আন্দোলনটিকে বর্বরতার সাথে দমন করে ভারতীয় রাজনীতির অভিধানে 'এনকাউন্টার' ধারণার প্রবর্তন করে যেখানে সন্দেহভাজন চরমপন্থীরা নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে আপাতত বন্দুকযুদ্ধে অথবা নিরাপদ হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় নিহত হয়েছে বলে প্রচার করা হতো।

২। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। যখন সকলেই ধারণা করেছিলেন যে, তিনি একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন, কিন্তু তার বক্তৃতা সহসাই থেমে গিয়েছিল, এমন আশায় যে ২৫ মার্চের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য আলোচনা চলতে দেয়া দরকার।

৩। ১৯৬৫ সালের ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ।

৪। টেরোরিজম এণ্ড ডিসরাপটিভ এ্যাকটিভিটিজ (প্রিভেনশন) এক্ট।

৫। অনেক খ্যাতিমান শিখ ১৯৮৪ সালে দিল্লীতে শিখ হত্যাযজ্ঞ ও দমন এবং পাঞ্জাবে মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, যেখানে ১৯৮০ সাল ও ১৯৯০ সালের প্রথমদিকে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্রোহীরা তৎপর ছিল। ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে ইন্দিরা গান্ধী তার শিখ দেহরক্ষীদের হাতে নিহত হন। এর পরপরই দিল্লীতে হাজার হাজার শিখ নিহত হয়। এ ঘটনায় চোখ বন্ধ করে থাকার জন্য কর্তৃপক্ষকে অভিযুক্ত করা হয় ও যারা শিখ হত্যাকাণ্ডে ইন্ধন যুগিয়েছিল তাদের কাউকেই বিচারের আওতায় আনা হয়নি।

৬। সুখওয়ান্ত সিংহ (১৯৮০), পাতা-৭৮।

৭। লচমন সিংহ (১৯৮১), পাতা ৪২।

৮। জ্যাকব (২০০১)।

৯। বয়স আশির শেষ দিকে হলেও জেনারেল অরোরার চেহারা ছিল আকর্ষণীয় এবং আচরণ ছিল মধুর ও বিনয়ী। ১৯৭১ সালে ঢাকায় পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানের একটি বড় ছবি তার ঘরের দেয়ালে ঝুলছিল।

১০। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতির দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণ ও ইষ্টার্ণ কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে সাহাবজাদা ইয়াকুব খানের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন *খান* (২০০৫), ২৮০-৪ এবং লেখকের সাক্ষাতকার (২০০৭)।

১১। ২০০৩ সালে লাহোরে জেনারেল নিয়াজীর সাক্ষাতকার নেয়ার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে আমি একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলাম ভারতের *'দি টেলিগ্রাফের'* জন্য, যা ২০০৩ সালের ১৭ আগস্ট ছাপা হয়েছিল।

১২। বিহারীদের সাধারণভাবে অবাঙালি বলে আখ্যায়িত করা হয়, যারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায় ও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে।

www.pathagar.com

১৩। ম্যাসকারেনহাস একজন পাকিস্তানী সাংবাদিক যিনি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭১ সালের এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করেন একটি সাংবাদিক দলের সদস্য হিসেবে। এরপর তিনি তার পরিবারসহ ইংল্যান্ডে পালিয়ে যান ও পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনা অভিযানের নিন্দা জানিয়ে লন্ডনের '*সানডে টাইমসে*' প্রতিবেদন লেখেন।

১৪। দেখুন শর্মিলা বসুর 'দি ট্রুথ এবাউট দি যশোর ম্যাসাকার', *দি টেলিগ্রাফ*, ১৯ মার্চ, ২০০৬।

১৫। শার্মিলা বসু 'এনাটমি অব ভায়োল্যান্স: এ্যানালাইসিস অফ সিভিল ওয়ার ইন ইষ্ট পাকিস্তান ইন ১৯৭১' *ইকোনোমিক এণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি* খণ্ড, XL, নং ৪১, ৮-১৪, অক্টোবর, ২০০৫।

অধ্যায় ১ -কল টু আর্মস : বাঙালি জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ

১। মেজর জেনারেল হাকিম আরশাদ কোরেশী, *The 1971 Indo-Pak War:a Soldier's Narrative*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ২০০৩, ১০৪।

২। আর্চার ব্লাড, *দি ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ; মেময়ারস্ অব এন আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০২, ১৫৫।

৩। সিসন এণ্ড রোজ (১৯৯০), ৬৩।

৪। মেমোর‍্যানডাম ফ্রম দি প্রেসিডেন্টস্ এসিসটেন্ট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাফেয়ারস (কিসিঞ্জার) টু প্রেসিডেন্ট নিক্সন, FRUS, vol. XI, 17-20

৫। সিসন এণ্ড রোজ (১৯৯০), জি. ডব্লিউ চৌধুরী (১৯৭৪)।

৬। উইলকক্স (১৯৭৩), ১৫।

৭। সিসন এণ্ড রোজ (১৯৯০), ২৮; জি. ডব্লিউ চৌধুরী (১৯৭৪), অধ্যায়-৫।

৮। সিসন এণ্ড রোজ (১৯৯০), ২৭।

৯। বাংলাদেশী ও পাকিস্তানী প্রকাশনা সংস্থা থেকে অসংখ্য বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৭ সাল থেকে দু'দশক ধরে পাকিস্তানে বাঙালিদের বিচ্ছিন্নতাবোধের উপর। দ্বন্দ্বের কারণগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রশাসন, শিল্পকারখানা ও সেনাবাহিনীতে কম প্রতিনিধিত্ব, ভিন্ন সংস্কৃতি যাতে শারীরিক গঠনে তুলনামূলক লম্বা, ফর্সা ও সুশ্রী পাঠান / পাঞ্জাবীরা তাদের স্বদেশী বাঙালিদের কালো ও ছোটখাটো হিসেবে নিম্নস্তরের বলে বিবেচনা করতো। কিছু অভিযোগ ছিল আন্তঃপ্রাদেশিক বৈষম্য সংক্রান্ত এবং এ বৈসাদৃশ্য শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই ছিল না; উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে যে পাঞ্জাব পাকিস্তানের অন্য যে কোনো প্রদেশ অপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল, যেখানে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের অবস্থা ছিল তুলনামূলক খারাপ।

১০। ছয় দফার জন্য দেখুন সিসন এণ্ড রোজ (১৯৯০), ২০। যে কোনো জাতীয় সরকার ছয় দফার কয়েকটি দফাকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' সমর্থিত দফা হিসেবে বিবেচনা করতে পারতো, যেমন সে সময় প্রকৃতপক্ষে অনেক পাকিস্তানীই তাই মনে করেছিল।

১১। দেখুন লে. জে. কামাল মতিন উদ্দিন (১৯৯৩), একজন পশ্চিম পাকিস্তানীর যুক্তি ছিল উত্তরাধিকার সূত্রেপ্রাপ্ত আঞ্চলিক অসমতার প্রতিকার করতে অনেক প্রতিকারযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। একজন পূর্ব পাকিস্তানীর দৃষ্টিতে পূর্ব-পশ্চিম এর সম্পর্কে ফাটল ছিল আইয়ুব-এর শাসনামলের সময়- দেখুন রওনক জাহান (১৯৭১)। বাঙালি জি. ডব্লিউ চৌধুরী যিনি পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরি করেছেন তাঁর বিশ্বাস অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল একটি মারাত্মক সমস্যা। যখন বাঙালিদের অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাঙালিদের জন্য সম্মতিসূচক পদক্ষেপ নেয়া হয় তা সঠিক পদক্ষেপ হলেও তা নেয়া হয়েছিল খুব দেরিতে (চৌধুরী ১৯৭৪)। Wilcox - উইলকক্স সমস্যাগুলোর সংক্ষিপ্তকরণ করেন ও সিদ্ধান্তে উপনীত হন: অর্থনৈতিক বৈষম্য

www.pathagar.com

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ ছিল না বরং দ্বন্দ্বটাই বৈষম্যের কারণ তৈরি করেছিল (Wilcox 1973, 17)। জাহানারা ইমাম লিখেছেন কীভাবে তিনি তার বাড়ির মার্কিন অতিথিকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টি পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন- তাঁর মানসিকতা এমন ছিল যেন মার্কিন অতিথি অযৌক্তিকভাবে কিছু প্রমাণের জন্য তাকে বলেছিলেন, যেন বাঙালিরা নিজেরাই বৈষম্যের প্রমাণস্বরূপ। ইমাম (ইমাম ১৮৬-২৫) মনে করেছিলেন শেখ মুজিবের নির্বাচনী প্রচারের পোষ্টারের একটি কপিই তাঁর অতিথিকে বিশ্বাস করানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারতো।

১২। চৌধুরী (১৯৭৪), ১০।

১৩। নীরদ সি, চৌধুরী, ইলেকসনস ইন পাকিস্তান, *হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭০।

১৪। সিসন ও রোজ (১৯৯০), অধ্যায় ৪ এবং ৫; জি. ডব্লিউ চৌধুরী (১৯৭৪)।

১৫। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ১২২। পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ইয়াহিয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা-দেখুন এল এফ রাশব্রুক উইলিয়ামস (১৯৭১)।

১৬। ইমাম (১৯৮৬), ৯-১১। জাহানারা ইমামের জেষ্ঠ্য পুত্র রুমী মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন, ধরা পড়েন এবং আর কখনো ফিরে আসেননি। দেখুন অধ্যায়-৭।

১৭। রায় (২০০৩), ২১০।

১৮। চৌধুরী (১৯৭৪), ১৫৮।

১৯। 'অসহযোগ ও আইন অমান্যকারী আন্দোলনের সময় আমি একজন সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে ওই আন্দোলনে আমার ভূমিকা পালন করতে মনস্থ করেছিলাম'- অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর গানগুলো ছিল ১৯৩০ দশকের গুরু সদয় দত্তের ব্রতচারীর ন্যায়। সামরিক অভিযান শুরু হলে অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও তার সহকর্মী শিক্ষক রেহমান সোবহান ৩০ মার্চ ভারত পালিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়েন। রেহমান সোবহানের অবাঙালির মতো চেহারার কারণে। তারা প্রায় মারাই যাচ্ছিলেন, পরে রেহমান জানতে পারেন গ্রামবাসী ইতোমধ্যে দু'জনকে জীবন্ত কবর দিয়েছে শুধুমাত্র বাঙালি না হওয়ার জন্য। প্রকৃতপক্ষে রেহমানের বাংলায় কথা বলার দক্ষতার জন্যই সেদিন তিনি প্রাণে বেঁচে যান। যে ছাত্ররা সেদিন তাদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন তারা কখনোই শোনেননি যে ওই দু'জন অধ্যাপক পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার আদায়ে সঙ্গীত বা অন্য কোনো বিশেষ দক্ষতার দ্বারা কোনো দিন কোনো প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। রহমান (২০০১)।

২০। ব্লাড (২০০২), ১৫৫-১৫৬। সশস্ত্র জনতা যারা পশ্চিম পাকিস্তানী সংসদ সদস্যদের তাদের হাতে তুলে দেয়ার দাবি করেছিল ব্লাড সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি।

২১। ম্যাসকারেনহাস (১৯৭১), ৯১-২।

২২। ম্যাসকারেনহাস (১৯৭১), ৯৯।

২৩। ব্লাড (২০০২), ১৫৮।

২৪। ইমাম (১৯৮৬), ৫-৬ মার্চ, ১৭-৮।

২৫। হায়দার-এ উল্লেখিত শীল, সম্পাদিত। (১৯৬), ৫-৬।

২৬। ডেইলি টেলিগ্রাফ, ২৭ মার্চ, ১৯৭১।

২৭। ম্যাসকারেনহাস (১৯৮৬), ১৪।

২৮। ম্যাসকারেনহাস (১৯৮৬), ৪-৫।

২৯। সাত অধ্যায়ে আলোচনা দেখুন।

৩০। কবির-এ উল্লেখিত মজুমদার, সম্পাদিত (১৯৯১)।

৩১। অনেক বাঙালি জাতীয়তাবাদী দাবি করেন সুভাষ চন্দ্র বসু তাদের একটি অনুপ্রেরণা। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই করতে গ্রেফতারকৃত ভারতীয় সেনা সদস্যদের রাজনৈতিক আনুগত্য অর্জন করে ও বৃটিশ শাসকের প্রতি অবশিষ্ট ভারতীয় অফিসারদের আনুগত্য লোপ করার লক্ষ্য নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুভাষ বসু ভারতীয় ন্যাশনাল আর্মি গঠন করেন। ভারতীয়

www.pathagar.com

ন্যাশনাল আর্মি গঠিত হয়েছিল সকল জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয় গোত্রের নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে। ভারতীয় ন্যাশনাল আর্মিতে সুভাষ বসুর অফিসারদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবী-মুসলমান, শিখ ও হিন্দু যাতে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর গঠন প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সে সব স্থান থেকে যে সব স্থান পরবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্রে রূপ নেয়। মজার ব্যাপার ইয়াহিয়া খান ও সাহাবজাদা ইয়াকুব খান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালিতে যুদ্ধ বন্দি হিসেবে ছিলেন যখন সুভাষ বসু ইউরোপে ভারতীয় যুদ্ধ বন্দিদের তাঁর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন।

৩২। মাইকেল ইগনেতিয়েফ (১৯৯৩), ১৫-৬

অধ্যায় ২ - সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা: দায়িত্বছাড়া ক্ষমতা

১। *ফরেন রিলেসনস্ অব দি ইউএস*, ১৯৬৯-১৯৭৬ FRUS, খণ্ড ১১. 'দক্ষিণ এশিয়া সংকট, ১৯৭১' ২০০৫, ৩৬-৭, প্রেসিডেন্ট নিক্সন পরদিন আর একবার টেলিফোনে কথা বলেন কি-সিঞ্জারের সাথে। নিক্সন বলেন-'আসল ব্যাপার হচ্ছে শান্ত থাকা ও কোনো কিছু না করা। কোনোদিকেই আমাদের করার কিছু নেই।'

২। ব্লাড (২০০২), ১৬২-৭।

৩। রায় (২০০৩), ২১১-২।

৪। ইমাম (১৯৮৬), ২২।

৫। ব্লাড (২০০২), ১৮৩-৪।

৬। পাকিস্তান সরকার, *পূর্ব পাকিস্তান সংকটের উপর শ্বেতপত্র* (আগষ্ট ১৯৭১), অধ্যায়-৩: পূর্ব পাকিস্তানে সন্ত্রাস, ২৯-৪৩।

৭। মেজর (ক্যাপ্টেন) ইকরাম সেহগালের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৫।

৮। ম্যাসকারেনহাস (১৯৭১), ১০৩-৪। ম্যাসকারেনহাস একদিকে যেমন বাঙালি বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন অন্যদিকে তিনি উপযুক্ত সময়ে পদক্ষেপ নেয়ায় ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করেছেন। '৩ ও ২৫ মার্চের মধ্যে তিনটি ভিন্ন সময়ে সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা শেখ মুজিবকে তাদের নির্দেশনা দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। প্রত্যেকবার শেখ মুজিব তাদের মামুলী কথা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন...., যা হোক, রাজনীতিবিদরা যতোই নিজেদের পিঠ চাপরাতে চেষ্টা করুক না কেন, এ সেনা সদস্যরা ও একইরকম সাহসী ছাত্ররা যারা তাদের (রাজনীতিবিদ) পক্ষে লড়াই করেছিল; তারাই বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধের প্রকৃত বীর হয়ে থাকবে ... (৯৭)'। আমি বাংলাদেশে এরূপ লাগাতার রাজনৈতিক বিভেদের উভয়পক্ষের যুক্তি শুনেছি: একপক্ষ রাজনীতিবিদদের অভিযুক্ত করেছে প্রবাসে আরাম-আয়েশে কাটানোর জন্য, অপরদিকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা ও মুক্তিবাহিনীর বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবকরাই প্রকৃত যুদ্ধ করেছে বলে শুনেছি; উল্টো যুক্তি হচ্ছে শেখ মুজিব দীর্ঘ কঠোর পরিশ্রমী রাজনৈতিক সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন অথচ সশস্ত্রবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে হুমকীর মধ্যে পড়লে শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে এসে যুদ্ধে যোগ দেন।

৯। কর্ণেল (মেজর) শামীম জান বাবরের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৫।

১০। লে. জেনারেল (লে.) গোলাম মোস্তফার সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৫, ২০০৬।

১১। কোরেশী (২০০৩), ১৬-১৯।

১২। ব্লাড (২০০২), ১৬০-১। ভাইস এ্যাডমিরাল আহসান, সাবেক গভর্ণর যাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ পছন্দ করত।

১৩। কোরেশী (২০০৩), ১৬-১৭।

www.pathagar.com

১৪। কর্ণেল (লে.) মুহম্মদ আলী শাহ'র সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৬।

১৫। লেখকের সাথে ক্যাপ্টেন সরোয়ার মেহমুদ আজহারের সাক্ষাতকার, ২০০৬।

১৬। ম্যাসকারেনহাস (১৯৭১), ১০৫। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাক সেনা কর্তৃপক্ষ যে একদল সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছিল তাদের একজন সদস্য হয়ে ম্যাসকারেনহাস সেখানে গিয়েছিলেন। এরপর তিনি সপরিবারে লন্ডন পালিয়ে যান এবং পূর্ব পাকিস্তানে পাক সেনাবাহিনীর বর্বরতার উপর '*সানডে টাইমসের*' ১৯৭১ সালের জুন সংখ্যায় একটি ফিচার ছাপান।

১৭। মাইকেল ইগনেতিয়েফ, *ব্লাড এণ্ড বিলংগিং: জার্নি ইন টু দি নিউ ন্যাশনালিজম* (ভিনটেজ, ১৯৯৪), ১৬।

১৮। ইমাম (১৯৮৬), ৩৪।

১৯। ব্লাড (২০০২), ১৮২।

২০। জয়দেবপুর রাজবাড়ী ছিল ভাওয়ালের রাজার বাড়ি, এটি একটি জমিদারী এস্টেট। ১৯০৯ সালে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার দার্জিলিং ভ্রমণকালে মারা যান বলে জানা যায়। বার বছর পর ১৯২১ সালে একজন 'সন্যাসী' ঢাকায় হাজির হন ও নিজেকে ওই কুমার বলে দাবি করে বলেন যে তিনি আগে প্রকৃতপক্ষে মারা যাননি। দ্বিতীয় কুমারের স্ত্রী তাকে ভণ্ড বলে ঘোষণা দেন, কিন্তু তার বোনেরা তাকে তাদের হারানো ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কুমারের সঙ্গী একজন বাঙালি যে কুমারের সাথে এসেছিলেন কুমার তার সাথে তার স্ত্রী অপেক্ষা অনেক বেশি সময় কাটিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি কোর্টের মাধ্যমে এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় চলে যায় যা অবশেষে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে পৌছায়। দাবিদার ১৯৪৬ সালে প্রিভি কাউন্সিল থেকে তার পক্ষে চূড়ান্ত রায় পেয়ে আদালতে সকল পর্যায়ে জয়ী হন। সে সন্ধ্যায় তিনি পূজা দিতে কোলকাতার একটি কালীমন্দিরে গেলে সেখানে স্ট্রোক করেন এবং তার দু'দিন পর মারা যান। এতে তিনি যে মৃত অবস্থা থেকে ফিরে এসেছিলেন ও কুমার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার ফল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। আমি আমার ঠাকুর দাদার কাছ থেকে এরূপ একটি বার বার আশা দিয়ে নিরাশ করার মতো রহস্যের গল্প শুনে বড় হয়েছি; যিনি ছিলেন একজন আইনজীবী ও এসেছিলেন পূর্ব বাংলা থেকে। ঠাকুর দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দ্বিতীয় কুমারের স্ত্রীর (রাণী) আইনজীবী টিমের সদস্য ফনীভূসন চক্রবর্তী (পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি) যিনি ভণ্ড হিসেবে ভাওয়ালের সন্যাসীক বাতিল করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওই মামলায় তিনি হেরে যান।

শিশু হিসেবে কোলকাতায় ল্যানসডাউন রোডের বাড়িটি আমাদের দেখানো হয়েছে, যার বারান্দা থেকে রাণী একটি অনাবৃত চারচাকার ঘোড়ার গাড়িতে বসে চলে যাওয়ার সময় একটি লোককে দেখেছিলেন যে, লোকটি নিজেকে ওই রাণীর স্বামী বলে দাবি করেছিলেন। ভাওয়াল মামলার সম্মোহনী বর্ণনা ও বিশ্লেষণের জন্য দেখুন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *A Princely Impostor? The Strange and Universal History of the Kumar of Bhawal* (Princeton University Press, 2002)

২১। কবির-এ উল্লেখিত লে. ক. মাসুদ উল হাসান খান, সম্পাদিত (১৯৯৯), ৪৮-৯, লেখক দ্বারা বাংলা থেকে অনুবাদ।

২২। কবির-এ উল্লেখিত লে. ক. মাসুদ, সম্পাদিত (১৯৯৯), ৪৯।

২৩। মে. জে. কে এম সফিউল্লাহ (১৯৮৯), ২২-৭।

২৪। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ গাজীপুরে কি ঘটেছিল তার প্রতিদিনের বিস্তারিত বিবরণ লগ বুকে লিখেছিলেন। তাঁর ১৯ মার্চের বর্ণনা অত্র অধ্যায়ের শেষে দেয়া হয়েছে।

২৫। ১৯ মার্চের ঘটনা নিয়ে ব্রিগেড মেজর জাফর খানের বর্ণনা অত্র অধ্যায়ের পরের দিকে তুলে ধরা হয়েছে।

www.pathagar.com

২৬। সফিউল্লাহ (১৯৮৯), ২৬।

২৭। ব্রিগেডিয়ার (মেজর) জাফর খানের সাথে লেখকের আরো একটি সাক্ষাতকার,২০০৬। খালেদ মোশাররফ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য একজন বিখ্যাত যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত হন। তিনি খুব অল্পসময়ের জন্য ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে সেনাবাহিনীর মাঝে দ্বন্দ্বের সুযোগে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, কিন্তু এক রক্তাক্ত পরিবেশে তিনি নিহত হলে উদ্ভূত পরিস্থিতি জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

২৮। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা লে. ক. মুহাম্মদ তাজ ৩২ পাঞ্জাবের কমান্ড গ্রহণ করেন এবং তিনিই ঢাকায় ২৫/২৬ মার্চ রাতের সেনা অভিযানে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

২৯। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ, *লগ অব ডেইলি ইভেন্টস-পিওএফ*, গাজীপুর, অপ্রকাশিত, লেখকের অনুমতিসহ। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহর সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৫। ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ দক্ষিণ ভারতের একজন মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী নন, তিনি মুচকি হেসে বললেন।

অধ্যায় ৩ - সেনা অভিযান: ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট'

১। ব্লাড (২০০২), ১৯৫।

২। কিসিঞ্জার- নিক্সন টেলিফোন আলাপ, ২৯ মার্চ ১৯৭১, FRUS, vol. XI, 35

৩। কবির-এ উল্লেখিত ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার, সম্পাদিত (১৯৯৯) (পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ্য বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ছিলেন মজুমদার); আনিসুর রহমান (২০০০); রায়না (১৯৮১) দাবি করেন যে, আগে থেকেই ভারতীয় গোয়েন্দার সাথে বাঙালি অফিসার কর্ণেল ওসমানী, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল্লাহ ও টাইগার সিদ্দিকীর যোগাযোগ ছিল এবং শেখ মুজিবকে বার বার ঢাকা ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করে তাঁর সহকর্মীদের শেষ মুহূর্তে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৪। হায়দার-এ উল্লেখিত নুরুল উলা, সম্পাদিত (১৯৯৬), ১।

৫। FRUS, vol. XI, 25

৬। মেজর জেনারেল গোলাম ওমরের সাথে করাচিতে লেখকের সাক্ষাতকার (২০০৫)।

৭। সাহাবজাদা ইয়াকুব খানের সাথে করাচিতে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৭।

৮। আগের সাক্ষাতকারে জেনারেল ওমর বলেছিলেন তিনি ইয়াহিয়ার ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করার একদিন পর ২৬ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। তাঁর সাক্ষাতকার নেয়ার প্রস্তুতি হিসেবে আমি তাঁর দেয়া একটি সাক্ষাতকারের রেকর্ড (ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর থেকে সংগ্রহ করেছিলাম) শুনি যা তিনি কয়েক বছর আগে দু'জন বাংলাদেশীকে দিয়েছিলেন যেখানে তিনি দীর্ঘ বেশ লম্বা উত্তর দিয়েছিলেন। আমি তাঁর কথার মাঝে নির্দিষ্ট করে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি জানান যুদ্ধের শেষে তাকে ভুট্টো অবসরে পাঠান ও তার পেনশন বন্ধ করে দেন। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসলে তার পেনশন বহাল করা হয়।

৯। কোরেশী (২০০৩), ২৩-৪।

১০। মিঠা (২০০৩), অধ্যায়-২১।

১১। কবির-এ উল্লেখিত মজুমদার, সম্পাদিত (১৯৯১), ৩৩-৪।

১২। বাঙালি যারা দেশের বাইরে- তা ভারত বা অন্য কোনো দেশ হতে পারে সেখানে থাকলে তাকে প্রবাসী বাঙালি বলা হয়। চ্যাটার্জী একজন হিন্দু ব্রাহ্মণের পদবী; এ পরিবারটি কিন্তু খৃষ্টান ছিল।

১৩। মিঠা (২০০৩), অধ্যায়-১৭। জেনারেল মিঠার বইটির প্রথম দিকের অধ্যায়গুলোতে ওই সময়ের সামাজিক অবস্থার প্রাণবন্ত বর্ণনা দেয়া আছে। আমিও ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছি

www.pathagar.com

ইন্দু মিঠা ও মিঠার পরিবারের সাথে পূর্ব পাকিস্তান ও ১৯৭১ সম্পর্কে আলোচনা করে।

১৪। ব্রিগেডিয়ার (লে. কর্নেল) মুহম্মদ তাজের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার ২০০৫।

১৫। মিঠা (২০০৩), ৩৩৬।

১৬। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ১৫৭-৬০।

১৭। ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চের রাতে সেনা অভিযানের সময় সেনা কর্মকর্তাদের নিজেদের মধ্যে বেতার যোগাযোগের ধারণকৃত আংশিক কথাবার্তা। ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর ওই রেকর্ডিং-এর একটি কপি আমাকে দিয়েছিল।

১৮। হায়দার-এ উল্লেখিত নুরুল উলা, সম্পাদিত (১৯৯৬), ২-৩।

১৯। FRUS, vol. XI, 34

২০। ব্লাড (২০০২), ২০৭।

২১। সাইমন ড্রিং, *দি সানডে টেলিগ্রাফ*, ১৬ এপ্রিল ১৯৭১, বাংলাদেশ সরকারের দলিলপত্র (১৯৮৪), খণ্ড ১৪, ৩৪৫-৭।

২২। হায়দার-এ উল্লেখিত শীল, সম্পাদিত (১৯৯৬), ৫-৬।

২৩। হায়দার-এ উল্লেখিত ইসলাম, সম্পাদিত (১৯৯৬), ১৮-১৯।

২৪। মিঠা (২০০৩), ৪৪-৩৩৫।

২৫। বাসন্তী গুহঠাকুরতা (১৯৯১, ২০০০) ১-৫ ও হায়দার,সম্পাদিত (২০০২), ১৬৬-৭৪।

২৬। ক্যাপ্টেন সারওয়ারের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৬।

২৭। ১৮ পাঞ্জাব, ৩২ পাঞ্জাব ও ৫৭ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের অফিসার যারা সেনা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

২৮। ব্রিগেডিয়ার (মেজর) জাফর খানের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৬।

২৯। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে শাহকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতে শাহ গ্রেফতার এড়াতে দেশ ত্যাগ করেছিলেন।

৩০। কর্ণেল শাহ উল্লেখ করেন যে, একজন মেজর একটি কোম্পানীর নেতৃত্ব দেন কিন্তু সেনাবাহিনীতে অফিসার এতোই কম ছিল যে ক্যাপ্টেন ও এমনকি লেফটেন্যান্টকেও ওই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল যা তাদের র‍্যাংক বা অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। সৈনিকও কম ছিল যার ফলে প্রায়ই ইউনিটগুলোকে ভেঙ্গে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত করতে হয়েছিল এবং সারা বছরই ওই প্রক্রিয়া চলে।

৩১। কর্ণেল (লে.) মুহাম্মদ আলী শাহের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৬।

৩২। এটা পরিষ্কার নয় যে এই নিহত লোকগুলো প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ছিল, না কি তারা শুধুমাত্র রাস্তায় ঘুরতে বের হয়েছিল।

৩৩। লেখকের সাথে রবীন্দ্র মোহন দাসের সাক্ষাতকার, ২০০৫।

৩৪। গুহ ঠাকুরতা (১৯৯১, ২০০০) ৬।

৩৫। হায়দার-এ উল্লেখিত নুরুল উলা, সম্পাদিত (১৯৯৬), ১।

৩৬। হায়দার-এ উল্লেখিত শীল, সম্পাদিত (১৯৯৬), ৬-৮। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লে. সাদাত ফারুক যিনি বছরের শেষ দিকে কোনো এক ফ্রন্টে যুদ্ধে নিহত হন তিনি তার সহকর্মীদের বলেছিলেন কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের হলে অন্ধকারের মধ্যে কক্ষ থেকে কক্ষ খুঁজছিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যেই গুলি করেছিলেন।

৩৭। ১৯৭১ সালের ২৫-২৬ মার্চ রাতে ঢাকায় সেনা অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বেতার যোগাযোগের ধারণকৃত টেপ ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে আছে। টেপ রেকর্ডিংটি নিঃসন্দেহে একটি মৌলিক উৎস যা ঢাকা আনবিক শক্তি কেন্দ্রের জনাব এমএম হোসেনের কৃতিত্ব যিনি রেকর্ডিংটি করেন বি-১৭৪ খিলগাঁও চৌধুরীপাড়াতে, ২৬ মার্চের সকাল ১.৩০ মিনিট থেকে ৯.০০টা পর্যন্ত । আমার গবেষণার কাজে মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের নিকট আমি

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞ। পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তাদের সাক্ষাতকার নেয়ার সময় আমি ওই টেপের সত্যতা যাচাই করেছি এবং শনাক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করেছি কয়েকজন সম্ভাব্য বক্তার পরিচিতি।

৩৮। লেখকের সাথে সাক্ষাত, ব্রিগেডিয়ার (লে. কর্নেল) তাজ, ২০০৫ এবং ব্রিগেডিয়ার (মেজর) জাফর খান, ২০০৬।

৩৯। জাহানারা ইমাম (১৯৮৬), ৪০-১।

৪০। আখতার ইমাম (১৯৯৮, ২০০০) ও লেখকের সাথে আলাপ-আলোচনা, ২০০৬।

৪১। বেগম আখতার ইমাম, যিনি কোলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশোনা করেন, তিনি ১৯৩৭ সালে দর্শনশাস্ত্রে সম্মান শ্রেণীতে মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঙ্গামনি দেবী স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৬ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়া হলের প্রভোষ্ট ছিলেন। মজার ব্যাপার হলো আখতার ইমাম উল্লেখ করেন যে, ২৭ মার্চ যেদিন কারফিউ উঠিয়ে নেয়া হয় সেদিন তাঁর ভাঙ্গাচোরা বাড়িতে পুনরায় হামলা হয়েছিল। কিন্তু সেবার আক্রমণকারীরা ছিল একদল আগ্রাসী বাঙালি যারা জানতে চেয়েছিল কতো শ' ছাত্রীর উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে ও কতোজনকে হত্যা করা হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে তাঁকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর প্রশ্ন করেছিলেন ওই হলে ২৫-২৬ মার্চ ও তারপর কতোজন ছাত্রী ছিল? বেগম আখতার ইমাম ও হলের হাউস টিউটরের সাথে কথা বলে ও হলের রেজিস্ট্রেশন রেকর্ড পরীক্ষা করে মেজর সাহেব মন্তব্য করেন পূর্বে তাকে যা বলা হয়েছিল তা সবই এখন মিথ্যা মনে হচ্ছে। (ইমাম ১৯৯৮) ১৫৩-৫। বেগম আখতার ইমামকে স্বাধীন বাংলাদেশে ছুটিতে পাঠানো হয় ও দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁকে আর কখনোই তার প্রভোষ্ট পদে ফিরে যেতে দেয়া হয়নি।

৪২। বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা শহীদ মিনারে গুলির শব্দের বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, একজন সৈনিক কয়েকজন বিদ্রোহীকে তাড়া করে তাদের পিছনে ছুটছে যারা রাস্তা অতিক্রম করে তাদের পুকুরের দিকে যাচ্ছিল। গুহ ঠাকুরতা (২০০০) ১১-১৩।

৪৩। হায়দার-এ উল্লেখিত নুরুল উলা,সম্পাদিত (১৯৯৬), ২।

৪৪। FRUS,vol.XI,42.

৪৫। ৩৪ নম্বর বিল্ডিং-এ যা ঘটেছিল সে ব্যাপারে অধ্যাপক জোর্তিময় গুহ ঠাকুরতার কন্যা অধ্যাপক মেঘনা গুহ ঠাকুরতার সাথে আমার কথপোকথন, মিসেস বাসন্তী গুহ ঠাকুরতার বই, অধ্যাপক আনিসুর রহমানের বই, ২৭ মার্চ হাসপাতালে হাই পরিবারের সাথে জাহানারা ইমামের সাক্ষাতের উল্লেখ, শীল ও ফজলের লাশ বহন করার বর্ণনা, সেনা কমান্ডারদের মধ্যে বেতার যোগাযোগের টেপ রেকর্ড , ওই রাতে যে সব সেনা কর্মকর্তা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সাক্ষাতকার -সব কিছু আমি একত্রে উপস্থাপন করেছি।

৪৬। বাসন্তী গুহঃঠাকুরতা (১৯৯১, ২০০০), ৬-৭ যা লিখেছেন আমি হুবহু সেভাবেই উপস্থাপন করেছি। লেখক বাংলা থেকে অনুবাদ করেছেন। কিছু কিছু উর্দুর ব্যাকরণগত ভুল থাকতে পারে তবে গুহঠাকুরতা যেভাবে লিখেছেন সে ভাবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪৭। আমি ১৮ পাঞ্জাব-এর অফিসারদের সাথে কথা বলার পর ব্যাটালিয়ান হাবিলদার কে শনাক্ত করতে পেরেছিলাম। সে সাধারণত কমান্ডিং অফিসারের সাথে থাকতো।

৪৮। রহমান (২০০১), ইমাম (১৮৬), ৪৪-৫।

৪৯। কামাল হোসেন একজন প্রখ্যাত আইনজীবী ও বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ব্রিগেডিয়ার তাজ বলেছেন যে, তিনি যে ক্যাপ্টেনকে কামাল হোসেনকে গ্রেফতার করার জন্য পাঠান সেই ক্যাপ্টেনকে মিসেস কামাল হোসেন (ইনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত) থাপ্পড় মারেন। বাংলাদেশে এ ঘটনার বিপরীত গল্পটি বলা হয়েছে যে, উক্ত ক্যাপ্টেন কামাল হোসেনের ভাতিজীকে থাপ্পড় মেরেছিলেন (রহমান-২০০১, ৩৭)। জেনারেল মিঠা লিখেছেন কামাল হোসেন তাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন এবং মেজর

www.pathagar.com

জেনারেল মিঠা তার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে কামাল হোসেনকে সংগ্রহ করেছিলেন (মিঠা, ৩৪৪)।

৫০। হায়দার-এ উল্লেখিত আবদুল্লাহ খালিদ, সম্পাদিত(১৯৯৬), ২৬-৩০; কোহিনুর হোসেন, ইন হায়দার, সম্পাদিত (১৯৯১, খণ্ড ১১), ১-১৯।

৫১। বাসন্তী গুহঠাকুরতা লিখেছেন, ড. মর্তুজা যিনি ইকবাল হলের পাশে থাকতেন তিনি তাকে বর্ণনা করেছিলেন কীভাবে ২৬ মার্চ সকালে দু'জন আহত ছাত্রকে সহায়তা করার জন্য তিনি বের হয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীর লোকেরা কীভাবে জোর করে তাকে দিয়ে মরদেহ বহন করিয়েছিল। তিনি বৃটিশ কাউন্সিলে ২৫ থেকে ৩০টি মরদেহ গুণেছেন ও তাকে প্রায়ই লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে এবং গুলিও করা হতো, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেখানে একটি ট্রাক এসে পড়লে সৈন্যরা সেটিতে উঠে পড়ে ও ওই স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। শীলের বর্ণনায় আবুল ফজল নামের অন্য একজনও ওই রাতে জগন্নাথ হলে ছিলেন যাকে দিয়েও মরদেহ বহন করানো হয়, কিন্তু তিনি বেঁচে যান। আবুল ফজল ডাক বিভাগে চাকরি করতেন ও ১ মার্চ থেকে জগন্নাথ হলে থাকতেন। বোমা তৈরির জন্য তাদের ঘরে বিস্ফোরক ছিল। আক্রমণের সময় তিনি বাথরুমে লুকিয়ে পড়েন ও পরে মালি ও সুইপারদের সাথে মিশে যান যাতে পাকসেনারা তাকে চিনতে না পারে। তিনি আরো জানিয়েছেন সেনারা বাঙালিদের থেকে বিহারীদের আলাদা করলেও প্রত্যেককে গুলি করে। ফজল বলেন, তিনি অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ও তার দু'জন আত্মীয়ের মরদেহ এবং তার রুমমেট শিশুতোষ দত্তের মরদেহও বহন করেছিলেন। তিনি আরো দাবি করেছেন যে তাদের দলটাকে গুলি করার ঠিক আগের মুহূর্তে তিনি মরদেহগুলোর মাঝে পড়ে গিয়েছিলেন। তার এ বর্ণনা থেকে মনে হয় শীল যে স্থানে ছিলেন তিনিও সেখানেই ছিলেন। তিনি ও অন্য একজন যে ছাত্র ছিল না- তারা পালিয়ে যান। ফজল দাবি করেছেন তিনি উল্টো দিকের একটি ভবন থেকে বুলডোজার দিয়ে ৫০/৬০ টার মতো পুতে ফেলা মৃতদেহ ভূমির সাথে সমতল করার দৃশ্য দেখেছিলেন ও সে সব মৃতদেহের হাত/আঙুল মাটি থেকে বের হয়ে ছিল। তাঁর দেয়া সাক্ষাতকারের উপর ভিত্তি করে তার বর্ণনা লিখেছেন অপর একজন (কবির,সম্পাদিত (১৯৯৯) ৯৪-৯।

৫২। 'ডিসপাচেস' ওয়ার ক্রাইম ফাইল, ১৯৯৪। আমি চ্যানেল ৪-এ যোগাযোগ করেছিলাম কিন্তু তারা মূল ফুটেজ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হন।

৫৩। আখতার ইমাম (২০০২), ২৬৬-৭।

৫৪। যে তিনজন অফিসার এ ঘটনায় জড়িত ছিলেন তারা আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করেছেন। কাজেই আমি তাদের পক্ষ থেকে তাদের সুনির্দিষ্ট এ্যাকশন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারিনি।

৫৫। বাংলা প্রামাণ্য চিত্র, *সে রাতের কথা বলতে এসেছি* 'তে মেঘনা গুহঠাকুরতা।

৫৬। রেডিও যোগাযোগের একটি টেপ-এ পুলিশ লাইন আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার কথা উল্লেখ আছে।

৫৭। তিনি নিউ মার্কেট এলাকায় কয়েক ডজন মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলেন; হয়তো গরীব মানুষ যারা সচারাচর রাস্তার পাশে শুয়ে থাকতো। বদরুল আলম যিনি বিমান বাহিনীর একজন পাইলট ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছেন, তিনিও ২৭ মার্চ নিউ মার্কেট এলাকায় সাধারণ মানুষের মৃতদেহ দেখেছেন (ড. কালাম ও জনাব আলমের সাথে লেখকের আলোচনা)।

৫৮। ব্রিগেডিয়ার তাজের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার। ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী আন্ত:বাহিনী গণসংযোগের প্রধান ছিলেন। দেখুন সিদ্দিকী (২০০৫)। অনেক সেনা অফিসার যারা পূর্ব পাকিস্তানে চাকরি করেছেন তারা আমাকে বলেছেন যে, বিদেশী সংবাদ মাধ্যমের লোকদের দেশ থেকে বের করে দেয়াটা ছিল মারাত্মক ভুল।

www.pathagar.com

৫৯। রজারস্ ও কিসিঞ্জারের মধ্যে টেলিফোন আলাপ, ৬ এপ্রিল ১৯৭১, FRUS, vol. X1, 47-48

৬০। কিসিঞ্জার ও নিক্সনের মধ্যে টেলিফোন আলাপ, ৩০ মার্চ ১৯৭১, FRUS, vol. X1, 37

৬১। সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ মিটিং। হোয়াইট হাউস সিচুয়েশন রুম, ৬ মার্চ ১৯৭১, FRUS, vol. X1, 8-16

৬২। ব্লাড (২০০২), ২৮৬।

৬৩। কিসিঞ্জার, হোয়াইট হাউসের বছরগুলো, FRUS, vol. X1, 48

৬৪। লে. জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজীর সাথে লেখকের সাক্ষাতকার ২০০৩, দেখুন নিয়াজী (১৯৯৮, ২০০২)।

৬৫। হায়দার-এ উল্লেখিত নজরুল ইসলাম, সম্পাদিত(১৯৯৬), ১৮-২৫। ইসলাম ও তার বন্ধু বেঁচে যান। কিন্তু ইতোমধ্যেই শাহনওয়াজ নিহত হয়েছেন ।

অধ্যায় ৩ - অসভ্যতার যুদ্ধঃ উচ্ছৃঙ্খল জনতা, বিদ্রোহ ও উম্মাদনা

১। FRUS,vol.XI,45-8.

২। ২০০৬ সালে লে. সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ'র সাথে লেখকের সাক্ষাতকার। ১৯ এপ্রিল টাইম পত্রিকায় রিপোর্টে ড্যান কগিন্স উল্লেখ করেন যে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক নাসিম ওয়াকারকে হত্যা করার পর তার দেহ রাস্তায় টেনে হেচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

৩। FRUS,vol.XI,47.

৪। FRUS,vol.XI,47-8.

৫। ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে অমিয় কুমার সুরের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার। শাঁখারীপট্টিতে এ সাক্ষাতকারের সময় বেঁচে যাওয়া অন্যরাও এগিয়ে এসেছিলেন ও তারা মাথা নেড়ে অমির সুরের দেয়া বক্তব্যকে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং কেউ কেউ তাদের অভিজ্ঞতার কথাও বলেছিলেন।

৬। ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শাঁখারীপট্টিতে হামলা চালিয়েছিল। ক্যাপ্টেন সালেহ হাসান মীর্জার নেতৃত্বে একই কোম্পানী যারা ২৫/২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান চালিয়েছিল, তারাই শাঁখারীপট্টিতে হাজির হয়েছিল। লে. ক. বাশারত সুলতান- কমান্ডিং অফিসার, ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এবং ক্যাপ্টেন সালেহ হাসান মীর্জা আমার সাথে কথা বলতে অস্বীকার করেন। কেন শাঁখারীপট্টিতে হামলা করা হয়েছিল এ রকম প্রশ্নের উত্তরে সে সময় ঢাকা ভিত্তিক অন্য একজন সেনাকর্মকর্তা জানান যে, তারা শুনেছেন শাখারীপট্টির মারওয়ারীরা বিত্তবান এবং তারা আওয়ামী লীগকে পৃষ্ঠপোষকতা করতো ও মুসলমানদের ওই গলি দিয়ে যেতে দিত না, মুসলমানদের হাঁটতে হতো জুতা খুলে। আর সম্ভবত লোভ, হিংসা, ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক কারণে হামলা হতে পারে ; তবে এ সব কারণেই যে শাঁখারীপট্টি সেনাবাহিনীর হামলার লক্ষ্যস্থল হয়েছে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

৭। ম্যাসকারেনহাস (১৯৭১), ১১৪।

৮। ২০০৪ এবং ২০০৫ সালে অমর সুরের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার। তার এক বেঁচে যাওয়া ভাই ও অন্য বেঁচে যাওয়ারাও ওই সাক্ষাতকার চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেন। অন্যরা মাঝে মধ্যে মতামত দিলেও তার ভাই কোনো কথা বলেননি।

৯। অমর সুরের দেয়া তথ্যানুযায়ী ওই স্টুডিওটির নাম ছিল এ কে স্টুডিও, শোভাবাজার, কোলকাতা। যে ব্যক্তি ওই ছবিটি তোলেন আরো অনেক ছবি তুলেছিলেন তাঁর ক্যামেরায় যা অত্যন্ত মূল্যবান হতে পারে যদি সে সব পাওয়া যায়।

১০। একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা সঠিকভাবে ছবিতে নিপীড়িতদের শনাক্ত করেছিল, কিন্তু ভুল করে উল্লেখ করেছিল যে মৃতদেহগুলো রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। ঢাকা মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর

www.pathagar.com

প্রকাশিত দলিলে ভুলভাবে ছবিটিতে ক্যাপশন দেয়া হয়েছে এভাবে: 'বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরপরাধ নারীদের ধর্ষণ করেছে এবং পরে তাদের সন্তানদের সাথে তাদেরও হত্যা করেছে'।

১১। 'দা' শব্দটা সাধারণত হিন্দুরা তাদের 'বড় ভাই'দের সম্বোধন করে থাকে। অনাত্মীয়দেরও অনেকক্ষেত্রে এ সম্বোধন করা হয়।

১২। জিঞ্জিরার বর্ণনায় দেখুন।

১৩। ঢাকায় ২৫/২৬ মার্চ সামরিক অভিযানে অংশ নেয়া বিভিন্ন সেনা ইউনিটের মধ্যে বেতার যোগাযোগের রেকর্ডিং থেকে নেয়া।

১৪। ২০০৬ সালে কর্ণেল (লে.) মুহাম্মদ আলী শাহের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

১৫। 'দৈনিক ঘটনাবলীর লগ-গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা'; ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহ (অপ্রকাশিত), ২০০৫ সালে ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাহর সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

১৬। সফিউল্লাহ (১৯৮৯), ২৭-৮।

১৭। কবির-এ উল্লেখিত ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, সম্পাদিত (১৯৯৯), ৩৩-৩৭।

১৮। কবির-এ উল্লেখিত লে. ক. মাসুদ উল হোসেন খান, সম্পাদিত (১৯৯৯), ৪৮-৪৯।

১৯। হায়দার-এ উল্লেখিত মেজর জেনালের সফিউল্লাহ, সম্পাদিত (১৯৯৬), ২২৬-৭। বাংলা থেকে লেখক কর্তৃক অনূদিত।

২০। সফিউল্লাহ (১৯৮৯), ২৭-৩৯।

২১। ব্রিগেডিয়ার করিমুলাহ, 'দৈনিক ঘটনাবলীর লগ- গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা' (অপ্রকাশিত)।

২২। সফিউল্লাহ (১৯৮৯), ৩৯।

২৩। ২০০৪ সালে রুস্তম আলী শিকদারের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

২৪। ২০০৪ সালে আব্দুর রব সর্দারের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

২৫। সর্দার মনে করেছিলেন যে ক্রিসেন্ট জুট মিলের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন ইংরেজ মি. ওয়ালেস। ক্রিসেন্ট জুট মিলের অন্য একজন কর্মচারী এস এম রকীব মনে করেছিলেন জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন জনাব মেহের আলী এবং তার সহকারী ছিলেন মি ম্যাকলাই যারা উভয়েই ছিলেন বোম্বের ইসমাইলীয়া সম্প্রদায়ের লোক। বাঙালিরা ইসমাইলীয়াদের ভালো মানুষ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যারা বাঙালি ও বিহারীদের সমান চোখে দেখতেন।

২৬। ২০০৪ সালে মুহাম্মদ সফি, সাবেক, পারভেজ আলম খান ও অন্যান্যদের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

২৭। আমি যে সব বাঙালিদের সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম তারা আমার কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে এ বছরের (১৯৭১) পরের দিকে বিহারীরা মিলে তাদের হত্যা করার জন্য ফাঁসির মঞ্চ স্থাপন করেছিল।

২৮। ২০০৫ সালে কর্ণেল (মেজর) শামীম জান বাররের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

২৯। পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র (১৯৯১), ৬৪-৯।

৩০। ২০০৪ সালে মুহাম্মদ আব্দুল হক ও শেখ সুলতান আহমেদের সাথে লেখকের আলাপ। যথাযত প্রমাণ দ্বারা আহমেদের দেয়া তথ্যের বিস্তারিত বর্ণনাকে বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে মেনে নেয়া যায় না। যা হোক, এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে সেনানিবাসে বাঙালি সেনারা বিদ্রোহ করেছিল ও অনেক পশ্চিম পাকিস্তানী সেখানে নিহত হয়েছিল। আহমেদের অনেক গল্পের একটি ছিল তিনি পরদিন একজন পাঞ্জাবীর জীবন বাঁচিয়েছিলেন। তিনি ওই পাঞ্জাবীটির নাম বলেছিলেন নাজির আহমদ যিনি গোলাম রসুল নামে একজন ব্যবসায়ীর ভাইপো ছিলেন, গোলাম রসুল গোলযোগ আরম্ভ হলে তার পবিরার-পরিজন নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যান ও তাঁর ব্যবসার দেখাশোনার জন্য তার ভাইপো নাজির আহমদকে রেখে যান। অবশেষে 'শান্তি কমিটির' একজন বাঙালি সদস্য তাদের সম্পত্তি আত্মসাত করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

www.pathagar.com

৩১। ব্রিগেডিয়ার (ক্যাপ্টেন) শওকত কাদির, পাণ্ডুলিপি (অপ্রকাশিত) ৭।
৩২। ২০০৫ সালে সেনা কর্মকর্তার সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।
৩৩। ২০০৫ সালে মেজর আনিস আহমেদের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।
৩৪। ব্রিগেডিয়ার (ক্যাপ্টেন) শওকত কাদির, পাণ্ডুলিপি (অপ্রকাশিত), ৭ এবং লেখকের সাথে সাক্ষাতকার, ২০০৫।
৩৫। ২০০৬ সালে ক্যাপ্টেন সারওয়ারের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।
৩৬। ২০০৬ সালে ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সফির সাথে সাক্ষাতকার।
৩৭। মিঠা (২০০৩), ৩৩৬-৮।
৩৮। রায় (২০০৩), ২১৫।
৩৯। হায়দার-এ উল্লেখিত চৌধুরী, সম্পাদিত (১৯৯৬) ও লেখকের সাথে শমসের মুবিন চৌধুরীর সাক্ষাতকার (২০০৫)। চৌধুরী অভিযোগ করেছেন হাসপাতালের বিছানায় থাকার সময়েও তাকে পেটানো হয়েছে ও তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে 'বর্বর', 'পশু-সুলভ', 'রক্ত উন্মাদ', হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যা হোক, তাকে দীর্ঘ সময় জেরা করা হয়েছিল ও সেপ্টেম্বর মাসে তার বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছিল এবং ডিসেম্বর মাসে যখন ভারত পাকিস্তানের মাঝে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তার তখন বিচার শুরু হওয়ার কথা ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন।
৪০। জাতি গোত্রের উপর ভিত্তি করে যে দ্বন্দ্ব- সংঘাত তৈরি হয়নি তা প্রদর্শনের জন্য জেনারেল মিঠা তার ব্যক্তিগত স্টাফ অফিসার হিসেবে একজন বাঙালি মেজরকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এর বিপরীতে তিনি লিখেছেন যে চট্টগ্রামে সামরিক হাসপাতাল পরিদর্শনকালে 'আমি হাসপাতালের ওয়ার্ড দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একজন আহত বাঙালি অফিসার যাকে পাহারা দিয়ে রাখা হয়েছিল সে আমার সাথে কথা বলতে চায়। আমি থেমে তাঁর কাছে যাই এবং সে আমাকে যা বলতে চায় তা হলো যে সে ও তাঁর সাথের লোকজন পশ্চিম পাকিস্তানী মহিলাদের ধর্ষণ করেছে এবং তাদের বাধ্য করেছে উলঙ্গ হয়ে নাচতে ; এরপর সে আনন্দের সাথে মরতে রাজি বলে জানায়। আমি এর কোনো জবাব না দিয়ে হেঁটে চলে গেলাম ...' (মিঠা (২০০০),
৪১। আমার গবেষণার সময় তিনজন অন্য পাকিস্তানী অফিসার নিরপেক্ষভাবে ঢাকা সামরিক হাসপাতালে হুবহু একই অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন, তবে তারা যে ওই আহত বাঙালি অফিসারকে চিনতেন ও তাঁর নামও জানতেন তা বলতে চাননি। ওই অফিসারটি বেঁচে যান ও স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারের উচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন।
৪১। ২০০৫ সালে লেখকের সাথে কর্ণেল (মেজর) আনিস আহমেদের সাক্ষাতকার।
৪২। ২০০৫ সালে লে. জেনারেল (ক্যাপ্টেন) আলী কুলি খান খটকের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।
৪৩। উদাহরণের জন্য দেখুন, *ওয়াশিংটন পোস্ট* ১২ মে ১৯৭১, *নিউ ইয়র্ক টাইমস* ১১ মে ১৯৭১ ও এসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্টস।
৪৪। রায় (২০০৩), ২১৪-২১। আইন-শৃঙ্খলার অবনতির আরেকটি নমুনা হতে পারে এ ঘটনা যেখানে তাঁর এলাকার ডিসি ও এসডিও একজন পাঠান ঠিকাদার সিকদার নূরুজ্জামান খানকে তার আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিতে বলেন এবং আশ্বস্ত করেন যে তার জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হবে। নূরুজ্জামান খান তাদের কথামতো তাঁর অস্ত্র জমা দেন, কিন্তু বাঙালি ইপিআর সৈনিকরা তাকে হত্যা করে। পুলিশের বিহারী রিজার্ভ ইন্সপেক্টর ও তার পরিবারবর্গকেও হত্যা করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী একটি সমন্বিত দল হিসেবে তাদের অভিযান পরিচালনা করেনি। উদাহরণ স্বরূপ- একটি সেনা ইউনিট চট্টগ্রামের বাঙালি পুলিশ সুপারকে প্রশাসনকে পুনরায় সহায়তা দেয়ার জন্য বলেছিল, কিন্তু অন্য একটি সেনা ইউনিটের অফিসার ওই ব্যক্তিকে উঠিয়ে নিয়ে যান যাকে আর কখনোই দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

৪৫। ২০০৪ সালে জয়নাল আবেদীন দেওয়ানের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।
৪৬। সিদ্দিকী (১৯৯৭), খণ্ড ১।
৪৭। জয়দেবপুর অংশ দেখুন।
৪৮। সিদ্দিকী (১৯৯৭), খণ্ড ১, ১৮-৩৫।
৪৯। ২০০৬ সালে লেখকের সাথে লে. আতাউল্লাহ'র সাক্ষাতকার।
৫০। ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল 'ডেথ এন্ড ভিক্টরি ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে যে রিপোর্টটি ছাপা হয় প্রকৃতপক্ষে সেটির সংবাদদাতা ছিলেন বলে মনে হয় গার্ডিয়ান পত্রিকার মার্টিন উলাকট। বিবিসি'র মার্কটালী ৭ এপ্রিল উলাকট-এর নিবন্ধের উল্লেখ করেন। ১৯৭১ সালের বৈদেশিক সংবাদপত্র নিয়ে গবেষণা করার সময় আমি *দি টেলিগ্রাফে* ৭ এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত একটি ছবি দেখতে পাই যার শিরোনাম ছিল: 'মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত একজন পশ্চিম পাকিস্তানী লেফটেন্যান্টের সাক্ষাতকার নিচ্ছেন একজন প্রতিবেদক যাকে আরো ষোলজন সৈন্যের সাথে যশোরের নিকটবর্তী এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা।' এখানে বলা হয়নি কীভাবে ওই লেফটেন্যান্ট মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। চুয়াডাঙ্গা থেকে পাওয়া একটি সংবাদ ওই একই পাতায় ছাপা হয়েছিল। কোলকাতা থেকে ডেভিড লোশাকের পাঠানো একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল: 'Britons tell of army's massacre in Chittagong', কিন্তু বৃটিশ যাদের সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল তারা বলেছিলেন যে উভয়পক্ষই একে অপরকে হত্যা করেছিল। এছাড়া প্রায় সকল বিদেশী রিপোর্টে হতাকাণ্ড নিয়ে বলা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বাঙালিদের হাতে সাধারণ অবাঙালিদের বিরুদ্ধে বর্বরতার অনেক ঘটনা ঘটেছে।
৫১। লেখকের সাথে মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান-এর সাক্ষাতকার, ২০০৪; ব্রিগেডিয়ার এ.এল.এ. জামান এবং কর্ণেল কামাল উদ্দিন, ২০০৬; ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সফি, ২০০৬। সন্দেহ দূর করতে দুই জ্ঞাতি ভাইকে তাদের ১৯৭১ সালের পদবী দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে- ক্যাপ্টেন জামান ও লে. ইমাম হিসেবে।
৫২। হায়দার-এ উল্লেখিত মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান (২০০১, ২০০২), সম্পাদিত (১৯৯৬), *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১।
৫৩। ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সফি আলিগড়ে জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই বেড়ে উঠেন যেখানে তাঁর পিতা অর্থনীতির একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে পছন্দ করতেন এবং তাকে তিনবার সেখানে পোষ্টিং করলে তিনি আনন্দের সাথে সরকারের হুকুম মেনে নিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চ/এপ্রিলে চট্টগ্রামে তাঁর দায়িত্ব শেষ হলে তাকে ফেনীতে পাঠানো হয়।
৫৪। ২০০৫ সালে মেজর আব্দুল মজিদের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার। তিনি ক্যাপ্টেন জামানকে স্মরণ করেছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন বাঙালি অফিসার হিসেবে যিনি যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করেন।
৫৫। হায়দার সম্পাদিত (১৯৯১), খণ্ড: ৪, কুমিল্লার ডিসি শামসুল হক খানের উপর বর্ণনা দিয়েছিলেন তার ভাই এ কে এম ফজলুল হক খান। তিনি উল্লেখ করেছেন, ডিসি ও এসপিসহ অন্যান্যরা মার্চের প্রথম থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। সৈন্যদের রেশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, এসপিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন ব্রিগেড কমান্ডারকে অস্ত্রাগারের চাবি দেয়া না হয়। যখন জেনারেল মিঠা ২৬ মার্চ নিখোঁজ ৫৩ ব্রিগেড-এর সন্ধান করছিলেন, তখন তিনি কুমিল্লা সেনানিবাসে গিয়ে সেখানে আর্টিলারীর একজন লে. কর্নেল অথবা মেজরকে প্রচণ্ড উত্তেজিত ও ঘাবড়ে যাওয়া অবস্থায় দেখতে পান। তিনি দাবি করেন কুমিল্লা সেনানিবাস আক্রমণ করার জন্য বিপুল জনসমাবেশ করা হয়েছিল। তারপর 'আমি তাকে বলি যে সে ডানা ঝাঁপটানো পাখির মতো ছটফট করছে'..... (মিঠা (২০০৩),

www.pathagar.com

৩৩৬। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে ২৭-২৮ মার্চ লে.কর্নেল ইয়াকুব মালিকের নির্দেশে ১৭ জন বাঙালি অফিসার ও ৯২৫ জন মানুষ হত্যার ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। লে. ক. ইয়াকুব মালিক কমিশনকে প্রমাণ উপস্থাপন করেন ও অভিযোগটি অস্বীকার করেন (HRC report, 510, 512)।

৫৬। সফিউল্লাহ (১৯৮৯), ৬৬-৭৮।

অধ্যায় ৫ - বিধবাদের গ্রাম : গ্রামাঞ্চলের 'নিরাপত্তা নিশ্চিত করা'

১। ২০০৪ সালে রায়হান আলীর সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

২। তিন হাজার সংখ্যাটি খুব বেশি, এমনকি পাশের এলাকার নিহতদের নিয়ে গণনা করার পরও এবং বাইরের নিহত বিদ্রোহী পুলিশের সংখ্যাও যদি-এর সাথে যোগ করা হতো। ওই স্থানটি আমার পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে নদীর তীরের ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে এরূপ পরিবেশে কয়েক শত লোক সেখানে থাকতে পারতো, বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে।

৩। ২০০৪ সালে মাহমুদা বেগমের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোকের উল্লেখ করা হয়েছিল। এ গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের দ্বারা বেলুচদের বিশ্লেষণ।

৫। ২০০৪ সালে ওয়াজানের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

৬। ২০০৪ সালে মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তারের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

৭। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

৮। চর: নদীতে বালি জমা হওয়ার ফলে জেগে ওঠা বালি/মাটির শুষ্ক স্থান।

৯। একজন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন, ১২ পাঞ্জাব-এর যে কর্মকর্তাটি ওই স্থানে দায়িত্বরত ছিলেন তিনি খুব সম্ভবত একজন পাঠান মেজর সাইফুল্লাহ খান। আমি মেজর সাইফুল্লাহর সন্ধান করেছি, কিন্তু পরে জানতে পেরেছি যে তিনি মারা গেছেন।

১০। ২০০৪ সালে মুহাম্মদ জিন্নাতুল আলমের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

১১। সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়েছিল। তবে তাদের স্ত্রীদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল আলম তা বলেননি।

১২। রায়হান আলী ও তাঁর পিতা মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার বলেছেন সেনা দলটি রাজশাহী থেকে এসেছিল, অন্যদিকে আলম নিশ্চিত হয়ে বলেন যে, সেনা দলটি ঢাকা থেকে রাজশাহীর দিকে আসছিল।

১৩। আলম তার ছোট ভাই ও ভগ্নিপতিকে কাঠের গুড়ি ধরে নদী পার হওয়া থেকে বিরত করেছিলেন এবং পরবর্তীতে এ দু'জনই সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন যার জন্য আলম নিজেকে বড় অপরাধী মনে করে মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি তার বিধবা বোন ও পরিবারকে দেখাশোনা করতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। আমি আলমের সাথে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছি।

১৪। বাংলায় 'জেড'কে সাধারণত 'জে' উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, আর তাই 'Zimnatul'-কে 'Jinnatul'-এর ন্যায় উচ্চারণ করা হয়।

১৫। পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ থেকে।

১৬। ঘোড়ার গাড়ি ।

১৭। ২০০৫ সালে লেখকের সাথে লে. কর্নেল মুহাম্মদ তাজের সাক্ষাতকার। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব সাক্ষাতকার দিতে রাজি হননি।

১৮। মিঠা (২০০৩), ৩৪৩-৪।

www.pathagar.com

১৯। লে. কর্নেল (পরে মে. জেনারেল) রিজভী সাক্ষাতকার দিতে অস্বীকার করেন।

২০। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা নাজিম মাহমুদ ভাইস চ্যান্সেলার সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করে লিখেছেন যে, তিনি (নাজিম) ২১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন ও কবি আল্লামা ইকবালের জন্মদিবস উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করার জন্য তাকে বলা হয়। যা হোক, ইকবালের জন্মবার্ষিকী ৯ নভেম্বর, আর তার মৃত্যুবার্ষিকী হচ্ছে ২১ এপ্রিল। মাহমুদ লিখেছেন, ওইদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে চারজন সেনা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন (হায়দার-এ উল্লেখিত মাহমুদ, সম্পাদিত ১৯৯৬; ৮৯-৯২)।

২১। এ কর্মকর্তাটি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশোয়ার শহর থেকে আগত ছিলেন। মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার বাঙালি গ্রামবাসী যিনি থানাপাড়ার হত্যাকাণ্ড থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। তিনি উল্লেখ করেন যে, একটি দ্বিতীয় সেনা ইউনিট যেটি পাঠান ইউনিট ছিল, তারা মুক্তারপুর ক্যাডেট কলেজের নিকট নদীর তীরে গিয়েছিল, কিন্তু কাউকে হত্যা করেনি। ১৮ পাঞ্জাব ও ৩২ পাঞ্জাবের কোন কর্মকর্তা যারা আমার সাথে কথা বলেছেন তারা কেউই মুক্তারপুর ক্যাডেট কলেজকে শনাক্ত করতে পারেননি, যদিও সকলেই সারদা পুলিশ একাডেমী ভালোভাবেই চিনতে পেরেছেন। তবে কেউ কেউ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ-এর নাম শনাক্ত করতে পেরেছিলেন।

২২। ১৯৭১ সালে ২৫/২৬ মার্চ এ রেজিমেন্টের 'ডি' কোম্পানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযানে জড়িত ছিল।

২৩। বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা 'জাতীয়তার ভিত্তিতে ' শত্রু'র প্রকৃতি নির্ধারণ সম্পর্কে ৯ নম্বর অধ্যায় দেখুন।

২৪। ১৮ পাঞ্জাবের একজন কর্মকর্তা আমাকে বলেন যে, তিনি যখন বাড়ি ফিরে যান তখন তার পিতা তার কাছে সুস্পষ্টভাবে জানতে চান তাঁর রেজিমেন্ট পূর্ব পাকিস্তানে আসলে কি ধরনের কাজ করেছে। একজন বাদে সকল পাকিস্তানী কর্মকর্তা যারা আমার সাথে কথা বলেছেন তারা জানিয়েছেন যে কখনোই তারা নিরস্ত্র মানুষদের ধরে আনা বা হত্যার মতো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হননি। বিস্ময়ের ব্যাপার ৫৭ ব্রিগেডের তদানীন্তন ব্রিগেড কমান্ডার জাহানজেব আরবাব ও তার ব্রিগেডের অধীনস্থ ৩২ ও ১৮ পাঞ্জাবের অধিনায়ক যথাক্রমে লে. কর্নেল তাজ এবং লে.কর্নেল বাশারাতকে ১৯৭১ সালেই পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট অনুযায়ী ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল মুজাফ্‌ফর আলী খান, ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল তোফায়েলসহ ১৮ পাঞ্জাবের মেজর মদদ হোসেন শাহ্- এর বিরুদ্ধে 'লুট তরাজের' অভিযোগ আনা হয়। (এইচ আর সি রিপোর্ট,৫০৫-৬) কিন্তু রিপোর্টে তাদের বিচার বা অভিযোগের ব্যাপারে কোনো রায়ের উল্লেখ করা হয়নি।

২৫। FRUS,vol.XI,10-1.

২৬। FRUS,vol.XI,35-6.

অধ্যায় ৬ - হিন্দু শিকার: সংখ্যালঘু নির্যাতনের রাজনীতি

১। ব্লাড (২০০২), ২১৬।

২। নিতাই গায়েনের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৪।

৩। চুকনগর ও খুলনা জেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ও বেঁচে যাওয়াদের সাথে চুকনগর হত্যাকাণ্ড নিয়ে লেখকের সাক্ষাতকার, ২০০৪-৫।

৪। এটি বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি দল যারা চুকনগর হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন। তারা ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত একটি 'মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে' ২০০ জনের সাক্ষাতকার নেন ও তার মধ্যে বাছাইকৃত ৯০ জনের সাক্ষাতকার উক্ত বইটিতে

www.pathagar.com

সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ বইটির দাবি অনুযায়ী হালকা অস্ত্রে সজ্জিত একটি ছোট সেনাদল, সম্ভবত একটি প্লাটুন (প্রায় ত্রিশ জন হবে হয়তো) চুকনগরে ১০,০০০ লোককে হত্যা করেছে। এধরনের দাবি কি আদৌ বাস্তবসম্মত বা যুক্তিযুক্ত বা বাস্তব প্রেক্ষাপটের সাথে কোনো রকম সামঞ্জস্য আছে কিনা তা বিবেচনায় না নিয়েই এরকম দাবি করা হয়েছে (মামুন, সম্পাদিত- ২০০২)।

৫। সেনাবাহিনী দ্বারা বছরের পরের দিকে স্থানীয় পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালি ও বিহারীদের নিয়ে গঠিত সহায়ক শক্তি/বাহিনী।

৬। বিহারীরা ছিল অবাঙালি পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমান যারা ১৯৪৭ সালে ভারতের উত্তরাঞ্চল প্রদেশ বিহার থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গমন করেছিল।

৭। চুকনগরের সব মুসলমানই হতভাগ্য হিন্দুদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বা দুস্থ ও ভুক্তভোগী হিন্দুদের প্রতি উদাস ছিল না। এ ক্ষেত্রে চুকনগরে দু'জন মুসলমান মহিলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন মহিলা নিতাই গায়েনের শরীর পেঁচিয়ে মাদুরের উপর বসেছিলেন যেন সেনারা নিতাই গায়েনকে দেখতে না পায়, অপরজন ছিলেন আহত শৈলেন জোয়ারদারকে উদ্ধার করে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা শ্রশ্রূষাকারী মহিলা।

৮। ব্লাড (২০০২), ২১৭।

৯। ব্লাড (২০০২), ২১৬-৭।

অধ্যায় ৭-হিট এন্ড রান : অন্তর্ঘাত ও প্রতিশোধ

১। সাস্থি ব্রত,'বিগ ব্রাদার্স গোস টু ওয়ার', *দি গার্ডিয়ান*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

২। সিং (১৯৮১), ৬০।

৩। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ২১২।

৪। 'একটি অস্থির বা অবাস্তব উদ্দেশ্য: পূর্ব পাকিস্তানীরা আমরণ যুদ্ধ করার ঘোষণা করেছিল কিন্তু তারা তা করেনি', পিটার কান, *ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল*, ২১ এপ্রিল, ১৯৭১।

৫। *নিউইয়র্ক টাইমস*, ১০ মে ১৯৭১।

৬। *ওয়াশিংটন পোস্ট*, ১৩ মে ১৯৭১।

৭। 'An urge of self-destruction', হার্ভে স্টকউইন,*ফিনান্সিয়াল টাইমস্*, ২১শে মে ১৯৭১।

৮। ২০০৫ সালে আবুল বারক আলভীর সাথে লেখকের সাক্ষাতকার। হায়দার-এ উল্লেখিত আলভী, সম্পাদিত (১৯৯৬), ১৬৩-৬ এবং কবির-এ উল্লেখিত আলভী, সম্পাদিত (১৯৯৯), ৮৭০৯৩।

৯। হায়দার-এ উল্লেখিত সারা আরা মাহমুদ, সম্পাদিত; স্মৃতি ১৯৭১, খণ্ড-১, ১৫৮-১৬০।

১০। গেরিলা কার্যকলাপে যুক্ত থাকার সন্দেহে ঢাকায় গ্রেফতারকৃতদের দেয়া বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, তাদের সামরিক আইন আদালতে নেয়া হয়েছিল এবং সেনাবাহিনী যে সব স্থানে হানা দিয়েছে সে সব স্থান থেকে সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের গ্রেফতার করেছিল। পরে যাদের ব্যাপারে গেরিলা তৎপরতার সাথে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি তাদের ছেড়ে দেয়া হয় ও তারা বাড়ি ফিরে যায়। বাকী যাদের সক্রিয় গেরিলা কর্মী হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছিল তাদের আর কখনোই সন্ধান পাওয়া যায়নি, ধরে নেয়া হয় যে তাদের বধ করা হয়েছে।

১১। মাসুদ সাদেক চুল্লু, লিনু বিল্লা, আলতাফ মাহমুদের একজন আত্মীয় এবং নাসের বখতিয়ার আহমেদ, আলতাফ মাহমুদের একজন প্রতিবেশী জেরা কেন্দ্রে তাদের অভিজ্ঞতার প্রায় একই ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন। একই সহবন্দীদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিজনের বর্ণনায়- গেরিলা জুয়েল, রুমী, জামী (রুমীর ছোট ভাই), রুমীর আব্বা শরীফ ইমাম, বদিউল আলম

www.pathagar.com

(পালাতে চেষ্টা করেছিলেন), ঢাকা টেলিভিশনের হাফিজ ও অন্যান্যরা। দেখুন কবীর, সম্পাদিত (১৯৯৯); আরো দেখুন জাহানারা ইমাম (১৯৮৬)।

১২। বেলুচদের মানবিক দিক নিয়ে বাঙালিদের ধারণার জন্য দেখুন নবম অধ্যায়।

১৩। রমনা থানায় আটক আরো অনেকেই থানায় রাতে রেজিস্ট্রি করার নিয়ম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

১৪। ইমাম (১৯৮৬)। পরবর্তীতে কয়েকজন বাংলাদেশী মন্তব্য করেন যে বইটি খুব সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে তবে এর সকল বর্ণনাকে সঠিক বলে ধরে নেয়াটা ঠিক হবে না।

১৫। যে বয়স্ক ও দয়ালু সৈনিকটির কথা আলভী উল্লেখ করেছেন সেই সৈনিকটি জাহানারা ইমামের টেলিফোনে অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাদের রুটি এনে দিয়েছিলেন। আলভী তাকে বেলুচি বলে মনে করেছিলেন কিন্তু জাহানারা ইমাম লিখেছেন ওই সৈনিকটি ছিলেন একজন বিহারী। কাজেই দেখা যাচ্ছে একই ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন বাঙালি একজন অতি দয়ালু বেলুচি হিসেবে,আবার একজন অতি নিষ্ঠুর বিহারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

১৬। লিওনার্দ গর্ডন, *Bengal: The Nationalist Movement 1876-1940*, Manohar. 1979, 156।

১৭। হায়দার-এ উল্লেখিত সিংঘানিয়া, সম্পাদিত (১৯৯৬), ১৩১-২।

১৮। ২০০৫ সালে কর্ণেল মুহাম্মদ সফির সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

১৯। হায়দার-এ উল্লেখিত মুহাম্মদ সফিকুল আলম চৌধুরী, সম্পাদিত (১৯৯৬), ১৩১-৭।

২০। বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস*, দলিলসমূহ, খণ্ড : ১১১, ৫১১-১২। এ খণ্ডগুলো সরকারি দলিল ও বেসরকারি বিষয়বস্তু যেমন নির্বাচিত সংবাদপত্রের নিবন্ধ সমূহের সমন্বয়ে গ্রন্থিত। মনে হয়েছে প্রকাশক ওই সব বেসরকারি তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই এর কোনো চেষ্টা করেননি, যেমন এ তথ্যটিও যাচাই করা হয়নি।

২১। ২০০৬ সালে ব্রিগেডিয়ার আমির মুহাম্মদ খানের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

২২। ২০০৪ সালে বড়ইতলায় মুহাম্মদ আলী আকবর, জয়নাল আবেদিনের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার ও অন্যান্য গ্রামের অধিবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা। স্মৃতিচিহ্নটি একটি আধুনিক ভাস্কর্যের অনির্ণীত স্থাপনা যাতে 'দাঁড়াও পথিকবর'- কবিতার এ চরণ লেখা একটি ফলক লাগানো ছিল। আমরা সেস্থানে পৌঁছে দেখলাম একজন লোক-এর ছায়ায় শান্তিপূর্ণভাবে ঘুমাচ্ছেন।

২৩। জয়নাল আবেদিনের ছোট মেয়ে দৌড়ে বাড়ি গিয়েছিল ও ১৯৭১ সালে কিশোরগঞ্জে শহীদদের উপর লেখা একটি বই নিয়ে ফিরে আসে, যেটি স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত ও তাতে ওই বছর ওই এলাকায় নিহত ১৫৪ জন লোকের নাম তালিকাভুক্ত ছিল। বইটি দেখে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে যে, এ ধরনের বই বাংলাদেশের জন্য খুব দরকার। যা হোক সেখানে জনসমাগমের মাঝে উপস্থিত একজন যুবক বলেন, বইটিতে অনেক ভুল তথ্য আছে, কেননা এমন লোকেরও নাম ওই বইয়ে মৃতদের তালিকায় রয়েছে যিনি এখনো জীবিত আছেন। অন্যরা এ ভুলের ব্যাপারে সেখানে একমত হয়েছিলেন। (অপরদিকে, তালিকাটিতে যুদ্ধের প্রকৃত ভুক্তভোগীদের নাম হয়তো মুছে গেছে।) যে যুবকটি বলেছিলেন মৃতদের তালিকায় জীবিতদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পরে তিনি উল্লেখ করেন মাওলানা হাফিজ হচ্ছেন তাঁর দাদা। আগেই বলা হয়েছে এ মওলানা হাফিজ তাঁর গ্রামবাসীকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দাদার গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। তিনি অন্য একটি মতবাদও উপস্থাপন করেন: তিনি বলেন যে, রাজাকারটি এসে সেনাবাহিনীর সাথে তার অসুস্থ বা আহত ভাই-এর ব্যাপারে কথা বলেছিল সে যেহেতু ভালো উর্দু বলতে পারতো না তাই সেনারা সম্ভবত ভুলবশত মনে করেছিল তাদের নিজেদের কোনো লোক/সৈনিক হয়তো গ্রামে নিহত হয়েছে। আর এ কারণেই তারা উন্মত্ত হয়ে বেপরোয়াভাবে গুলি চালিয়ে প্রত্যেককে হত্যা

www.pathagar.com

করে। এরূপ পরিস্থিতিতে এ রকম একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে ডজন ডজন বেসামরিক ব্যক্তিকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়, কারণ সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষ একে অপরের ভাষা আক্ষরিক অর্থেই বুঝতে সক্ষম ছিল না।

২৪। ১৯৭১ সালে ১ ডিসেম্বর নরসিংদীর নিকট ঘোড়াশালে ন্যাশনাল জুট মিলে পাকবাহিনী দ্বারা বিনা কারণে গণহত্যার বর্ণনা দিয়েছেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বাঙালি। উদাহরণস্বরূপ দেখুন হায়দার, সম্পাদিত, স্মৃতি ১৯৭১ সিরিজ।

২৫। ২০০৪ সালে এসএম রকিব আলীর সাথে লেখকের সাক্ষাতকার।

২৬। মজার ব্যাপার হলো রকিব আলী বলেছিলেন 'প্রথম ছিলেন জেনারেল ফরমান আলী, পরবর্তীতে ছিলেন জেনারেল এ কে নিয়াজী', তাঁর বলার ধরণটা এমনই ছিল যে মনে হতে পারে জেনারেল নিয়াজী পরে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন বলে তিনি জেনারেল ফরমানের নাম আগে বলেছেন, নয়তো বাঙালিরা জেনারেল ফরমান আলীকেই হয়তো অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে করতেন।

২৭। খুলনা যুদ্ধের বর্ণনা জানতে দেখুন হায়াত (১৯৯৮)।

২৮। ২০০৪ সালে লেখকের সাথে কবির মিয়ার সাক্ষাতকার।

২৯। সিং (১৯৮০), ৩০-৭।

৩০। সিং (১৯৮১), ৫০-৬৪।

৩১। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ২১২।

৩২। জ্যাকব (২০০০), ৯০-৪।

৩৩। সিং (১৯৮১), ২৮৮।

৩৪। সান্ডি ব্রত,'বিগ ব্রাদার গোজ টু ওয়ার', *'দি গার্ডিয়ান'*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। এটি আক্ষরিক অর্থেই একটি অন্যন্য আকর্ষণীয় বর্ণনা, কেননা লেখক তাঁর নিজের ভাষা বাংলায় কথা বলতে পারতেন ও পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াতে পেরেছিলেন, কিন্তু ভারতের ভিতর থেকে কোনো সাংবাদিক এভাবে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না। *'দি গার্ডিয়ান'* তাঁর রিপোর্টের সাথে মন্তব্য করে: 'তিনি যদি ভারত থেকে তার এ প্রতিবেদনটি পাঠাতেন তাহলে তাকে গ্রেফতার করা হতো'।

অধ্যায় ৮ - ভ্রাতৃ হত্যা: যুদ্ধ শেষের মৃত্যুদূত

১। কন্যা ফারজানা চৌধুরী নীপা ও তার দেবর- পরবর্তীতে তার দ্বিতীয় স্বামী হাফিজ চৌধুরীর উপস্থিতিতে শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর সাক্ষাতকার। আরো দেখুন হায়দার-এ উল্লেখিত চৌধুরী, সম্পাদিত (১৯৯৩), ১৯৪-৯ এবং চৌধুরী ইন হায়দার, সম্পাদিত (১৯৯৬), ২০৩-৭।

২। নিয়াজী (১৯৯৮), ৭৪-৯।

৩। পূর্ব বাংলার বাঙালির গা জড়ানো পরিধেয় বস্ত্র ।

৪। *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ গ্রন্থ*, রশিদ হায়দার সম্পাদিত (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), এতে ২৪ জন *বুদ্ধিজীবীর* নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে-পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী যাদের আল- বদররা ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অপহরণ করেছিল এবং যারা নিহত হয়েছেন বা ' চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছেন'। এরা হলেন: এ.এন.এম গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক (১২ ডিসেম্বর.); আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক (১৪ ডিসেম্বর) আব্দুর রউফ সর্দার, অর্থনীবিদ (৮ ডিসেম্বর); আলিম চৌধুরী, ডাক্তার (১৫ ডিসেম্বর); আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক (১৫ ডিসেম্বর); আবুল খায়ের, অধ্যাপক (১০ ডিসেম্বর); এ কে এম সিদ্দিক, আইনজীবী (১৪ ডিসেম্বর); এম এ এম ফইজুল মাহি, অধ্যাপক (১৪ ডিসেম্বর); গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক (১৪

www.pathagar.com

ডিসেম্বর); নিজাম উদ্দিন আহমেদ, সাংবাদিক (১২ ডিসেম্বর); মুহাম্মদ আকতার, লেখক (১৪ ডিসেম্বর); মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক (১৪ ডিসেম্বর); মুহাম্মদ আমিন উদ্দিন, বিজ্ঞানী (১৪ ডিসেম্বর); মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক (১৪ ডিসেম্বর); ফজলে রাব্বী, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (১৫ ডিসেম্বর); মুহাম্মদ মুর্তাজা, চিকিৎসক (১৪ ডিসেম্বর); রশিদুল হাসান, অধ্যাপক (১৪ ডিসেম্বর); শহীদুল্লাহ কায়সার, সাংবাদিক (১৪ ডিসেম্বর); সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক (১৪ ডিসেম্বর); সিরাজুল হক খান, অধ্যাপক (১৪ ডিসেম্বর); সিরাজউদ্দিন হোসেন, সাংবাদিক (১০ ডিসেম্বর); সৈয়দ নাজমুল হক, সাংবাদিক (১১ ডিসেম্বর); সেলিনা পারভীন, লেখিকা (১৪ ডিসেম্বর); রকিবুল হায়দার চৌধুরী, লেখক (১৩ ডিসেম্বর)।

৫। মানবাধিকার কমিশন রিপোর্ট, ৫১১-১২।

৬। অন্যান্য নিখোঁজ বা নিহতদের পরিবারের সদস্যরা শ্যামলী নাসরীন চৌধুরীর মতো স্মৃতিকথা লিখেছেন। দেখুন রশিদ হায়দার সম্পাদিত স্মৃতি '৭১ সিরিজ, খণ্ড-১-১৩। যে সব যুবক বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের অপহরণ করেছিল তাদের মধ্যে একজন বাঙালি যুবককে অনেকেই শনাক্ত করেছেন। ১৯৯৪ সালে বৃটিশ চ্যানেল ফোর এ প্রচারিত 'ওয়ার ক্রাইমস ফাইল' শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয় যে, ওই যুবকটি প্রকাশ্যে লন্ডনে বসবাস করছেন। স্মৃতিচারণ সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ডাক্তার ফজলে রাব্বীর স্ত্রী জাহানারা রাব্বীই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছিলেন। তিনি দাবি করেছেন যে, তিনি ১৫ ডিসেম্বর একজন কর্ণেলের(মার্শল ল' কোর্টের প্রধান জেরাকারী হিসেবে অনেকেই তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন) সাথে কথা বলেছিলেন এবং ওই কর্ণেল ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. চৌধুরী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কুঁড়িজন অধ্যাপককে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন। জাহানারা রাব্বী আরো দাবি করেছেন তিনি আবারো ১৬ ডিসেম্বর সকালে ওই একই কর্ণেলের সাথে কথা বললে তিনি জানিয়েছিলেন বন্দিদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা তিনি জানতেন না [হায়দার-এ উল্লেখিত জাহানারা রাব্বী, সম্পাদিত, স্মৃতি ১৯৭১, খণ্ড-২ (১৯৮৯)]। আমি মিসেস রাব্বীকে খোঁজার চেষ্টা করলে জানতে পারি, তিনি মারা গেছেন। অন্য কোনো পরিবার পাক সেনা কর্মকর্তার কথা উল্লেখ করেননি।

৭। দেলোয়ার হোসেনের স্মৃতিচারণ ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। দেলোয়ার হোসেনের স্মৃতিচারণ পুনরায় প্রকাশিত হয় 'একাত্তরের ঘাতক দালালেরা কে কোথায়' শীর্ষক বইয়ে (মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৯), সৌজন্য মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর, ঢাকা। উপরে উল্লেখিত চ্যানেল ফোর- এর প্রতিবেদনেও দেলোয়ার হোসেনকে দেখানো হয়েছে।

৮। আমি মাওলানা মান্নানের পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য অনুরোধ করলে আমাকে তাঁর চরম অসুস্থতার কথা জানানো হয়েছিল, আরো জানানো হয়েছিল যে, তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তার কয়েক মাস পর তিনি মারা যান।

৯। হায়দার সম্পাদিত, *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ গ্রন্থ* (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, ১৯৯৪)। এ কোষগ্রন্থে ২৪ জন পেশাজীবীর উল্লেখ করা হয়েছে যাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে এবং রায়ের বাজার বা অন্য অজানা স্থানে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। যদি দেলোয়ার সেখানে ১৩০-১৪০ জন লোককে দেখতে পাওয়ার কথা বলেন, তাহলে বাকী লোকগুলো কারা ছিলেন তা স্পষ্ট নয়।

১০। হায়দার-এ উল্লেখিত জাহানারা রাব্বী, স্মৃতি-১৯৭১ (১৮৯), খণ্ড-২, ২৬।

১১। আমি রায়েরবাজার হত্যাকাণ্ডের একমাত্র বেঁচে যাওয়া ব্যক্তি দেলোয়ার হোসেনের খোঁজ করলে একজন যুবকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় যে যুবকটি দেলোয়ার হোসেনের অবস্থান নির্ণয় করতে ইতোপূর্বে অন্য একটি গবেষক দলকে সাহায্য করেছিলেন।

www.pathagar.com

এ যুবকটির নিজের পিতাও যুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে 'হারিয়ে যান' ও তাঁর মরদেহ আর কখনোই পাওয়া যায়নি। ওই সময় তিনি দেলোয়ারের কোনো সন্ধান দিতে ব্যর্থ হন। যা হোক তিনি আমাদের একটি দলকে দেলোয়ার হোসেন যা বলেছেন, তার একটি প্রাণবন্ত বর্ণনা দেন। এভাবে বর্ণনা দেয়ার সময় তিনি বলেন, দেলোয়ার হোসেন রায়েরবাজারে '৮০০-৯০০' জন বন্দিকে দেখেছেন ও হত্যাকারীরা যখন একজন নারী বন্দিকে গণধর্ষণ করছিল তখন দেলোয়ার ভালোভাবেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এর ক'দিন পর আমি উপরে উল্লেখিত দেলোয়ার হোসেনের বর্ণনা পড়ার সুযোগ পাই। এতে রায়ের বাজারে বন্দিদের সংখ্যার হিসেব দেয়া হয়েছে ১৩০-১৪০ জন এবং বলা হয়েছে তার সামনেই বন্দিদের হত্যা করার সময় তিনি পালিয়ে যান। ডিসেম্বর হত্যাকাণ্ডের শিকার একজন পিতার সন্তান হিসেবে উল্লেখিত যুকবটির প্রতি সঠিক চিন্তা করেন এমন সব মানুষের গভীর সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু এটাতো তাকে সংখ্যাকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে বলা ও ঘটনার বিকৃত বর্ণনা দেয়ার লাইসেন্স দেয়নি। যা প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল তা ছিল ভয়ংকর তবে সকল দায়িত্বহীন অলংকরণ সাক্ষ্য প্রমাণসহ দলিল তৈরিতে বাধা সৃষ্টি করেছে ও বাংলাদেশী লেখক গবেষকদের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতিসাধন করেছে।

১২। এ বইয়ের বিভিন্ন উদাহরণে যেমন দেখানো হয়েছে, সংঘাতে প্রতিপক্ষের উপর নির্যাতন সকল পক্ষ থেকেই হয়েছে, যারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল তারাও বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে একটি বিরক্তিকর, তবু অনুদঘাটিত প্রশ্ন ছিল সংঘাতে শিশুদের উপর বর্বরতার প্রভাব। শিশুরা কেবলমাত্র শিকারই ছিল না বরং তারা অনেক বর্বরতার চাক্ষুস সাক্ষীও ছিল, তাদের সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়ার মতো কাজেও কখনো কখনো নিয়োজিত করা হয়েছিল। তাদের বলা যেতে পারে 'চাইল্ড ওয়ারিয়রস্' যাদের নিয়োজিত করা হয় 'স্বাধীনতার' জন্য কাজ করায়। একজন সাবেক মুক্তিযোদ্ধা আমাকে বলেছেন যে, তাদের দলের একটি ১৩/১৪ বছরের বালক ছিল যে নির্যাতন চালানোর ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। সে ব্লেড দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী বন্দিদের শরীরের বিভিন্ন স্থান কেটে সেখানে লবণ ও মরিচ মাখিয়ে দিতো। জানা যায়নি বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ওই সব বালকদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল এবং ওই সব বর্বরতার কী প্রভাব বাংলাদেশের সমাজে পড়েছিল।

১৩। 'Indian Army arrests 'Tiger of Tangail' after Dacca bayonetings', *দি টাইমস*, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১।

১৪। সিদ্দিকী (১৯৮৫, ১৯৯৭), খণ্ড-২, ২৯৯-৩০৫।

১৫। হোসেন (১৯৯৫), অধ্যায়-১।

১৬। দেখুন শহীদুল্লাহ কায়সারের উপর পান্না কায়সারের বিবরণ -হায়দার, সম্পাদিত,স্মৃতি ১৯৭১, খণ্ড-১ (১৯৮৮), ৮৯-৯৩ এবং জহির রায়হানের উপর জাকারিয়া হাবিব, খণ্ড-২, ৪৫-৫১।

১৭। লেখকের সাথে বাঙালি পাটকল শ্রমিক ও বিহারীদের সাক্ষাতকার, খুলনা, ২০০৪। আরো দেখুন এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়।

অধ্যায় ৯ - শব্দ ও সংখ্যা: স্মৃতি ও দানবীয় উপকথা

১। পূর্ব পাকিস্তানে সংকট নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী উইলিয়াম রজারস্ ও প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী হেনরী কিসিঞ্জারের মধ্যে টেলিফোনে আলাপ, ৬ এপ্রিল ১৯৭১ (FRUS, Vol X1, 45-8)।

২। এখানে রেফারেন্সটি হচ্ছে ১৯৯০ দশকে সার্ব ও ক্রোয়েটদের মধ্যে জাতিগণ নির্মূল অভিযান এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ-এর বীজ বপন সম্পর্কিত(ইগনেতিয়েফ(১৯৯৪),১৪-৫) ৩। যুদ্ধ ও রাজস্ব

www.pathagar.com

দপ্তরের মন্ত্রী সুবুদ্ধি খান, একই পদে তার সন্তান ঈশান খান এবং ঈশান খানের পুত্র পুরান্দার খান বাংলার সুলতানের নৌ-কমান্ডার ও অর্থ মন্ত্রী ছিলেন পনের ও ষোড়শ শতকে। দেখুন সুভাষ চন্দ্র বসু'র অসমাপ্ত আত্মজীবনী *An Indian Pilgrim* ও *Netaji Collected Works*-এর পরিশিষ্টে, ভলিউম ১, নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো,কোলকাতা, ১৯৮০। শরৎ চন্দ্র বসুর একজন বন্ধু ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃত ছিলেন নারাজোলের কুমার দেবেন্দ্র লাল খান।

৪। *'শালা'* শব্দটা বাংলায় (অথবা হিন্দিতে *'সালা'*) স্ত্রীর ভাইকে বোঝায়। ।

৫। *দি টাইমস*, লণ্ডন, ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২।

৬। পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালি যারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে সরাসরি বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন প্রদান করেননি তাদের ব্যাপারে ওই বছরের সংঘাতের উপর প্রকাশিত সব ধরনের প্রকাশনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোথাও কোনো উল্লেখ করা হয়নি। এতে আশ্চার্য হওয়ার কিছুই নেই, কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিশেষ এ গোষ্ঠীটিকে টিকে থাকতে হয়েছিল যেখানে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম নিয়ে কম উৎসাহ প্রকাশ হতে পারতো সরাসরি হুমকী না হলেও ভয়ানক বেখাপ্পা।

৭। এ দুর্ঘটনার উপর বিস্তারিত জানতে দেখুন শর্মিলা বসুর' দি ট্রুথ এবাউট দি যশোর ম্যাসাকার', *দি টেলিগ্রাফ*,১৯ মার্চ ২০০৬।

৮। লে. জেনারেল (ক্যাপ্টেন) আলী কুলি খান যিনি পূর্ব পাকিস্তানে আর্মি এভিয়েশনে দায়িত্ব পালনকালীন হেলিকপ্টার নিয়ে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন তিনি আমাকে বলেছেন, বোমা বর্ষণের কাজে কখনো হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হয়নি। ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় দুই ইঞ্জিনের প্রপেলার চালিত বিমান প্রত্যেক রাতে ঢাকায় আসতো বিকট আওয়াজ করে, কিন্তু ওগুলো পাকিস্তানী বিমান বিধ্বংসী কামানের আওতার বাইরে থাকায় কিছু করা সম্ভব হতো না, আর তারা বোমা ফেলে নিরাপদে চলে যেত (২০০৫ সালে লে. জে. আলী কুলি খান খটকের সাথে লেখকের সাক্ষাতকার)। গেভিন ইয়ং ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার রিপোর্ট করেছিলেন *দি অবজারভার*- এর 'ঢাকা ডায়েরী' তে যা ১২ ডিসেম্বর ছাপা হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেন: 'প্রপেলার চালিত ভারতীয় বিমান বৃহদাকৃতির বোমা ফেলেছে'। হেলিকপ্টার থেকে বোমা নিক্ষেপ করার একটি মাত্র ঘটনার কথা আমি জানতে পেরেছি যেখানে বাংলাদেশীরা বোমা ফেলেছিল: পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বাঙালি পাইলট বদরুল আলম স্বপক্ষ ত্যাগ করে বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দান করেন ও মুক্তিবাহিনীর বিমান শাখায় যোগ দেন। হাতে গোনা কয়েকটি পুরনো বিমান ও হেলিকপ্টার নিয়ে তাঁরা বিমান শাখা গঠন করেছিলেন। কিন্তু ভারতীয়রা তাদের খুব সীমিত তৎপরতা চালানোর অনুমতি দিয়েছিল মাত্র। যা হোক আলম বলেন যে, ডিসেম্বরে পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হলে তারা হেলিকপ্টারে বোমা বহনের ব্যবস্থা করেন ও পাকিস্তান বাহিনীকে লক্ষ্য করে ঢাকার অদূরে নরসিংদীতে বোমা নিক্ষেপ করেন। সীমিত সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও আলম যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার যুদ্ধে তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ তাকে পদক দ্বারা সম্মানিত করে। (লেখকের সাথে আলমের কথপোকথন, ২০০৪)।

৯। আমাকে একজন পাকিস্তানী অফিসার বলেছেন, তিনি ও তার লোকজন একবার একটা গ্রাম অতিক্রম করছিলেন যেখানে কেবলমাত্র বৃদ্ধরা ছিলেন। সেখানে কেবলমাত্র বৃদ্ধরা কেন এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। যখন সেখানে একটি শিশু কেঁদে উঠে তখন দেখা যায় গ্রামের সবাই পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন। গ্রামবাসীরা বলেন যে, তাদের বলা হয়েছে পাক বাহিনী নাকি গ্রামের পুরুষদের হত্যা করে, নারীদের ধর্ষণ করে ও শিশুদের খেয়ে ফেলে।

১০। গেভিন ইয়ং,'ঢাকা ডায়েরী', *দি অবজারভার*,১২ ডিসেম্বর ১৯৭১;আরো প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের দলিলপত্রে,ভলিউম-১৪,৪২৫-৬। ইয়ং তার বর্ণনায় সাত থেকে নয়টি ভারতীয় জঙ্গি বিমানগুলি খেয়ে ভূপাতিত হতে দেখার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। জেনারেল চুক ইয়েগার যিনি শব্দের গতির রেকর্ড ভেঙ্গেছিলেন তিনি ১৯৭১ সালে ইসলামাবাদে ছিলেন

www.pathagar.com

মার্কিন সামরিক প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে পাকিস্তানী পাইলটদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন: 'আসলেই তারা ছিল অত্যন্ত ভালো পাইলট, আকাশযুদ্ধের আগ্রাসী যোদ্ধা, গোলাবর্ষণ, অস্ত্রচালনা ও আকাশ যুদ্ধের কৌশলে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। আমি তাদের দক্ষতায় খুবই অভিভূত হয়েছি।' তিনি আরো লিখেছেন, আকাশে পাকিস্তানীরা ভারতীয়দের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন:' পাকিস্তানীরা তাদের পশ্চাদদেশে শক্তভাবেই চাবুক মেরেছিল, কিন্তু স্থল যুদ্ধের চিত্রটা ছিল ভিন্ন... পাকিস্তানীরা সফল হয়েছিল ৩:১ অনুপাতে, তারা ধ্বংস করেছে রাশিয়ার তৈরি ১০২টি বিমান যেখানে তারা নিজেরা হারিয়েছে মাত্র ৩৪টি। আমি এ সংখ্যার ব্যাপারে নিশ্চিত কারণ দিনে কয়েকবার আমি নিজে একটি হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের টুকরো গুণে দেখেছি। আমি ধ্বংসাবিশেষ গুণেছি পাকিস্তানের মাটিতে, সেগুলোর ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী নথিবদ্ধ করেছি এবং প্রমাণ্য দলিল তৈরি করেছি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ শনাক্ত করে...।' তিনি ভূপাতিত ভারতীয় বিমানের পাইলটদের হেলিকপ্টারে তুলে নিতেন ও পরে তাদের প্রশ্ন করতেন। 'তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, আমি পাকিস্তানে ছিলাম বা বুঝতে পারেনি আমি সেখানে কি করছিলাম।' জেনারেল ইয়েগার লিখেছেন 'ভারতীয়রা তাঁর ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে পার্ক করা বীচ কুইন বিমান যাতে ছিল মার্কিন সামরিক বাহিনীর ছাপ ও লেজে ছিল মার্কিন পতাকা আঁকা সেটি বোমা মেরে ধ্বংস করে দেয়। তার মতে' এটি ছিল আংকেল স্যামকে দু'হাত নেয়ার ভারতীয় পদ্ধতি'। (জেনারেল চুক ইয়েগার ও লিও জোনস, *Yeager: An Autobiography*, ব্যানটাম বুকস্, ১৯৮৫,৩১১-১২) লক্ষ্য করার মতো বিষয় এ যুদ্ধে পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ভূমিকার ব্যাপারে কিছু বিতর্ক আছে। তবে সে সব বিতর্ক এ বইয়ের গণ্ডীর বাইরেই পড়ে।

১১। *দি টাইমস*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, বাংলাদেশ সরকারের দলিলে প্রকাশিত, খণ্ড : ১৪, ৪৩৬।

১২। *দি অবজারভার*, ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১, বাংলাদেশ সরকারের দলিলে প্রকাশিত; খণ্ড : ১৪, ৪২৫।

১৩। ইমাম (১৯৮৬), ২৬৩-৫।

১৪। দেখুন অধ্যায় ৫।

১৫। দেখুন অধ্যায় ৫।

১৬। দেখুন অধ্যায় ৭।

১৭। হায়দার-এ উল্লেখিত সেনগুপ্তা, সম্পাদিত (১৯৯৬), ১২২-২।

১৮। কবির-এ উল্লেখিত প্রতীতি দেবী, সম্পাদিত (১৯৯৯), ১০১-২।

১৯। দেখুন অধ্যায় ৪।

২০। টেবিল ২, সিসন ও রোজ (১৯৯০), ৩২।

২১। সান্থি ব্রত,'বিগ ব্রাদার গোজ টু ওয়ার', *দি গার্ডিয়ান*, ১৮ সেপ্টেম্বর,১৯৭১।

২২। নিয়াজী (২০০২), ১১৮।

২৩। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ২০৬-১৪।

২৪। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ২১৪।

২৫। কোরেশী (২০০৩), ২৭৬; মিঠা (২০০৩), ৩৩৯। ২৬ মার্চ হোয়াইট হাউস- এর বৈঠকে সিআইএ পরিচালক রিচার্ড হেমস্ বলেন পূর্ব পাকিস্তানে ২০,০০০ অনুগত পশ্চিম পাকিস্তানী সৈনিক ছিল (RURS, Vol-X1, 23).

২৬। নিয়াজী (২০০২), ৫২।

২৭। নিয়াজী (২০০২), ২৩৭।

২৮। দেখুন অধ্যায়-৪ এবং ৫। অজানা সংখ্যক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দি সফলভাবে ভারতীয় বন্দি শিবির থেকে পালিয়ে যায়। ধরে নেয়া হয়েছিল এ সব পলাতক পাকিস্তানীদের সংখ্যা হবে হাতে গোণা, কিন্তু যারা এভাবে তাদের চিরশত্রুর আস্তানা থেকে পালাতে সক্ষম হয় তারা এমনই এক খ্যাতি অর্জন করেন যা পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে হতে পারতো *দি গ্রেট এস্কেপ*- এর

www.pathagar.com

মতো এক মর্যাদাপূর্ণ পলায়ণ। মেজর জেনারেল এইচ এ কোরেশী সুরঙ্গ তৈরি করে পালানোর এ প্রচেষ্টাকে হলিউড চলচ্চিত্রের কাহিনীর সাথে তুলনা করেছেন (২০০৩)। ১৫ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ক্যাপ্টেন সুজাত লতিফ আমাকে তাঁর পালানোর আকর্ষণীয় গল্পটি বলেন, যখন তিনি একটি চলমান ট্রেন থেকে পালিয়ে যান যে ট্রেনটিতে গোলমাল সৃষ্টিকারীদের (Trouble maker) আগ্রা থেকে রাচি পাঠানো হচ্ছিল এবং একই সাথে সমানসংখ্যক বন্দিকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল (পরে ক্যাপ্টেন সুজাত লতিফ আবারো গ্রেফতার হন)। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের দেয়া তথ্যানুযায়ী, ভারতীয় প্রহরীরা ক্যাপ্টেন সুজাত লতিফের প্রতিদানে একজন বন্দি অফিসার মেজর নাজিবুল্লাহকে গুলি করে হত্যা করে- এটি একটি মারাত্মক অভিযোগ যা যথপোযুক্ত কর্তপক্ষ দ্বারা সুষ্ঠু তদন্তের দাবি রাখে।

২৯। *দি টাইমস*, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২।

৩০। চৌধুরী (১৯৯৬)ওই সময়ের বাংলাদেশী সংবাদপত্র ও সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের উল্লেখ করেছেন। চৌধুরী উপ-পুলিশ প্রধান আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে ১২ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটির নাম বলেন। তদন্ত কমিটিকে ৩০ এপ্রিল ১৯৭২ সালের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়ার জন্য বলা হয়। চৌধুরী আরো দাবি করেন শেখ মুজিব আগেই তাঁর দলীয় কর্মী ও সংসদ সদস্যদের হতাহতের সংখ্যা নথিভুক্ত করার জন্য বলেছিলেন এবং মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। চৌধুরীর মতে, তদন্ত ও ক্ষতিপূরণের বিষয়টিতে যে নির্দেশনা বা পথ খুঁজে পাওয়া যায় তাতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে প্রায় ৫০,০০০ জন লোক নিহত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। এটাই হয়তো সর্বমোট হতাহতের সংখ্যা যার মধ্যে উভয়পক্ষের নিহতসহ মৃত শরণার্থীদেরও ধরা হয়েছিল। আমি সরকারি তদন্ত কমিটির রিপোর্টের তথ্য চেয়ে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আমি এ সংক্রান্ত কোনো স্বাধীন ও প্রকৃত তথ্য পেতে সমর্থ হইনি।

৩১। জাহান (১৯৭২), ২০৩-৪।

৩২। Power (Basic Books, 2002), 82. পাওয়ারের আত্মজীবনীতে বাংলাদেশ সম্পর্কিত একটি মাত্র বই-এর উল্লেখ করা হয়েছে, আর তা হলো লরেন্স লিফৎসুলজ্- এর *'দি আন-ফিনিশড রেভ্যুলিউশন'* (Zed press, 1979)। এটি আবার ১৯৭৫ সালের ঘটনাবলীর উপর রচিত, ১৯৭১ এর উপর নয়। ১৯৭৫ সালে সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে লিফৎসুলজ-এর বইয়ের ব্যাপারে সিসন ও রোজের মুল্যায়ন হচ্ছে,'...বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের কার্নেগী ফাইল গভীরভাবে অধ্যয়ন লিফৎসুলজের কোনো কাল্পনিক ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে সমর্থন করে না; বহু জায়গায় তিনি সাক্ষাতদাতদের দেয়া তথ্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছেন সাক্ষাতকারের বিশেষ কোনো অংশ বাদ দিয়ে বা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে।' (সিসন ও রোজ ১৯৯০,৩০২)।

৩৩। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ২১৭।

৩৪। *দি গার্ডিয়ান*, ৬ জুন, ১৯৭২।

৩৫। মানবাধিকার কমিশন, ৫১৩। বিচারপতি হামুদুর রহমান তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিশন প্রধান, একজন বাঙালি।

৩৬। মানবাধিকার কমিশন, ৫১৩।

৩৭। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ৩০৬।

৩৮। সিসন ও রোজ (১৯৯০), ৩০৬।

৩৯। জ্যাকব (২০০১), ১৫৭-৮।

৪০। নিয়াজী (২০০২), ১১৮।

৪১। শ্বেতপত্র (১৯৭১), ৪১।

৪২। মিচেল লরেন্ট, *দি টাইমস*, ৩০ মার্চ ১৯৭১। তিনি আরো লিখেছেন যে, সম্ভবত ৭,০০০ পাকিস্তানী শুধু ঢাকায় দু'দিনের যুদ্ধে মারা যায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

SELECT BIBLIOGRAPHY

Alam, Mahboob, *Guerrilla theke sammukh juddhey,* Vol.2, Sahitya Prakash, Dhaka, 1993.

Aziz, Qutubuddin, *Blood and Tears,* Karachi, 1974.

Bangladesh Government, Ministry of Information, *History of the War of Independence: documents,* vol. 1-15.

Baxter, Craig, *Diaries of Field Marshal Mohammad Ayub Khan 1966-1972,* Oxford University Press. 2007.

Blood, Archer, *The Cruel Birth of Bangladesh: Memoirs of an American Diplomat,* The University Press Limited, Dhaka-2002.

Bose, Sarmila, 'Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971: *Economic and Political Weekly* (Mumbai), vol. 40, No. 41, 8-14 Oct. 2005.

————, 'Losing the Victims: Problems of Using Women as Weapons in Recounting the Bangladesh War', *Economic and Political Weekly* (Mumbai), vol. 42, No. 38, 22-28 Sept. 2007.

————, 'Three Turbulent Years: Re-appraisal of the Yahya Khan Regime', in Long, ed., *History of Pakistan,* Oxford University Press (forthcoming).

Chaudhuri, Nirad C., 'Elections in Pakistan', *Hindustan Standard,* 31 December 1970.

————, 'Judgement on the Bengali personality', Hindustan Standard (8 August 1971). 'Late reflexions on the Indo-Soviet treaty of friendship' (23 August 1971), Northern Ireland as 'Bangladesh' (28 August 1971), 'The Contemporary Bengali mind' (19 September 1971), 'Maine of Bengalis: defence and warning (19 October 1971), 'Neither magnificent, nor war' (5 December 1971).

Choudhury, G.W.., *Last Days of United Pakistan,* C. Hurst and Company, London: Indiana University Press, Bloomington, 1974.

Chowdhury, M. Abdul Mu'min, *Behind the Myth of 3 Million,* Al-Hilal Publishers Ltd. London, 1996.

Cohen, Stephen P., *The Idea of Pakistan,* Brookings Institution Press, Washington, 2004.

————, *The Pakistan Army,* Oxford University Press, 2002.

Guhathakurta, Basanti, *Ekattorer Smriti,* University Press. Dhaka, 2000.

Haider, Rashid, (ed.), *Smriti: 1971,* Bangla Academy, Dhaka, vol. 1-13, 1988-2000.

————, *1971: Bhayabaha Abhignata,* Sahitya Prakash, Dhaka, 1989.

www.pathagar.com

————, *Shaheed Buddhijeebi Koshgrantha,* Bangla Academy, Dhaka, 1985.
Hamoodur Rehman Commission, *Report of Inquiry into the 1971 War,* Vanguard Books, Lahore.
Hasan, Moidul, *Mooldhara '71,* University Pres, Dhaka, 1986.
Hayat, Brigadier Muhammad, 'The Battle of Khulna', *Defence Journal (Karachi), March 1998.*
Husain, Syed Sajjad, *The Wastes of Time: Reflections on the Decline and Fall of East Pakistan,* Notun Safar Prokashani, Dhaka, 1995.
Ibrahim, Neelima, *Ami Birangona Balchhi,* Jagriti Prakashani, Dhaka, 2001.
Imam, Akhtar, *Amar Jibankatha: Dhaka Viswavidyalay (1952-82),* Dhaka, 2002.
————, 'Ekattorer ponchishe March ebong kichhu ghotona', in Akhtar Imam, *Vividha Rachana,* Dhaka. 1998.
Imam, Jahanara, *Ekattorer Deenguli,* Sandhani Prakashani, Dhaka, 1986.
Jackson, Robert, *South Asian Crisis: India-Pakistan-Bangladesh,* Chatto & Windus, 1975.
Jecob, Lt Gen.J.F.R., *Surrender at Dacca, Birth of a Nation,* Manohar, 2001.
Jahan, Rounaq, *Pakistan: Failure in National Integration,* Columbia University Press, 1992.
Kabir, Shahriar, ed., *Ekattorer Dushasha Smriti,* Ekattorer Ghatok Dalal Nirmul Committee, Dhaka, 1999.
Karimullah, Brig., 'Log of Daily Events-POF, Ghazipur, 2 March to 3 April, 1971' (unpublished document).
Khan, Roedad, *Pakistan-A Dream Gone Sour,* Oxford University Press, Karachi, 2004.
Khan, Sahabzada Yaqub, *Strategy, Diplomacy, Humanity – Life and Work of Sahabzada Yaqub Khan,* compiled by Anwar Dil, Intercultural Forum, Takshila Rescarch University, Islamabad, 2005.
Kissinger, Henry, *White House Years,* Weidenfeld & Nicholson and Michael Joseph, London, 1979.
Liberation War Museum, *Documents on Crimes against Humanity Committed by Pakistan Army and their Agents in Bangladesh during 1971,* Dhaka (no date given).
Lifshultz, Lawrence, *Bangladesh: The Unfinished Revolution,* Zed Press, London, 1979.
Loshak, D., *Pakistan Crisis,* McGraw Hill, 1971.
Mamoon, Muntassir, ed., *Chuknagarey Gonahatya 1971,* Bangladesh Charcha (Centre for Bangladesh Studies), 2002.
Mascarenhas, Anthony, *The Rape of Bangladesh,* Vikas Publications, Delhi, 1971.
————, *Bangladesh: A Legacy of Blood,* Hodder and Stoughton, London, 1986.
Matinuddin, Lt Gen. Kamal, *Tragedy of Errors: East Pakistan Crisis 1968-71,* Services Book Club, Lahore, 1993.

www.pathagar.com

Mitha, Maj. Gen. A.O., *Unlikely Beginnings: A Soldier's Life,* Oxford University Press, Karachi, 2003.
Niazi, Lt. Gen. A.A.K., *The Betrayal of East Pakistan,* Oxford University Press, 1998.
Nixon, Richard, *The Memoirs of Richard Nixon,* Grosser and Dunlap, New York, 1978.
Noman, Omar, *Pakistan: Political and Economic History Since 1947,* Kegan Paul International, London and New York, 1988.
Obermeyer, Z, C.J.L. Murray and E. Gakidou, 'Fifty Years of Violent War Deaths from Vietnam to Bosnia: Analysis of Data from the World Health Survey Programme', *British Medical Journal,* 336 (7659), 1482-6, 19 June 2008.
Pakistan, Government of, *White Paper on the Crisis in East Pakistan,* 5 August 1971.
Qadir, Brig. Shaukat (unpublished manuscript).
Qureshi, Maj. Gen. Hakeem Arshad, *The 1971 Indo-Pak War: A Soldier's Narrative,* Oxford University Press, 2002.
Rahman, Muhammad Anisur, *My Story of 1971.* Liberation War Museum, Dhaka, 2001.
Rahman, Maj. Gen. Muhammad Khalilur, *Purbapor 1971: Pakistani sena-gauhvar theke dekha,* Sahitya Prakash, Dhaka, 2005.
Raina, Asoka, *Inside RAW: the Story of India's Secret Service,* Vikas Publishing House, New Delhi, 1981.
Riza, Maj, Gen, Shaukat, *The Pakistan Army 1966-71,* Services Book Club, Lahore, 1990.
Roy, Raja Tridiv, *The Departed Melody: Memoirs,* PPA Publications, Islamabad, 2003.
Safiullah, Maj. Gen. K.M., *Bangladesh at War,* Academic Publishing, 1989.
Saikia, Yasmin, 'Beyond the Archive of Silence: Narratives of Violence of the 1971 Liberation War of Bangladesh', *History Workshop Journal,* 58, 275-87, 2004.
————, 'Bodies in Pain: A People's History of 1971', in Bhagavan and Feldhaus, (ed.), *Claiming Power from Below: Dalits and the Subaltern Question in India,* Oxford University Press, 2008.
Salik, Siddiq, *Witness to Surrender,* The University Press (with permission from Oxford University Press, Karachi, 1977), Dhaka, 1997.
Siddiqi, Brig. A.R., *East Pakistan the Endgame: An Onlooker's Journal 1969-71,* Oxford University Press, Karachi, 2004.
Siddiqi, Kader, *Swadhinata '71,* Volumes I and 2, Dey's Publishing, Calcutta, 1985.
Singh, Maj. Gen. Lachhman, *Victory in Bangladesh,* Natraj Publishers, Dehra Dun, 1981.
Singh, Maj. Gen. Sukhwant, *The Liberation of Bangladesh,* vol. 1, Vikas, 1980.
Sisson, Richard and Leo Rose, *War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh,* University of California Press, 1990.

www.pathagar.com

Talbot, Ian, *Pakistan: A Modern History,* St. Martin's Press, New York, 1998.
United States Department of State, *South Asia Crisis, 1971, in Foreign Relations of the United States,* 1969-1976, Volume XI, 2005.
Wilcox, Wayne Ayres, *The Emergence of Bangladesh: Problems and Opportunities for a Redefined American Policy in South Asia* (Foreign affairs study), American Enterprise Institute of Public Policy Research, Washington, 1973.
Williams. L.F. Rushbrook, *The East Pakistan Tragedy,* Tom Stacey, London, 1971.
Yeager, General Chuck and Leo Janes, *Yeager: An Autobiography,* Bantam Books, 1985.
Zaheer, Hasan, *The Separation of East Pakistan: The Rise and Realization of Bengali Muslim Nationalism,* Oxford University Press, 1994.
Audio-visual Material
Sheikh Majibur Rahman's speech in Dhaka, 7 March 1971.
Liberation War Museum, Dhaka, Recording of radio communication among army officers and units during military action in Dhaka, 25-26 March 1971 (I have obtained confirmation that the recording is authentic through my interviews with Pakistan army officers)
George Harrison and others, songs for Bangladesh, 1971.
Shei raater kotha boltey eshechhi, Bengali Film, dir: Kawsar Chowdhury.
Tareque Masud, *Muktir Gaan,* documentary film.
Tanvir Mokammel, documentary film prepared for the Liberation War Museum, Dhaka; documentary film *Ekti Golir Atmakahini;* Feature films *Nodir Naam Modhumoti, Chitra Nodir Parey.*
'War Crimes file', *Dispatches,* Channel 4 Television, UK, 1994.

www.pathagar.com

শর্মিলা বসু'র জন্ম ১৯৫৯ সালের ৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে। তাঁর পিতা ইংরেজীর অধ্যাপক শিশির কুমার বসু ও মাতা কৃষ্ণা বসু। তাঁর দাদা হচ্ছেন বিখ্যাত বাঙালি বিপ্লবী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু'র বড় ভাই শরৎ চন্দ্র বসু। শর্মিলা পিএইচডি করেছেন বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বর্তমানে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এ সিনিয়র রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে কর্মরত।

"সমসাময়িক ঘটনাবলীর আবেগপূর্ণ বর্ণনা থেকে প্রকৃত ইতিহাস কেবল ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। শর্মিলা বসুর বইটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ইতিহাসের এই দীর্ঘ যাত্রা পথের শুরুতে প্রতিস্থাপন করেছে"- ডেভিড ওয়াশব্রুক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ট্রিনিটি কলেজ, ক্যামব্রিজ।

দুনিয়া কাপানো এ বইটিতে দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধে জড়িত উভয়পক্ষের স্মৃতিসমূহ ধারাবাহিকভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং তারপর শুরু হয় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পাকিস্তানের সহায়তায় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। পাকিস্তানের পূর্ব খন্ড পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিতে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং এই পূর্ব পাকিস্তান আলাদা একটি পৃথক রাষ্ট্রের রূপ নেয় যা বাংলাদেশ নামে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পায়। লেখিকা শর্মিলা বসু সরেজমিনে অত্যন্ত গভীরতার সাথে ঘটনাসমূহের অনুসন্ধান করে ওই সংঘাতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।

১৯৭১ সালের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত এ যুদ্ধে যারা জয়ী হয়েছে তারা ও তাদের বক্তব্যসমূহ প্রাধান্য পেয়ে আসছে। অন্যদিকে যুদ্ধের সকল অংশীদারদের অনেকেই একপক্ষীয় কল্পকাহিনীর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আছেন।

শর্মিলা বসু ঘটনাগুলোকে পুণরায় সাজিয়েছেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাতকার নিয়ে, ঘটনার সাথে জড়িত সকল পক্ষের বাংলা ও ইংরেজীতে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা থেকে, বিভিন্ন পুস্তক- সাময়িকী, সরকারি দলিলসমূহ, বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সহায়তা নিয়ে। তাঁর বইটি সংঘর্ষের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাসমূহের বিপরীতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এবং এখনো ১৯৭১ এর সংঘাত কিভাবে এ অঞ্চলকে প্রভাবিত করে চলেছে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছে।

অবশেষে আমরা একটি বই পেয়েছি যা সকল পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ ও প্রকৃত ঘটনার সাহায্যে ১৯৭১ সালের সংঘাতের অনুসন্ধান করেছে।

মুস্তাক এইচ, খান, অধ্যাপক, অর্থনীতি
এসওএএস, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন

ডেড রেকনিং ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান / বাংলাদেশ যুদ্ধের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গভীর একটি চমৎকার গবেষণা। শর্মিলা বসু সত্যের স্বার্থেই বইটি লিখেছেন। আমরা তাঁর নিকট ঋণী।

স্টিফেন কোয়েন, আইডিয়া অব পাকিস্তান বইয়ের লেখক

ISBN 978-1-84904-049-5

মূল্য : ৩৫০ টাকা

www.pathagar.com